নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা ও সমাজদর্শনের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৫৩

প্রকাশক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা - ৯

মুদ্রাকর
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত পাঠ্যগ্রন্থের অসুবিধে দুটো। প্রথমত, বিশ্বের প্রায় যাবতীয় বিষয় তাতে এলোমেলো ভাবে থাকবে এবং দ্বিতীয়ত তা হবে পরীক্ষা পাশের সহজ উপায়। ফলে বাজারের যে-কোনো গ্রন্থই সর্বাঙ্গে পরীক্ষার ছাপ নিয়ে উপস্থিত এবং আলোচনায় বক্তব্যের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। গ্রন্থে লেখকের নিজস্ব বিচার ও বিবেচনাও পুরোপুরি অনুপস্থিত।

বর্তমান গ্রন্থটিও পাঠ্যগ্রন্থ। কিন্তু পাঠ্যগ্রন্থের চাপানো সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দার্শনিক বক্তব্য অনুযায়ী আলোচনার ধারাবাহিকতা তৈরি করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি খাতস্থ হলে পাঠক নিজেই সমস্যাগুলি বিচার করতে পারবেন। ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের কাছে আলোচনা সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করবার জন্য অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং ভেঙে ভেঙে ধাপে ধাপে বক্তব্যকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের গভীর বিশ্বাস আছে যে, দুরূহ নীতিশাস্ত্র বর্তমান গ্রন্থে অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে।

মাতৃভাষায় চর্চার একান্ত সুযোগে ইংরেজিতে মূল দার্শনিকদের লেখার স্বাদ ভোলা উচিত নয়। তাই অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার প্রয়োজনে উদ্ধৃতি বাদ গেলেও আলোচনার কোনো ক্ষতি হবে না।

গ্রন্থকারদের ঋণ গ্রন্থমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে। অপরিশোধ্য থাকছে কেবল বিশ্বাস পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও আমার স্ত্রী শ্রীমতী বীথি বসুর কাছে।

গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদ নিশ্চয়ই আছে। তবে সম্ভবত মারাত্মক কিছু নয়। সহযোগী অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রয়োজন মিটলেই এবার পরিশ্রম সিদ্ধ হবে।

লেখক

নির্মাল্য আচার্য,
সলিল গঙ্গোপাধ্যায় কে,

পাঠ্য বিষয় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Definition and Province of Ethics. Nature and Utility of the study of Ethics. Relation of Ethics to Psychology, Sociology, Politics, Metaphysics and Theology. Actions—Moral and Non-Moral.

Analysis of Voluntary Action—Desire and End; Motive and Intention.

Nature and Object ot Moral Judgment, Moral Sentiment Moral Faculty. Conscience and Prudence.

Moral Obligation—Nature and grounds. Different Theories.

Ethical Standards—Hedonism, Rationalism, Intuitionism and Perfectionism. Karma Yoga of Gita.

Sanction of Morality. The Moral Law. Duty.

Postulates of Moral Judgment—Reason, Personality, Self-determination.

Duties and Virtues. Classification. Conflict of Duties. Sin and Error. Theories of Reward and Punishment.
Growth of Character. The Moral ideal.

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Definition, Province and End of Ethics.

Relation of Ethics to Psychology, Politics and Metaphysics Morality and Religion.

Actions—Moral and Nontmoral.

Voluntary Action—Psychological basis of Ethics, Desire, End, Motive, Intention.

Moral Judgment—Subject and Object of Moral Judgment. Moral Sentiment.

Obligation—Nature and Grounds. Different theories

Ethical Standards—Hedonism Rationalism. Intuitionism and Perfectionism. Sanctions of Morality. Moral Law.

Postulates of Moral Judgment—Reason, Personality and Self-determination.

Duties and Virtues—Classification and Conflict of Duties. Sin and Error. Theories of Punishment.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও সীমা	
১। নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়	১—৪
২। নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন	৪—৫
৩। নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি সংজ্ঞা	৫—৮
৪। নীতিশাস্ত্র কি শুধু ব্যবহারিক	৯—১১
৫। নীতিশাস্ত্রের সীমা	১১—১৩
৬। নৈতিক তত্ত্ব ও তথ্য	১৩—১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়—নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক	
১। আচরণের বিজ্ঞান কি সম্ভব	১৮—২০
২। আচরণের কলা কি সম্ভব	২০—২৬
৩। নীতিশাস্ত্রের উপযোগিতা	২৬—৩০
৪। নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান	৩০—৩১
৫। নীতিশাস্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা	৩১—৩৬
৬। মূল কয়েকটি প্রত্যয়	৩৬—৪৬
৭। নীতিশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব	৪৬—৪৮
৮। নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতি	৪৯—৫১
৯। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম	৫২—৫৮
১০। নীতিশাস্ত্র ও পরাবিদ্যা	৫৮—৬১
তৃতীয় অধ্যায়—নৈতিক ক্রিয়া ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি	
১। নৈতিক কর্মের চরিত্র	৬২—৬৩
২। অচেতন কর্ম	৬৪—৬৬
৩। আত্মসচেতন কর্ম	৬৬—৬৯
৪। অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা	৬৯—৭১
৫। কামনা, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প	৭১—৭৪
৬। লক্ষ্য ও অভিপ্রায়	৭৪—৭৬

বিষয় | পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়—নৈতিক বিচার

১। নৈতিক বিচারের চরিত্র — ৭৮—৮১
২। নৈতিক বিচারের বিষয় — ৮১—৮৭
৩। নৈতিক বিচার চরিত্রের — ৮৭
৪। নৈতিক বিচারের বিষয়ী কে ? — ৮৭—৯১

পঞ্চম অধ্যায়—নৈতিক মান : সুখ

১। নৈতিক মান হিসেবে সুখ — ৯৩—৯৪
২। সুখবাদের বিভাগ — ৯৪—৯৫
৩। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ — ৯৫—৯৮
৪। নৈতিক সুখবাদ — ৯৮—১০০
৫। আত্মসুখবাদ — ১০০—১০২
৬। অসংযত আত্মসুখবাদ — ১০২—১০৬
৭। সর্ব সুখবাদ — ১০৬—১১৩
৮। মিলের সর্ব সুখবাদ — ১১৪—১১৯
৯। সুখবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি — ১১৯—১২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়—ক য় যুক্তিবাদ

১। নৈতিক বিচারে রূপের প্রসঙ্গ — ১২৪—১২৫
২। কাণ্ট — ১২৫—১২৭
৩। কাণ্টের ঔচিত্য তত্ত্ব — ১২৭—১২৯
৪। কাণ্টের বক্তব্যের গুরুত্ব — ১২৯—১৩০
৫। কাণ্টের ত্রুটি — ১৩০—১৩৩

সপ্তম অধ্যায়—বোধিবাদ

১। বোধি বলতে কি বোঝায় — ১৩৪—১৩৫
২। অন্ধ বোধিবাদ — ১৩৫—.৩৭
৩। নৈতিক বোধিতত্ত্ব — ১৩৭—১৩৯
৪। নন্দন বোধতত্ত্ব — ১৩৯—১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫। মার্টিন্যুর বোধিবাদ	৪২—১৪৪
৬। দার্শনিক বোধিবাদ	১৪৪—১৪৮
অষ্টম অধ্যায়—পূর্ণ পরিণতি বাদ	
১। পরিণতি বলতে কি বোঝায়	১৪৯—১৫৩
২। পরিণতিবাদের বৈশিষ্ট্য	১৫৩—১৫৫
৩। পরিণতি : ব্যক্তি ও সমাজ	১৫৪—১৫৭
৪। পরম কল্যাণবাদ	১৫৭—১৫৯
নবম অধ্যায়—গীতার কর্মযোগ	
গীতার কর্মযোগ	১৬০—১৬৪
দশম অধ্যায়—বিবেক	
১। নীতিশাস্ত্রে বিবেকের স্থান	১৬৫—১৬৭
২। বিবেক সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব	১৬৮—১৭৩
(ক) সুখবাদী ও উপযোগিতাবাদী	
(খ) বোধিতত্ত্বে বিবেক	
(গ) কাণ্টীয় কৃচ্ছ্রতাবাদ ও বিবেক	
(ঘ) পূর্ণ পরিণতিবাদ ও বিবেক	
৩। বিবেক ও বিবেচনা	১৭৩—১৭৫
একাদশ অধ্যায়—নৈতিক কর্তব্যবোধ	
১। বাধ্যতার চরিত্র	১৭৬—১৭৭
(খ) সুখবাদ ও বাধ্যতা	১৭৭
(গ) বোধিবাদ ও বাধ্যতা	১৭৭—১৭৮
(ঘ) কৃচ্ছ্রতাবাদ ও বাধ্যতা	১৭৮
(ঙ) পূর্ণ পরিণতিবাদ ও বাধ্যতা	১৭৮—১৭৯
২। কর্তব্য	১৭৯—১৮১
কর্তব্যের নির্দেশ	১৮১—১৮৩
৩। কর্তব্য বিরোধ ও বিবেক চিন্তা	১৮৩—১৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪। কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ	১৮৮—১৮৯
৫। ধর্ম	১৮৯—১৯২
৬। ধর্ম ও কর্তব্য	১৯২—১৯৪
৭। ধর্ম ও সমাজ	১৯৪—১৯৫
৮। ধর্মের শ্রেণীবিভাগ	১৯৫—২০০
দ্বাদশ অধ্যায়—নৈতিক আবেগ	
১। নৈতিক আবেগ	২০১—২০৩
২। নৈতিক আবেগের শ্রেণীবিভাগ	২০৩—২০৪
৩। নৈতিক আবেগ ও নৈতিক বিচার	২০৪—২০৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়—কর্তৃত্ব ও নৈতিক মান	
১। কর্তৃত্ব বলতে কি বোঝায়	২০৮—২১০
২। নীতিশাস্ত্রে নিয়মের অর্থ	২১০—২১
৩। নৈতিকতার সমর্থন	২১২—২১৮
চতুর্দশ অধ্যায়—নৈতিকতার মৌল প্রত্যয়	
১। নৈতিকতার মৌল প্রত্যয়	২১৯—২২১
২। ব্যক্তিসত্তা	২২০—২২৪
৩। সঙ্কল্প	২২৩—২২৪
৪। স্বাধীনতা	২২৪—২২৫
৫। সঙ্কল্পের স্বাধীনতা ও নির্বন্ধ	২২৫—২২৯
৬। স্বাধীন সঙ্কল্পের সমর্থন	২২৯—২৩২
পঞ্চদশ অধ্যায়—শাস্তি	
১। প্রাকৃতিক ও নৈতিক অনিষ্ট	২৩৩—২৩৪
২। ভ্রান্তি, পাপপ্রবণতা, পাপাচার ও অপরাধ	২৩৪—২৩৬
৩। শাস্তি	২৩৬—২৪৪
ষোড়শ অধ্যায়—চরিত্র ও নৈতিক প্রগতি	
১। আচরণ ও চরিত্র	২৪৫—২৪৬
২। চরিত্রের প্রগতি	২৪৭
৩। নৈতিক আদর্শ ও অগ্রগতি	২৪৭—২৫১

নীতিশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও সীমা

১। **নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় (Subject matter of Ethics) :** নীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের নৈতিক কর্ম বিষয়ে অবহিত করা। নৈতিক কর্মের জন্য প্রয়োজন শুরুতেই জানতে পারা কাকে বলা হয় 'নৈতিক তথ্য' বা moral fact। নৈতিক তথ্য খোঁজে (ক) নৈতিক জীবনের মূল নিয়ম ও (খ) নৈতিক কর্মের ভিত্তি। ভারতীয় ঋষিরা জানিয়েছিলেন জীবের লক্ষ্য হবে 'নিজেকে জানা'। হুবহু একই কথা ঘোষণা করেন গ্রীক মনীষী সক্রাটেস। নিজেকে জানতে পারাই জীবনের উদ্দেশ্য ; কিন্তু এই আত্মজ্ঞানের সূচনা সমাজ ও মানুষকে অস্বীকার ক'রে নয়। মানুষ ও সমাজ স্বীকৃত হলে মানুষে মানুষে সম্পর্কও স্বীকৃত হচ্ছে। সম্পর্কের টানে আসে নানা কর্ম। এই কর্মের বেড়াজালে মানুষ আবদ্ধ থাকে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে। কারণ, কোনো একটি কর্ম থেকেই তৈরি হয় আরো অসংখ্য কর্ম। কর্মপরম্পরায় চলতে থাকে জীবনের চাকা, এক-একজন এক-এক রূপ নিয়ে মানুষ হ'য়ে উঠতে থাকি আমরা। ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ।

নীতিশাস্ত্র নৈতিক কর্ম জানায়

সাধারণভাবে অনেক সময় মনে হয় আমরা যেনো শুধুই ব্যক্তি মানুষ, যে-যার নিজের চরিত্র, সমস্যা ও কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। নিজের ভালো-মন্দের দায় নিজের, কেউ অন্য কারো জন্যে মাথা ঘামাবে না। অথচ পরক্ষণেই বুঝি সমাজবদ্ধ জীবের অন্যের সাহচর্যকে এড়িয়ে যাবার পথ নেই। এই সম্পর্কের চরিত্র হয় বিরোধ নয়তো সহযোগিতা। এই দুই প্রান্তিক সীমায় মানুষ দোল খেতে থাকে। অনেক সময়েই তাই শুধু ব্যক্তি সত্য, আবার কখনো শুধুই সমাজ। ব্যক্তি ও সমাজকে একটা ঐক্যে বাঁধতে পারলেই বোঝা যায় মানুষ নিছক পৃথক ব্যক্তি যেমন নয়, তেমনি কেবলমাত্র সমুদ্রে বারিবিন্দুসমও নয়। ঐক্যের মধ্যেও তার স্বাতন্ত্র্য আছে, যেমন নাকি বৈচিত্র্যেও থাকে ঐক্য। নৈতিক তথ্যের প্রকাশ

নৈতিক তথ্যের প্রকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কর্মে

তাই প্রথমত পাওয়া যাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে আমাদের প্রতিটি লোকের স্বকীয় চিন্তা, ভাবনা ও কর্মে, যার বিচার ও মূল্য নিজেদের কাছে। অর্থাৎ আমি কেনো কী করবো বা আমার করা উচিত। এই ঔচিত্য বাইরের প্রয়োজন বা অন্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়। তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই থাকছে গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের কথা, তাদের কর্ম ও কর্মের নৈতিকতা। যে কাজ হয়তো সাজে কোনো একটি ব্যক্তিকে, তা মানায় না একটি গোষ্ঠীকে, ব্যক্তিবিশেষের নীতিতে চলে না সংগঠনের উদ্দেশ্য। এখানে সবার প্রয়োজন ও লক্ষ্যটাই নজরে রাখতে হয়। ভালোমন্দের বিচার চলে বহুর কষ্টিপাথরে।

ব্যক্তির নৈতিক জীবনে প্রথম কর্মই হ'লো দান-প্রতিদানের ব্যাপার। আমার যেমন মানসিক দাবি থাকে একটি কর্মের প্রতিদান পাবার বাসনায়, তেমনি আমার ওপরেও অন্যের সহস্র দাবি। একটা কাজ আমি করলে তার প্রতিদান আশা করি মনে মনে। টাকা নিলে নিশ্চয়ই ফেরত দেবে, কাজ করলে নিশ্চয়ই ন্যায্য মজুরী মিলবে—এই ধরনের সব আশা। শিশু জন্মেই যেমন মা-বাবার ওপর অকথিত দাবি গড়ে, তাকে যত্ন করা, লালন করাই তাদের কর্তব্য। বন্যা হলে সাহায্যের দাবি থাকে, মাইনে বাড়াবার আন্দোলন হলে সমর্থন থাকে। কিন্তু একটু নজরেই ধরা পড়বে যে এতোসব দান-প্রতিদানের তালিকার কয়েকটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই, মনে করি ওগুলো কর্তব্য। কারণ, ওগুলো শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, ন্যায্য। যেমন সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার কর্তব্য, পথে পদচারীকে চাপা না-দেওয়া আমার কর্তব্য, লোককে না-ঠকানো আমার কর্তব্য ইত্যাদি। এই কর্তব্যগুলোকে বলা হয় দাবি। দাবির সঙ্গে আরো একটা কথা জড়িয়ে থাকে যে, অন্যরা যেনো আমাকে এই সব দাবি থেকে বঞ্চিত না করে। আমার অধিকার ও দাবিকে মর্যাদা দিলে আমিও মর্যাদার প্রতিদান দেব।

নৈতিক কর্মে দান-প্রতিদান থাকে

দ্বিতীয় নৈতিক তথ্যটি হলো, যা পাচ্ছি তাকেই মেনে নিচ্ছিনা। সমস্ত অভাব-বোধকেই যেমন-তেমন করে মেটাবার কথা আমরা ভাবি না। অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে, কিছু কিছু জীবনের কাজে লাগে আর কিছু লাগে না, তাদের যতোই আপাত চটক থাক না কেনো। সামনে যা কিছু আসছে ও যতো কিছু পাচ্ছি তা থেকে আমরা বাছাই করে নিই। বাছাইয়ে আমাদের কল্পনা

যা পাচ্ছি তাকে আমরা মেনে নিই না

কাজ করে। কল্পনা ভবিষ্যতের লক্ষ্য বিষয়ে। বাছাই করবার আগেই মনে মনে একটা হিসেব থাকে, কী এবং কেনোর একটা ধারণা মনের তলায় তলায় কাজ করে। ভুলই করি আর সঠিক পথেই চলি, আমাদের জীবনে কোন্‌টা কাজে লাগবে আর কোন্‌টা লাগবে না এ-বিষয়ে একটা ধারণা দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্যে আমরা গড়তে থাকি। এই ধারণা মিলিয়েই আমাদের বাছাই।

তৃতীয় নৈতিক তথ্যটি হলো, **আমরা সবাই সবার কর্ম ও চরিত্র বিষয়ে রায় দিই**। ভুলত্রুটি, ভালোমন্দ বিষয়ে মতামত জানাতে দ্বিধা করি না।

সবার কর্মের বিষয়ে রায় দিই

অসংখ্য ঘটনা, বিষয় ও ব্যক্তির আগে 'ভালো' বিশেষণটি অহরহ জুড়ি। কিন্তু তারা ভালো কেনো? সেটা কি কোনো একটি নির্দিষ্ট গুণ সর্বত্র উপস্থিত আছে বলে—না, তারা জ্ঞাতা বা বক্তার ইচ্ছার বাহন বলে?

পৃথিবীর অধিকাংশ নৈতিক তত্ত্বের জন্ম হয়েছে এই ক'টি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে। এগুলো ব্যক্তির প্রশ্ন। কিন্তু প্লেটো-এরিস্টটল থেকে

ব্যক্তির কর্ম গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত

এডাম স্মিথ, কাণ্ট বা সিজউইক সবাই ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠী ও সংগঠন বিষয়েও মাথা ঘামিয়েছেন। আগে গোষ্ঠী ও ব্যক্তিতে বিরোধের অবকাশ কম ছিলো, কিন্তু আধুনিক কালের সঙ্গে এই বিরোধ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গোষ্ঠী বা সংগঠনের জন্য পৃথক ভাবে নীতির প্রশ্ন তুলতে হয়েছে। ব্যক্তির নৈতিকতা দিয়ে আর সংগঠনের পুরো বিচার হচ্ছে না।

নৈতিক তথ্যের আলোচনা থেকে এবার আমরা কয়েকটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমত, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সুতরাং তার সামাজিক নীতির প্রয়োজন। তেমনি ব্যক্তি হিসেবেও তার ব্যক্তিগত নীতির দরকার আছে। দ্বিতীয়ত, নীতির প্রশ্ন উঠছে ব্যক্তির স্বাধীনতা থেকে। ব্যক্তি জড় নয় যে শুধুমাত্র প্রকৃতির অন্ধ ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হবে। ব্যক্তি অন্যের অধীন নয় যে আদেশ-নির্দেশাদির ভয়ে স্বকীয় কর্ম থেকে বিরত হবে। জীবনে

কর্ম নিছক কাজ নয়, লক্ষ্যনির্দিষ্ট কাজ

প্রয়োজনটিই সমস্ত সময় এতো বড়ো নয় যে তার জন্যে সব-কিছুই বিনাবিচারে গ্রহণ করবে। সুতরাং ব্যক্তি বাছাইয়ের মধ্যে তার সঙ্কল্প ও স্বাধীনতা প্রকাশ করে। তৃতীয়ত, এই স্বাধীনতার প্রকাশ হয় কর্মে। কর্মহীন ব্যক্তির ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত নেই। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে নীতিশাস্ত্রের আলোচনায়

হিসাব করা হয় না বা প্রকৃতির নিয়মাদি নীতিশাস্ত্রের আলোচনা বহির্ভূত।
চতুর্থত, কর্ম নিছক কাজ করা নয়। লক্ষ্যের নির্দেশে কাজ করা।
লক্ষ্যহীন কর্ম সম্পূর্ণই বিশৃঙ্খল। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সমস্ত কর্মের পেছনেই উদ্দেশ্য লুকানো থাকে। বীজের মধ্যে যেমন প্রকৃতি অদৃশ্যভাবে কাজ করে। অঙ্কুরোদ্গম হয়, বৃদ্ধি পেতে পেতে বৃক্ষ হয়, তারপর পরিণতিতে পাই ফল। আবার ফল থেকেই বীজ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্য যা-ই হোক, প্রতি পদেই স্বাধীন মানুষ নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী কর্মের কথা ভাবে।

এই সবকটি বৈশিষ্ট্য মেলালেই নীতিশাস্ত্র, কর্মের নৈতিকতা বিচারের প্রসঙ্গ।

২। নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন (Some Questions of Ethics) :

নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণে অনেক মতবিরোধ। নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও পণ্ডিতদের বিতর্কের শেষ নেই। দার্শনিক গোষ্ঠী অনুযায়ী এক-একটি সমাধান। বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনার সারাংশ থেকে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য প্রশ্নাবলীকে সাজানো যায়।

(ক) শেষ পর্যন্ত কী শ্রেয় বা মঙ্গল? একটির বেশি মঙ্গল থাকলে তারা কি?

(খ) নৈতিক দায়িত্বের (moral obligation) ভিত্তি কি? আমরা সাধারণ ভাবেই ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত শব্দগুলো ব্যবহার করি। যদি উচিত বলতে সত্যিই বিশেষ কিছু বোঝায় বা পৃথিবীতে থাকে তবে তার স্বরূপ কি? অথবা একটু অন্যভাবে বললে ব্যাপারটা দাঁড়াবে—আমরা কি কাজ এমনিতে করি? কি কাজ আমাদের করা উচিত? যাকে উচিত বলে মনে করি, তা করাই বা কেনো উচিত? ঔচিত্যের স্বরূপ জানা একান্ত প্রয়োজন। ঔচিত্যের চরিত্র অস্পষ্ট থাকলে কখনোই বলতে পারবো না নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিটি কি।

নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি কি

(গ) কিসের দ্বারা আমরা নৈতিক দায়িত্বকে জানতে পারি? তা কি যুক্তি? আবেগ? না দুটোর সংমিশ্রণ? অনেক সময় নৈতিক দায়িত্ব জানবার বৃত্তিটিকেই নৈতিক বোধ বা বিবেক ইত্যাদি নামে চালানো হয়। এই নৈতিক বোধ বা বিবেক আমাদের নির্ভুল ভাবে কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ দেয়। যেমন—রসনা কটু, কষায়, তিক্ত ইত্যাদি স্বাদ বিষয়ে কখনো ভুল করেনা, তেমনি বিবেক আমাদের নৈতিকতার সঙ্কীর্ণ পথে সঠিকভাবে পরিচালনা করে।

যুক্তি না আবেগে দায়িত্বের জ্ঞান?

(ঘ) সঠিক কাজ বা ন্যায্যকর্ম বলতে আমরা কি বুঝি? যা আমরা সজ্ঞানে উচিত জেনে করি তাই কি ন্যায্য? যা আমরা উচিত বলে মনে করি বা না-করি, কিন্তু করেছি, তাই কি ন্যায্য? আমাদের বিচার কি ভ্রান্ত হয়? ভেবেছি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যে 'ক' কাজটি আমার করা উচিত, অথচ কাজের পর দেখা গেলো 'ক' কাজটির বদলে 'খ' কাজটি করা আমার উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে কর্মের ন্যায্যতা বলতে কি বুঝবো? হয়তো আমার 'খ' কর্মটি করাই উচিত ছিলো কিন্তু তখনকার সংবাদ মতো 'ক' কাজটি করায় কোনো বাধা উপস্থিত হয়নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখন ঔচিত্যের হিসেবে 'ক' কর্মটি করা উচিত হয়নি তখন 'ন্যায্য' শব্দটির অর্থ কি? কর্তার ইচ্ছা ও কর্মের সম্পর্ক ছাড়াই কি ন্যায্যতার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা আছে? অর্থাৎ অন্যরা যে যাই বলুক, কর্মের কর্তা-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা আছে কি? অথবা সেই কর্মগুলোই ন্যায্য—যা সমাজ বা সভ্যতার ছাড়পত্র পায়? সমাজ বললেই কাজগুলো যথোচিত ভাবে ন্যায্য হয়ে উঠছে?

যা করি তাই কি ন্যায্য?

(ঙ) কর্মের ন্যায্যতা ও অন্যায্যতাকে তফাত করে বুঝতে শেখা দরকার। কেমন করে ন্যায্যতা বুঝবো? সে কি কর্মের আত্যন্তিক চরিত্র? ন্যায্য কর্মের নৈতিকতা কি স্বপ্রকাশ? তা কি এমনিতেই সবার মধ্যে প্রকট? যদি কর্মের চরিত্রে তা নিহিত থাকে, তবে ফল লাভের পূর্বেই আমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করবো। কেউ কেউ ন্যায্যতাকে ফল দিয়ে বুঝছেন। সুতরাং প্রশ্নটি মৌলিক ভাবে উপস্থিত থাকছে যে ন্যায্যতা বিচারের মানদণ্ড কি?

ন্যায্যতা বুঝবো কি ভাবে?

৩। নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি সংজ্ঞা (Some Definitions of Ethics):

প্রাচীন আচার্যগণ যখনই নীতিশাস্ত্র বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন, তাঁদের মূল লক্ষ্য থেকেছে দৈনিক কর্মের ন্যায্যতা বিষয়ে। তাঁরা প্রধানতই ব্যবহারিক জীবনের প্রশ্নাদি বিষয়ে চিন্তিত থেকেছেন বেশি। তাঁরা তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে সবিশেষ মাথা ঘামান নি। যদিও কখনো কখনো প্রশ্নের আকারে তাঁদের আলোচনাকে উপস্থিত করা যায়, 'মানুষের মঙ্গল কি?' 'মঙ্গলের চরিত্র ও ন্যায়ের প্রকৃতি কি?' কার্যত কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর ঝোঁক তাত্ত্বিক সমাধানের

প্রাচীন আচার্যগণ নীতিশাস্ত্রের তাত্ত্বিক আলোচনা কম করেছেন

দিকে নয়, দৈনন্দিন কর্মের প্রকৃতি বিচারের দিকে। প্লেটো যখন প্রশ্ন তোলেন— 'ন্যায় কি ?' তখন বোঝা যায় যে তিনি আমাদের ধরাতে চাচ্ছেন 'আমাদের কী করা উচিত'। অবশ্য এমন কথা কখনো বলা যায় না যে, ওঁরা আদৌ তাত্ত্বিক চিন্তা করেন নি। যখন তাঁরা 'মঙ্গল' বা 'শ্রেয়' এবং 'উচিত' শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, তখন তাঁদের বিচারগুলো ছিলো এই ধরনের যে, 'ক হয় শুভ', 'খ হয় কর্তব্য' ইত্যাদি।

কিন্তু বর্তমান কালে, বিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরা ব্যবহারিক দিককে পরিত্যাগ করে নীতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনার শাস্ত্র তৈরি করতে চাচ্ছেন। তাঁদের লক্ষ্য **জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান**। উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দের ধারণা কেউ জীবনে ব্যবহার করবে কি করবে না, সেটা বড়ো কথা নয়। কার্যত, তত্ত্ব হিসেবে বিষয়টিকে জানলেই চলে। ওঁদের মতে তাই 'ব্যবহারিক জ্ঞান' (practical knowledge) বলতে কিছু হয় না। একজন পণ্ডিতের ভাষায় তাই জানা যাচ্ছে 'The moral philosopher's task is now conceived, not to be one of conducting a thecretical enquiry into practical wisdom, but to be one of investigating questions, judgments, doubts and beliefs that are themselves theoretical.' অর্থাৎ যা-কিছুকেই আমরা ছাড়পত্র দিই না কেনো, তার মর্যাদা জীবনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নয়, নিছক পুঁথির বিচার-বিবেচনার বিষয়। যেমন কিনা প্রকৃতিবিজ্ঞানে আলোচনা এবং সত্যাদি। প্রকৃতিবিজ্ঞানের কোনো ব্যবহারিক মূল্য আমাদের কর্মে থাকে না; শুধু জেনে নিলেই চলে। বৈজ্ঞানিকরা পূর্ববর্তী জ্ঞানের ওপর পরবর্তী কাঠামোটি তৈরি করেন মাত্র।

আধুনিকদের আলোচ্য তাত্ত্বিক প্রশ্ন

অধ্যাপক সি. ডি. ব্রড তাই লেখেন 'Ethics may be described as the theoretical treatment of moral phenomena'। নীতিশাস্ত্রবিদদের প্রকৃতিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকদের পর্যায়ে আনবার জন্যেই ব্রডের এই ব্যাখ্যা। নৈতিক ঘটনার তাত্ত্বিক আলোচনাই যদি ব্রড-কথিত নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য হয়, তবে সামাজিক মানুষের পথ-নির্দেশক হিসাবে তার আর কোনো ভূমিকা থাকে না। ব্যাখ্যাটিকে আরো সুস্পষ্ট করবার জন্য ব্রড নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। (ক) নৈতিক বিচার, (খ) নৈতিক আবেগ ও (গ) নৈতিক ইচ্ছা। তিনটি বুঝবার সুবিধের জন্যে তিনি তিনটি উদাহরণ দেন।

(ক) নৈতিক বিচার (moral judgment)—'আমি জানি বা আমার বিশ্বাস যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত....আর কাউকে অর্থহীন আঘাত করা অনুচিত। নৈতিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের এই টুকরোগুলোই হলো **নৈতিক বিচার**'।

(খ) নৈতিক আবেগ (moral emotion)—'ধরা পড়লে আমার মন বিমর্ষ হয় এবং নিজেকে অস্বীকার করতে ইচ্ছে করে। শাস্তির ভয় বা লজ্জার ব্যাপার শুধু নয়। এই অনুভূতিগুলোকে বলা হবে **নৈতিক আবেগের** উদাহরণ।'

(গ) নৈতিক ইচ্ছা (moral volition)—দুটো বিকল্প কর্মের মধ্যে আমি যখন একটা সঠিক ভেবে আমার চিন্তার দ্বারা সিদ্ধান্তে প্রভাবান্বিত হই, তখন **নৈতিক ইচ্ছার** প্রমাণ পাই।

অধ্যাপক ব্রডের মতে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা 'নৈতিক বিচার'কে নিয়ে। ব্রডের ভাষায় নৈতিক বিচার হলো 'ন্যায় বা অন্যায় বিষয়ে মতামত' ('opinion, that is something is right or wrong')। গোড়াতেই লক্ষ্য করা দরকার যে, নৈতিক বিচার আমাদের আবেগজাত মানসিক প্রতিক্রিয়া নয়, এমন কি আমাদের সম্মতি-অসম্মতি বিষয়ে মনোভাবের প্রকাশও নয়। স্পষ্টতই 'মতামত' শব্দটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অধ্যাপক ব্রড তথ্যমূলক বিজ্ঞান বা আলোচনার ক্ষেত্রে আসতে চাচ্ছেন। কারণ, বিজ্ঞান সর্বদাই তথ্যের (fact) আলোচনা করে। একমাত্র তথ্য-নির্ভর মতামতই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে—যেমন ন্যায়শাস্ত্রের বচনই সর্বদা বক্তব্য হিসেবে সত্য-মিথ্যার এলাকাভুক্ত। ব্রড বোঝাতে চাচ্ছেন 'মতামত' কার্যত 'তথ্যের বিচার' (judgments of fact), তন্নিষ্ঠ বা মন্ময় রুচির আলোচনা (judgments of taste) নয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের চর্চাকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পর্যায়ে তুলতে একটা সমস্যা থাকে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতো প্রশ্ন হলো 'কি কি অবস্থায় এমন নৈতিক বিচার ঘটে?' 'বা এটার কারণগুলো কি?' 'ফলই বা কি?' এই প্রশ্নের আলোচনায় জানা যাবে যে ঘটনার বিচার শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াবে ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক মনস্তত্ত্বের ওপর। ব্রডের আলোচনা থেকে ধারণা হয়, তিনি মূলত বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করতে চাচ্ছেন—যা হলো **ভালো** ও **মন্দ**, **শুভ** ও **অশুভ**।

ব্রড বলেন নীতিশাস্ত্রের আলোচনা নৈতিক বিচার বিষয়ে

বিখ্যাত পোল পণ্ডিত হ্বেস্টারমার্ক লিখেছেন—নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য হলো

"only be to study the moral consciousness as a fact." অধ্যাপক রস্ তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন এমন একটা বিন্দু থেকে—যখন "the existence of what is commonly called the moral consciousness, ...the existence of a large body of beliefs and convictions to the effect that there are certain kinds of acts that ought to be done and certain kinds of things that ought to be brought into existence."

আমাদের একটি নৈতিক চেতনা আছে, যা জানে কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না। অধ্যাপক রস্ কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের একটি পার্থক্য বিষয়ে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যে তথ্য পাই এবং সেই তথ্যকে কেন্দ্র করে সত্য-মিথ্যার প্রসঙ্গ তুলবার কারণ বিজ্ঞানের তথ্যকে পর্যবেক্ষণে সত্য বা মিথ্যা বলে জানা যায়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা যতোই বলি না কেনো যে আচরণের সত্য বা মিথ্যা আছে, রস্ বলেছেন আমরা তা কখনোই সাক্ষাৎভাবে জানতে পারবো না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অভাবে কিসের দ্বারা নীতিশাস্ত্রের বক্তব্যকে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলবো?

রস্ বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য করেন

অর্থাৎ প্রশ্নটা উঠছে এই যে নীতিশাস্ত্রের সত্য-মিথ্যা আবেগনির্ভর না যুক্তিনির্ভর? সাধারণত আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন ধরনের বাক্য জানি। **তথ্যের জ্ঞান,** যেমন বলি 'গোলাপটা লাল'। **আবশ্যিক জ্ঞান,** যেমন ২+২=৪। এবং সবশেষে **মূল্যের জ্ঞান,** যেমন 'গান্ধীজী মহাত্মা ছিলেন'। বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে যে, মূল্যের জ্ঞান আমাদের সত্যিই প্রকৃত জ্ঞান কি না। মূল্যের জ্ঞান বা মূল্যবোধ ইন্দ্রিয়জাত নয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষও নয়। এমনকি তারা দুটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্কও নয়। সুতরাং তার চরিত্র বিষয়ে দার্শনিকদের দ্বিধার অন্ত নেই। আবার তেমনি মূল্যের ধারণা যদি সত্য না জানায় তবে মূল্যের সমস্ত বক্তব্যই অর্থহীন। নীতিশাস্ত্রও সঙ্গে সঙ্গেই অবাস্তর বলে প্রমাণিত হবে। এই প্রসঙ্গেই বর্তমানের দার্শনিকরা (যেমন ব্রড ইত্যাদি) কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনা বা শব্দার্থ বিচারে নেমেছেন। অথবা বড়োজোর ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক আলোচনা চলতে পারে কেনো এবং কবে কোনো একটি বিশেষ প্রত্যয়ের জন্ম হয়েছে। যেমন আলোচনা করে দেখিয়েছেন ওয়েস্টারমার্ক।

জ্ঞানে তিন ধরনের বাক্য আছে

৪। নীতিশাস্ত্র কি শুধু ব্যবহারিক? শুধু তাত্ত্বিক? (Is Ethics only theoretical? Only Practical?)ঃ

বর্তমান কালের দার্শনিকরা অধিকাংশই বলতে চাচ্ছেন যে, নীতি-শাস্ত্রের আলোচনা নিছক তত্ত্বগত। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। নীতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলোকে তাঁরা আলোচনা করে তার প্রকৃত তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে চাচ্ছেন। যেমন 'শুভ', 'অশুভ', 'ন্যায়', 'অন্যায়' ইত্যাদি শব্দাবলীকে তাঁরা ব্যবহারিক কর্মের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে শুধু মাত্র শব্দার্থের বিচারে দেখাচ্ছেন যে তাদের প্রকৃত অর্থ কি। যেমন দার্শনিক মুর বলছেন নৈতিক শব্দাবলীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের তাৎপর্য পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে। মুর লিখছেন 'My business is solely with **that object or idea,** which I hold, rightly or wrongly, that the word 'good' is generally used to **stand for.**' মুর বিচারে তাই দু'ধরনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তিত হন। একটি বক্তব্য সংশ্লেষক ও অন্যটি বিশ্লেষক। বিশ্লেষক বক্তব্যগুলো ওঁর মতে শব্দের অর্থ বিষয়ক আর সংশ্লেষক বক্তব্য হলো আলোচ্য বিষয়ের তথ্য। মুর শব্দের প্রকৃতি বিচার করে তাই দেখান—

(ক) শব্দগুলো হয় বস্তু বা ধারণা বিষয়ক; তারা সরল বা মিশ্র হ'তে পারে।

(খ) সংজ্ঞার অর্থ হলো মিশ্র ধারণাকে তার অংশে বিশ্লিষ্ট করা। যেমন—নরসিংহকে নর ও সিংহ অংশে ভাগ করা যায়।

(গ) সরল ধারণার শব্দাবলীকে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন 'হলুদ'-রঙ বাচক শব্দটি। 'শুভ' শব্দটি নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর। একে সংজ্ঞাপ্রকরণে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব নয়। অনেকটা ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝি কি শুভ এবং শুভ শব্দটির অর্থ কি।

(ঘ) সরল ধারণাগুলো হয় প্রাকৃতিক বা প্রাকৃতিক নয়।

অধ্যাপক মুরের আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, নীতিশাস্ত্রের শব্দগুলোকে সংজ্ঞাপ্রকরণে বা শব্দার্থ বিচারে জানা যায়; এবং জানলেই নীতিশাস্ত্রের আর কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অবশিষ্ট থাকে না। তবে সমস্ত শব্দকেই সংজ্ঞায় যেহেতু নির্দিষ্ট করা যায় না, সুতরাং কিছু কিছু মৌলিক, মুরের ভাষায় সরল ধারণাকে বুঝবার জন্য আমাদের দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হবে। সুতরাং কিছুটা বিচার এবং কিছুটা ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরতা থাকে।

মুর: নীতিশাস্ত্রের প্রত্যয় শব্দার্থ বিচারে জানা যায়

কার্যত কিন্তু বিচারের ক্ষেত্র কেবলমাত্র মিশ্র ধারণা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। মিশ্র-ধারণাকে সরল ধারণায় পর্যবসিত করতে পারলে আর বিচার চলে না। সরল ধারণাকে ইন্দ্রিয়ের বোধে জানা যাবে। কিন্তু মূর ব্যবহারিক জীবনে এই সব ধারণার মূল্য বিষয়ে মোটেই চিন্তিত নন। ওঁর মতে মিশ্রকে মিশ্র বলে এবং সরল ধারণাকে সরল বলে জানলেই চলবে।

কিন্তু সাধারণ ভাবেই আমরা জানি সামাজিক মানুষের নিত্যকর্ম আছে এবং প্রতিটি কর্মের বিচার থাকে। কারণ, কর্মের চরিত্রের ওপর তার ভালোমন্দ, শুভ-অশুভ নির্ভর করে। কর্মের সূত্রেই সমাজবাসী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং একটি কর্ম থেকে আরো অসংখ্য কর্মের সূত্রপাত হতে থাকে। কাজেই একদিকে কর্ম যেমন মানুষের জীবনে অত্যন্ত মৌলিক, তেমনি অন্যদিকে কর্মের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিষয়ে মন প্রশ্ন তোলে। সর্বদাই মানুষ জানতে চায়—কোন্ কাজটা সে করবে এবং কোন্টা সে করবে না। অসংখ্য কর্ম থেকে কেনো একটি সে বেছে নেবে এবং অন্য গুলোকে বাতিল করবে। অর্থাৎ প্রতি পদক্ষেপেই মানুষকে বিচার করে চলতে হয়।

সে বিচার করে কিসের ভিত্তিতে? অধ্যাপক মূরদের বিবেচনায় শুধুমাত্র শব্দের বিশ্লেষণ ইত্যাদিতেই প্রত্যয়গুলোর যাথার্থ্য এবং তাৎপর্য জানা যায়। কিন্তু একটু আগেই আমরা দেখেছি যে, নীতিশাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্র তাত্ত্বিক হলেও জীবনের প্রসঙ্গ বাদ পড়ে না। মানুষ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তার প্রতিটি কর্মের চরিত্র বিষয়ে খোঁজ করবে এবং নীতিশাস্ত্রকে প্রতি মুহূর্তে রায় দিতে হবে। তাই কেবলমাত্র জানলেই চলে না যে নীতিশাস্ত্রের 'শুভ' প্রত্যয়টি সরল ধারণা, তাকে সংজ্ঞায় সুস্পষ্ট রূপ দেওয়া যায় না এবং অভিজ্ঞতাতেই শুধু তাকে জানা যায়। কারণ, কি কারণে শুভ এই প্রশ্নটি স্বতঃই উত্থাপিত হবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার জবাব পাওয়া যাবে ততোক্ষণ কর্মের স্বাভাবিক উৎসটিই রুদ্ধ থাকবে। শুভ বা অশুভ বিষয়ে কেবলমাত্র মানসিক আবেগের ওপর নির্ভর করলেই চলে না যে, বলে দেওয়া হলো আপনা থেকেই তাকে বোঝা যাবে। কারণ, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের মনে শুভ বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ধারণার উদ্ভব হবে এবং জীবনে আবেগ ছাড়া আর কিছুকেই সত্য বিচারের ভার দেওয়া যাবেনা। কার্যত তাই কেবলমাত্র আবেগ নয়, নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যুক্তিও থাকছে।

শব্দার্থ বিচার নয়, প্রশ্ন হবে কি কারণে শুভ?

তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও একই রকমে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে, আমি কেনো নৈতিক হবো? এই প্রশ্নের জবাব না মিললে নীতিশাস্ত্রকে জ্ঞানের বিষয়ভুক্ত করা যায় না। এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণই ব্যবহারিক।

৫। নীতিশাস্ত্রের সীমা (Scope of Ethics):

যে-কোনো শাস্ত্রই আমাদের প্রাথমিকভাবে আকর্ষণ করে তার প্রয়োগ-মূল্যের দিক থেকে। কারণ, ব্যবহারিক জীবনযাত্রাতেই জ্ঞানের উৎস ও প্রসঙ্গ। সুতরাং প্রশ্ন, আমরা নীতিশাস্ত্রের চর্চা করি কোনো? নীতিশাস্ত্র আমাদের শেখায়—কেমন করে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। কোন্ কাজগুলো ভালো এবং কোন্‌গুলো মন্দ—এই প্রশ্ন ওঠে; কারণ যে-কোনো কাজকেই সঠিকভাবে বা ভুলভাবে করা যেতে পারে।

নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে কয়েকটি শব্দকে আমরা সাধারণত জড়াই। ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই কিন্তু এদের অর্থ আমরা বুঝতে পারি। যেমন অভিজ্ঞতায় বুঝি কোন্‌টা গরম এবং কোন্‌টা ঠাণ্ডা। গরম-ঠাণ্ডা হলো বস্তুর গুণ, সত্য মিথ্যা হলো বস্তুর যুক্তি বা কারণ আর শুভ-অশুভ বস্তুর মূল্যের সঙ্গে জড়িত। নীতিশাস্ত্র মূল্যের শাস্ত্র।

আমরা জীবনে দু'ধরনের প্রশ্ন তুলি: 'কিভাবে' (how) ও 'কেনো' (why); একটি বস্তুর 'কারণ' এবং অন্যটি বস্তুর 'ভালোমন্দ'। প্রাথমিকভাবে, এমনকি নিছক শিশুরও প্রশ্ন থাকে, এটা কেনো অর্থাৎ কিসের জন্যে? আর সেই সঙ্গেই বাড়তি প্রশ্নটি থাকে—ভালো কেনো ভালো বা কিসের জন্যে ভালো? অর্থাৎ সে জানতে চাচ্ছে ভালো-মন্দের তফাত থাকবে কেনো? এই প্রশ্নটিকে আরো একটু স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায়—জীবনের কোনো মৌলিক তাৎপর্য বা মূল্য আছে কি? যে জগতে আমরা বাঁচি মরি, তারও কি কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে? এই প্রশ্নগুলোর জবাবের সঙ্গে আমরা দর্শনের এলাকায় পা বাড়াই এবং বুঝি এসব প্রশ্ন তুলে নীতিশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র হচ্ছে যাকে বিখ্যাত এক ভাববাদী দার্শনিকের ভাষায় বলতে পারি 'The science of systematic valuing' or 'the valuing activity of man made systematic'। নীতিশাস্ত্রকে এই সংজ্ঞায় বিজ্ঞান বলা যায়। বিজ্ঞানের দুটো বিভাগ। একটিকে বলা হয় আদর্শ বা নীতিমূলক (Normative), যার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছোবার পদ্ধতি আছে। অন্যটি হলো

জীবনে প্রশ্ন দু'টি:
(ক) কিভাবে ও
(খ) কেনো

বর্ণনামূলক (Descriptive), যা কেবল সম্পর্কের বাহ্য সূত্রগুলোকে নির্দেশ দেয়। বস্তু শেষ পর্যন্ত নিজে কী, তার পরিচয় দেয় বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। বস্তুর পরিচয়, বৈজ্ঞানিকরা যাকে বলেন 'what of a thing' পাই অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কে। এই সম্পর্কের সর্বপ্রধান প্রকাশ কার্য-কারণে। আর, আদর্শ বা লক্ষ্যের সূত্রে আমরা বস্তুর মূল্য বিচার করি। মূল্য বিচারের ক্রম থাকে অর্থাৎ একটার চেয়ে আর একটা কিছু কম বা বেশি ভালো বা মন্দ। এই ভালো-মন্দের হিসেব থেকে আমরা বুঝতে শিখি কি করা উচিত আর কি বস্তু নিজে। অর্থাৎ বস্তু যা আছে এবং যা মূলত হতে পারে। যদি অভিজ্ঞতায় জানি যে একটি বস্তু অন্যটি থেকে ভালো, তবে আমরা সাধারণ ভাবেই বুঝতে পারি যে সেই বস্তুটিকে অন্যদের থেকে কিছুটা তফাত হতে হয় বা হওয়া উচিত। আচরণের বা ব্যবহারের এই উচিত চরিত্রটিকেই (ঔচিত্যকে) আমরা বলতে পারি নীতি বা মান।

'নর্ম' বা নীতি শব্দটি কিন্তু বর্ণনামূলক বিজ্ঞানেও আছে। সেখানে তার অর্থ 'গড়পড়তা' বা যা 'প্রচলিত'। তাতে বস্তুর অস্তিত্বের কথা আছে, কিন্তু ঔচিত্যের কথা নেই। একই শব্দের দুটি অর্থ বোঝাবার জন্য বলা চলে যে নৈতিক অর্থে নীতির তাৎপর্য হলো এমন একটি নিয়ম—যা যুক্তি বা আবেগের দ্বারা কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যে-কোনো নীতিই কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং তফাতটা যেহেতু বিশেষ স্পষ্ট হয় না, ভাববাদী দার্শনিক সেটা স্পষ্ট করবার জন্যে বলেন 'That which makes a principle a norm is that it controls actions through consciousness of value and **through the sense of obligation or 'ought'** that arises from the consciousness of value'। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকেই মান বলি—যা কার্যত জীবনে সার্থক করা যাবে। জীবনে নীতিকে প্রতিষ্ঠার অর্থ জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। বলা চলে একধরনের জ্ঞানকেই প্রতিষ্ঠা করা।

নীতিশাস্ত্রকে যেহেতু মূল্যের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, আমাদের জানা দরকার মূল্য বলতে কী বোঝায়। প্রথমেই বলা হবে, যা **আমাদের বাসনা মেটায় তারই মূল্য আছে।** দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, যা **জীবনকে রক্ষা করে।** এই বক্তব্যকে বেশি দূর ঠেলা যায় না; কারণ এরিস্টটলের মতো জানাতে হয় যে শুধুমাত্র জীবনই আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য 'শুভ' জীবন। তৃতীয় বক্তব্য হলো, তাই একমাত্র ভালো যা আত্মজ্ঞানের সাহায্য করে।

মূল্য :
(ক) যা বাসনা মেটায়
ও
(খ) যা জীবন রক্ষা করে

কারণ আত্মজ্ঞানের সূত্রেই জীবনের শুভকে ধারণা করা যায়। নইলে জীবনের কোনো মৌল ভালো বা মন্দ বলে কিছু নেই।

নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে হেনরী সিজউইক লিখেছেন, 'To sum up: the subject of Ethics, most comprehensively understood, includes (1) an investigation of the constituents and conditions of the good and wellbeing of men considered individually, which chiefly takes the form of an examination into the general nature and particular species of (a) Virtue or (b) Pleasure, and the chief means of realising these ends; (2) and investigation of the principles and most important details of Duty or the Moral Law (so far as this is distinguished from virtue); (3) some enquiry into the nature and origin of the Faculty by which duty is recognised and, more generally, into the part taken by Intellect in human action, and its relation to various kinds of Desire and Aversion; (4) some examination of the question of human Free Will.

সিজউইকের তালিকায় পাচ্ছি নীতিশাস্ত্র (১) শুভ ও মঙ্গলের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ করে ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সেই সূত্রেই ধর্ম ও সুখের আলোচনা করে এবং জানায় কি ভাবে তা পেতে হবে, (২) কর্তব্য ও নৈতিক বিধির অনুসন্ধান করে, (৩) কর্তব্য জানবার বৃত্তি ও বিশেষত বুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করে, (৪) মানুষের স্বাধীন সঙ্কল্পের খোঁজ নেয়।

৬। নৈতিক তত্ত্ব ও তথ্য (Ethical theory and facts):

নৈতিক তথ্যের নজীরেই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত। নৈতিক তথ্য বলতে আমরা বুঝি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা কার্যকরী রীতিনীতি। নৈতিক তত্ত্বের কাজ তাদের ব্যাখ্যা করা। আমাদের আচরণ, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ভালোমন্দের ধারণায় জারিত থাকে কিন্তু কর্মের ভালোমন্দ তার ভালোত্ব বা মন্দত্ব পায় নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে; কারণ নীতির সূত্রেই তাদের বিচার। আমাদের জানতে হয়—কোন তথ্যগুলো উচিত বা অনুচিত। এ-বিষয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কারগুলোর দিকে,

সমাজে প্রচলিত বিধি এবং নিষেধের দিকে। সংস্কারের ব্যাপারে দার্শনিকদের প্রচুর মতবিরোধ; কিন্তু মোটামুটি ন্যূনতম ভাবে ধরা হয়েছে যে **আইনের মধ্যে** আমাদের সামাজিক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি প্রকাশ পাচ্ছে।

এই স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির বিচার দু'ধরনের। একটি, **বিশেষ কর্মের বিচার** অন্যটি, **বিশেষ শ্রেণী বা জাতের কর্মের বিচার**। প্রথমটিতে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিবিশেষের কর্মের আলোচনা। যেমন ইবসেনের চরিত্রে নোরার গৃহত্যাগ করা উচিত হয়েছে কিনা? এক্ষেত্রে প্রচুর বিবাদ থাকে। কারণ, অবস্থা অনুযায়ী কর্মের চরিত্র পাল্টায়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য ও বিরোধের সুযোগ কম। প্রথমটির ক্ষেত্রে, তফাতগুলো সব ব্যতিক্রম। যেমন আমরা জানি সর্বদা সত্যকথা বলা উচিত। কিন্তু মাকে সন্তানের দুঃসংবাদ দেওয়া বিষয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা এই অলিখিত নিয়মটি ভঙ্গ করতে পারি। সুতরাং দার্শনিকদের মতে 'In all such cases it is always assumed that the man is the fundamental thing and that the variation from it must justify itself by an appeal to some higher principles or to some more general theory of the good which will explain or justify the exception'; এই বক্তব্যে জানা যাচ্ছে যে, ব্যক্তির সীমায় নীতিটি ঠিকই থাকছে, ব্যত্যয় যতোটুকু ঘটছে তাকে আমরা ব্যতিক্রম বলবো। কিন্তু ব্যতিক্রমগুলোকে অন্য কোনো বৃহত্তর নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে বা এমন একটা শুভবোধের প্রত্যয় থেকে তৈরি হতে হবে যার সমর্থনে ব্যতিক্রমটি তাৎপর্য পাবে। আমাদের উদাহরণে মাকে রক্ষা করা নামক বৃহত্তর মঙ্গলের আদর্শ যেমন ওই মিথ্যাচারটুকুকে আড়াল করছে।

কর্ম:
বিশেষ কর্ম ও বিশেষ জাতের কর্ম

আর ব্যক্তির প্রসঙ্গ বা ব্যতিক্রমের বাইরে (ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেমন) নীতিটিই সবচেয়ে মূল্যবান। নীতিশাস্ত্র কর্মের শ্রেণী বা জাতির সঙ্গেই জড়িত; অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র সামান্য (universal) কর্তব্য বিষয়েই চর্চা করে। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত সামাজিক সংস্কার নিয়ে; কারণ তার মধ্যে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম বিশ্বাস লুকিয়ে আছে। ('Conventionl morality is precisely those customs, laws and judgments upon which is the mass of men have agreed; and it is precisely this unanimity, this **sensus communis**

which constitutes the starting point of Ethics.')। সবাই মানে বলেই এই সব সংস্কারের মূল্য নয়; এই সংস্কারের মধ্যে একটি জাতির মন গোপনে কাজ করে বলেই তার মূল্য।

কোন্‌টা ভালো এবং কোন্‌টা মন্দ এ-বিষয়ে আমাদের বিচার এবং বিচারের যুক্তিবিন্যাসে যে-বিরোধ, তার শিকড় রয়েছে দু'টো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে। একটি হলো রক্ষণশীলতা ও অন্যটি উদারনীতি। প্রথম বক্তব্যে জানি কিছু কিছু কর্তব্য ও কর্ম আছে যা আত্যন্তিক ভাবে (inherently) ভালো বা মন্দ। এমনকি জীবনের মূল্যও সাপেক্ষ (relative)। তার মূল্য নির্ধারিত হবে উপযোগিতা দিয়ে। এই বক্তব্যটিকে রূপসর্বস্বরীতি (formalistic) বলা যায়; কারণ 'this type of argumentation assumes that good or value is a quality, an essence, or a form, inherent in objects or acts themselves'—। দ্বিতীয় বক্তব্যটি, এর সম্পূর্ণ প্রতিবাদী।

ভালোমন্দের বিচার নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীতে

এই বক্তব্য অনুযায়ী নীতিশাস্ত্রকে ভাগ করা যায়—

(ক) রূপসর্বস্ব রীতি

(খ) উদ্দেশ্যবাদী। উদ্দেশ্যবাদের দু'টো ভাগ { (১) সুখবাদী
(২) পরিপূর্ণতাবাদী (আত্ম-উন্নতি) }

উদ্দেশ্যবাদকে আবার ব্যক্তিক ও সামাজিক ভাগে ভাগ করা যায়। ফলে আমরা পাচ্ছি—

উদ্দেশ্যবাদ—(১) সুখবাদী { ব্যক্তিক
সর্বজনীন (সামাজিক) }

(২) পরিপূর্ণতাবাদ { ব্যক্তিক
সর্বজনীন (সামাজিক) }

(গ) উচিত্য (ought) বা কর্তব্য (duty)—আমাদের আলোচনায় জানা গেলো শুভ কি এবং ন্যায্যতার সঙ্গে মঙ্গলের কি সম্পর্ক। সঙ্গে সঙ্গেই এ কথাও আমরা বলতে চেয়েছি যে, যা সঙ্গতভাবেই ন্যায় তাকে জীবনে অনুসরণ করা উচিত। অর্থাৎ তা আমাদের কর্তব্য। কর্তব্য ঐশ্বরিক নির্দেশ (Command) নয়। কর্তব্য এমন কি কান্টীয় 'সর্তাধীন নির্দেশ' (Categorical Imperative) ও নয় কারণ কাণ্ট তাকে কোনো রকম বাসনা ও ফলাফলের সঙ্গে জড়াতে

কর্তব্য ঐশ্বরিক নির্দেশ বা শর্তহীন নির্দেশ নয়

চান না। কাণ্টের প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, কাণ্ট মানুষের মন থেকে বাসনা-কামনা দূর করে দেবার চেষ্টায় মানুষের মনুষ্যত্বই দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। বাসনা কামনার সূত্রেই মানুষের কল্পনা তৈরি হয় এবং কল্পনা আছে বলেই মানুষ প্রকৃতিতে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক হতে পেরেছে। মানুষের ইতিহাস তাই সময়ের পর্বে পর্বে বিবর্তনের ইতিহাস। এই বিবর্তন কেবলমাত্র পরিবর্তন নয়, উদ্‌বর্তনও (development)। প্রকৃতিতেই যেহেতু এই উদ্‌বর্তন ঘটছে আমরা বলতে পারি আমরা প্রকৃতি নির্দিষ্টভাবেই আমাদের স্বভাবের পরিণতি খুঁজছি।

স্বাভাবিক বা স্বভাবগত পরিণতির সূত্রেই 'ঔচিত্যের' তাৎপর্য। যদি বলি, কিছু আমার করা উচিত তবে বোঝাতে চাই যে কিছু কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য আমার আছে যার নিহিত মঙ্গল সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং আমি তা আমার জীবনে সফল করবার ইচ্ছে রাখি। আমার এই কর্মের আবশ্যিকতায় নিশ্চয়ই কারো কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এমন কি অন্যায় করলেও কেউ শাস্তি দিতে আসবে না। প্লেটো শুধু জানিয়েছিলেন যে 'the greatest penalty of wrong doing is to grow into the likeness of the bad man'। একজন দার্শনিক নৈতিক ঔচিত্যের চরিত্র বোঝাতে চমৎকার লিখেছেন যে 'The ethical ought is like the logical ought ; indeed the logical ought is a very special case of the ethical.'। ন্যায়শাস্ত্রের উচিত জানায় যে 'সত্য জানতে চাইলে সুসম্বদ্ধভাবে চিন্তা করো'। কিন্তু তা কখনো বলে না যে মানুষ বিশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারে না। শুধু জানায় বিশৃঙ্খল হলে তুমি সত্যবিচ্যুত হবে এবং তোমার চর্চার কোনো অর্থই থাকবে না। নৈতিক উচিত কখনোও নির্দিষ্ট কর্ম বিষয়ে মাথা ঘামায় না। তার লক্ষ্য সমস্ত কর্মের ভিত্তি, যা-ই একমাত্র লক্ষ্য, যা-ই মঙ্গল,- যা না হলে মানুষের চলে না এবং একমাত্র যাকেই মানুষ খুঁজছে চিরকাল।

স্বভাবের পরিণতির সূত্রেই ঔচিত্য

এই ঔচিত্য বা কর্তব্য যে চিরকাল একভাবে নির্দিষ্ট তা নয় বা কখনোই যে তাতে ভুলভ্রান্তি থাকে না তা নয়। লেসলী ষ্টিফেন সঠিক বলেছিলেন বিবেক হলো সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার কণ্ঠ। ব্যক্তির কানে তার পরিচয়। অর্থাৎ ষ্টিফেন বলছেন সমগ্র জাতির সঞ্চিত বোধ ও কর্ম ব্যক্তির জীবনেই প্রকাশ পায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ভুল হতে পারে। তবু কর্তব্যই আমাদের জীবনের নিয়ন্তা।

মানুষের প্রকৃতিই কর্তব্যকে এই অধিকার দিয়েছে তাই বাট্‌লার চমৎকার বলেন 'if it had power, as it has authority, it would absolutely govern human life.'

এবারে একটি সমস্যা ওঠে। আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে নৈতিক শুভ বলে কিছুই থাকছে না, সবটাই কর্তব্য হয়ে যাচ্ছে। কাণ্ট তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছিলেন একমাত্র শুভ ইচ্ছা সর্তহীনভাবে শুভ। কাণ্টের কাছে এই বক্তব্যটির অর্থ ছিলো, কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যই সব। এমন কি ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদের অনেকের কাছেও কর্তব্যপরায়ণতা কেবলমাত্র আত্যন্তিকভাবে যে শুভ তাই নয়, সমস্ত শুভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমরা দেখেছি যে কর্তব্যের লক্ষ্যই হলো মঙ্গলের জন্ম দেওয়া। কর্তব্য নির্দিষ্ট মঙ্গল লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কর্তব্যকে একটি শুভ বানালে কথাটির কোনো অর্থ থাকে না। যদি আমার কর্তব্য হয় কর্তব্য পালন করা তবে বুঝতে হবে কর্তব্য কোনো মঙ্গলের জন্ম দেবে এবং যদি সত্যই কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা না থাকে তবে ওই কর্তব্য কখনোই আমার কর্তব্য হতে পারে না। কার্যত তাই কর্তব্য নিজের জোরে দাঁড়ায় না এবং কর্তব্যের কর্তব্য বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। কাণ্টের মতে একমাত্র কর্তব্যকেই জীবনের লক্ষ্য বললে কর্তব্য শব্দটি অর্থহীন অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে থাকে।

কর্তব্য ও মঙ্গল সম্পর্কিত

এ কথা মানলে আবার প্রশ্ন ওঠে যে তবে কি কর্তব্যপরায়ণতা অন্তর্নিহিত শুভ নয়? সম্পূর্ণই বাইরের জিনিস? আমাদের জবাব হলো, কর্তব্য-পরায়ণতা অন্তর ও বাইরের মিশ্রণে গঠিত। বহুলাংশেই এই মঙ্গলটি বাইরের জিনিস। এই মঙ্গলের অর্থ আমাদের কাছে আমাদের বাসনা কামনার চরিতার্থতা। কিন্তু এই চরিতার্থতার অনুসন্ধান যেমন মানুষের লক্ষ্য হতে পারে তেমনি কখনো কখনো কেবলমাত্র নৈতিক ব্যবহারের শুদ্ধতা আমাদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির হতে পারে। অর্থাৎ তখন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কল্পনা কিছুটা চাপা পড়ে এবং পদ্ধতির চর্চাটাই বড়ো হয়ে ওঠে। সুতরাং মনে রাখতে হবে 'Moral obligation is, we saw, the claim upon us of ends appointed by our own nature.'

অনুশীলনী

১। Define Ethics and Indicate its scope

২। Is Ethics only a theoretical study?

৩। Discuss why Ethics should be treated as a practical branch of study.

৪। Write notes on the following fundamental concepts of Ethics—

(a) good, (b) right, (c) and ought.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক

১। নীতিশাস্ত্রকে ইতিপূর্বেই আমরা বিজ্ঞান বলেছি। আমাদের সংজ্ঞায় আছে নীতিশাস্ত্র হলো 'বিধিবদ্ধ মূল্যবিচারের বিজ্ঞান। কোনো শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বললেই জানা দরকার ওই শাস্ত্রটি কী ধরণের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দুই জাতের। একটিকে বলা হয় বর্ণনামূলক (descriptive) এবং অন্যটি আদর্শ বা নীতিমূলক (normative)। বস্তুর সত্তা বিষয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাকেই বর্ণনামূলক বিজ্ঞান বলা হয়। বস্তুর সত্তা বস্তুর স্থানকালের অস্তিত্বে প্রকাশ পায়। এই অস্তিত্ব সর্বদাই অন্যান্য চারপাশের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে মিশিয়ে, সম্পর্কিত হয়ে সত্য। বর্ণনামূলক বিজ্ঞান বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান, গতি, ওজন ও পারস্পরিক সম্পর্ককে হিসেব করে বস্তু বিষয়ে সাধারণ নিয়ম গড়ে। এই বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক এই কারণে বলা যায় যে, বস্তুকে বাইরে থেকে সংখ্যা পরিমাণের হিসেবে বুঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাইরের সম্পর্কটাই বাইরে থেকে জানা যায় এবং গণিতের নিয়মে তাকে ব্যবহারিক রূপ দেওয়া যায়। বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ককে বোঝা হয় কার্যকারণের সূত্রে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রাপাত গ্যালিলিও থেকে। প্রাক-আধুনিক এরিস্টটেলীয় বিজ্ঞানে বস্তুর সত্তাকে বুঝবার চেষ্টা করা হতো বস্তুর অন্তর্নিহিত

চরিত্র দিয়ে। উদাহরণত যেমন, গাছ থেকে পাতা মাটিতে পড়লে পৃথিবীর নিয়ম বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে বলা হবে পাতার চরিত্র বা ধর্মই হচ্ছে নিচের দিকে পড়া। বস্তুর এই ধরণের চরিত্র বর্ণনায় জানা যায় না, ফলে পৃথক পৃথক বস্তুর চরিত্র জানবার জন্যে গুরুর নির্দেশ মানতে হতো। তাকে যাচাই করবার ব্যবস্থা ছিলো না। বর্ণনামূলক বিজ্ঞান সত্তামূলক বিজ্ঞানকে হঠিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করে।

নীতিমূলক বিজ্ঞানের আদর্শ হলো মূল্য বিচার করা। বস্তুর পরিচয় নেবার পর প্রশ্ন ওঠে কোন্‌বস্তুর মূল্য কতোটুকু। মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে এই মূল্যের হিসেব। মূল্যের তারতম্য মানুষই আরোপ করে এবং মূল্যে তফাৎ থাকলে তার দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়। নীতিশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা যায় কিন্তু তা মূল্যের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বলতে বিধিবদ্ধ, সুসমঞ্জস জ্ঞান ধরলে নীতিশাস্ত্র নিশ্চয়ই বিজ্ঞান কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় বা পরীক্ষণের সাহায্যে যাচাই করবার ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান বললে নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞান হতে পারে না।

২। আচরণের বিজ্ঞান সম্ভব কি? (Is there any Science of conduct?

নীতিশাস্ত্রের চর্চা স্বাধীন মানুষের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট স্বাধীন কর্ম। কিন্তু ব্যক্তির সমস্ত কর্মই বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। সঙ্কীর্ণ অর্থে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে বিজ্ঞান বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান মাত্র। যেমন রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে বিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রকে নিজের সীমায় গ্রহণ করে। কারণ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় তখন যে-কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানই স্থান পায়। সঙ্কীর্ণ অর্থে নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞান নয় যেহেতু নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে একটি বিশেষ দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করে। এই দৃষ্টি-কোণকে আমরা বলেছি মূল্যবিচার।

কিন্তু মূল্যবিচারের নিরিখে নীতিশাস্ত্র বিশেষ জাতের বিজ্ঞান। নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে মঙ্গল লাভ করা। সুতরাং আদর্শ নির্দিষ্ট থাকায় আমরা বলতে পারি নীতিশাস্ত্র লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত একটি সুসম্বদ্ধ জ্ঞান। কাজেই নীতিশাস্ত্র আদর্শ মূলক বিজ্ঞান।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি বলেছেন নীতিবিজ্ঞানের আদর্শটুকু জানলেই চলে। কি ভাবে আদর্শ লাভ হবে তা নীতিবিজ্ঞানের জানবার কথা নয়। অর্থাৎ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি বলছেন ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের কোনো যোগ নেই।

নীতিশাস্ত্র তাত্ত্বিক আলোচনা। অধ্যাপক ব্রড ও অধ্যাপক মূর একই ধরণের মন্তব্য করেন। ফলে এঁদের বক্তব্য হয় এই যে, আচরণের কোনো বিজ্ঞান সম্ভব নয়। আচরণের কোনো আদর্শ বা লক্ষ্য থাকবে না, ব্যক্তি বিশেষ তাদের বিচার বুদ্ধি মতো কর্ম করে যাবে। অনেকে আবার একটু ঘুরিয়ে বলেন যে নীতিশাস্ত্র যেহেতু আদর্শমূলক বিজ্ঞান সে কেবলমাত্র আদর্শের নির্দেশ দেয় কিন্তু আদর্শ পালনের বিধি ঘোষণা করেনা। নিয়ম কানুন ও পদ্ধতির কথা থাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা কলায়।

আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় দেখিয়েছি যে শুভ বা ন্যায্যতা বা ঔচিত্য প্রত্যয়গুলি কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়, তারা জীবনে পালনীয়।

ঔচিত্য জীবনে পালনীয়

কারণ প্রতিটি প্রত্যয়ের বিচার হয় জীবনের কর্মে। কর্মহীন ভাবে প্রত্যয়গুলোর কোনো পরিচয় সম্ভব নয়। কারণ, মঙ্গলকে আদর্শ হিসেবে না গ্রহণ করলে মঙ্গলের কোনো পরিচয় শব্দার্থের বিচারে পাওয়া যায় না। কর্তব্যের প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য বললে বক্তব্যটি অর্থহীন শোনায়। শব্দার্থের বিচারে প্রত্যয়গুলোর যাথার্থ্য জানবার পরেও তাদের স্বরূপ কেমন ভাবে জানা হবে? তাকে জানবার জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তিতে 'ব্যক্তিতে কর্মের সম্পর্ক। অধ্যাপক মুরহেড যেমন বোঝান যে নীতিবিজ্ঞানকে অনেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে তফাৎ করেন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুটি শব্দের ব্যবহারে। কিন্তু পরীক্ষা করলেই জানা যাবে যে এই তফাৎটা কিছু মৌলিক নয়। নীতিবিজ্ঞান নিশ্চয়ই শুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানের চর্চা করে, যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞান করে কিন্তু নীতিবিজ্ঞান ব্যবহারিক জীবনেও নির্দেশ দেয়, যেমন নৌবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র দিয়ে থাকে। সুতরাং নীতিবিজ্ঞান যেমন তাত্ত্বিক হতে পারে, তেমনি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানও ব্যবহারিক হতে পারে।

৩। আচরণের কলা কি সম্ভব? (Is there any art of conduct)?)

কলা বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি প্রয়োগ কৌশল। যে-কোনো শাস্ত্রের ব্যবহারিক জ্ঞানটাই প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত। জীবনে প্রয়োগ হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই ফলিত তত্ত্বের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ত প্রয়োগের সঙ্গে উদ্দেশ্য জড়িত থাকে। প্রয়োগবিধির সাহায্যে আমরা দেখি কোথায় এবং কি ভাবে পৌঁছোতে চাচ্ছি। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রয়োগকে সার্থকতায় নিয়ে আসে। যেমন,

হাতেখড়ির পর আমরা অ, আ শিখি। বর্ণমালা শিখতেই হয় কারণ বর্ণমালার সাহায্যে আমরা ভাষার রাজ্যে পৌঁছোই। বর্ণমালা পেরিয়ে ভাষা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করা যায় না। বর্ণমালা ভাষার একটি প্রয়োগবিধি, ব্যাকরণ আর একটি। এই প্রয়োগ বিধির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, এক্ষেত্রে যেমন বাংলাভাষার চাবিকাঠি তাদের হাতে। সুতরাং প্রয়োগ কৌশলকেই যেহেতু কলা বলা হচ্ছে আমরা সহজেই বুঝতে পারি কলার চরিত্র নির্ভর করে ব্যবহারিকতায়। অর্থাৎ কলা আমাদের জ্ঞানকে ব্যবহার করতে শেখায়। শুদ্ধ জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান এমন কথা বলেনা। বিজ্ঞান ও কলার পার্থক্যে এই বক্তব্যটুকুই প্রধান যে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান জ্ঞানার্জন করে আর কলা প্রয়োগের কলাকৌশল শেখায়।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে মানুষের ব্যবহৃত কোনো কিছুকেই এমন চীনের প্রাচীরের দুপাশে স্থাপন করা যায় না। শুদ্ধ জ্ঞান স্বভাবতই মানুষকে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য জানায় অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানার্জনের প্রত্যক্ষ না-হোক পরোক্ষ উদ্দেশ্য থাকে এবং কলা নিছক প্রয়োগ কৌশলেই সন্তুষ্ট থাকে না, তার পেছনেও জ্ঞানের তত্ত্ব কাজ করে। কারণ তত্ত্বহীন কলার কোনো অর্থ নেই যেহেতু নির্দিষ্ট তত্ত্বে চরিত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট কলা!

ইতিপূর্বে আমরা নীতিশাস্ত্রকে বিজ্ঞান এবং আদর্শমূলক বিজ্ঞান বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনেছি যে নীতিশাস্ত্র কেবলমাত্র তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ আলোচনা করে না, জীবনে তত্ত্বগুলোকে প্রতিফলিত করবার কথাও বলে; শুধু আবার প্রয়োগের কলা-কৌশল নিয়েই ব্যাপৃত থাকে না, প্রয়োগকে নীতিশাস্ত্রের মৌল তত্ত্বের সঙ্গে জোড়ে। নীতিশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা হয়েছে সুসম্বদ্ধ যুক্তির শৃঙ্খলের জন্য। যে কোন সুসম্বদ্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান; দ্বিতীয়ত, নীতিশাস্ত্র কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ দেয় না, সমাজবদ্ধ মানুষের সবার জন্য সামান্য (universal) নিয়মের কথা বলে।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি যেহেতু নীতিশাস্ত্রকে ব্যবহারিক বলেন না, ওঁর মতে নীতিশাস্ত্রের কোনো আচরণ বিধি নেই অর্থাৎ তাকে কলা বলা চলে না। ওঁর প্রধান যুক্তিটি হলো, নীতিশাস্ত্রে যেহেতু আচরণের উৎস সঙ্কল্প এবং স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীন সঙ্কল্প, কর্মের চরিত্র তার দ্বারাই নির্ধারিত। কোনো কলাকৌশল বা প্রয়োগের প্রভাবে তা সংগঠিত নয়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, কোনো একটি বিষয়ে

ম্যাকেঞ্জি নীতিশাস্ত্রকে কলা বলেন না

দক্ষতা আছে বলেই সেই দক্ষতা অনুযায়ী আচরণ গড়ে না। তার দক্ষতার সঙ্গে তার আচরণের উৎসে অনেক ফারাক থাকে। ভালো চিত্রকর তিনিই যিনি সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন। এই উদাহরণে আঁকা নামক ক্রিয়াটির সম্ভাবনার ওপর ঝোঁক পড়েছে। **এঁকেছেন বলেই নয় আঁকতে পারেন বলেই** তিনি শিল্পী এবং চমৎকার শিল্পী। যদি না আঁকতে পারতেন তবে কেউ তাঁকে চিত্রকর বলতো না ; কার্যত আমরা বুঝতে পারছি যে পরিচয় সম্পূর্ণত নির্ভর করছে বিশেষ একটি কলার সম্ভাব্য প্রকাশের ওপর। কিন্তু অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি বলছেন ·'a good **man** is not one who **can**, but one who **does**, act rightly, অর্থাৎ ভালো কাজ করতে পারার সম্ভাবনা নয়, প্রকৃতই যে কাজটি করেছে। চিত্রকরের উদাহরণে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়েছেন আর ভালো কর্মের ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রকাশের ওপর নির্ভর করছেন। একটি সম্ভাব্য কর্ম ও অন্যটি সম্পাদিত কর্ম। কোনো কোনো সময় হয়তো কার্যকরী কর্মে স্বভাবের প্রকাশ হয় না, কার্যকরী কর্ম থেকে সরে থাকাতেই ভালোত্বের প্রমাণ হয় যেমন অনেকে বলেন 'They also serve who only stand and wait'। কিন্তু অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির মতে চুপ করে থাকা এবং অপেক্ষা করাও একটি কর্ম। যিনি চুপ করে আছেন চুপ করে থাকা নামক কর্মে তাঁর স্বভাবকে প্রকাশ করেছেন। তাই অধ্যাপক বলতে পারেন যে 'Conduct is not a capacity but a **habit**'। অধ্যাপক বোঝাতে চাচ্ছেন যে কলা কেবলমাত্র একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি করে মাত্র, সম্ভাবনাটি চরিত্রের ধর্মে প্রকাশ নাও পেতে পারে। ওঁর মতে কখনোই পায় না। তাই দুটোতে এতো তফাৎ

এই বক্তব্যটিকে আরো কিছুটা সম্প্রসারিত করে অধ্যাপক মাকেঞ্জি জানালেন যে **ধর্ম (virtue) কেবলমাত্র কর্মেই প্রকাশিত হয়।** সুতরাং ভালো চিত্রকর যখন ঘুমোয় তখনও সে ভালো চিত্রকর থাকে। অর্থাৎ কর্মরত না-থাকলেও সে ভালো যেহেতু তার ভালোত্ব অধ্যাপকের মতে কর্ম নয় দক্ষতা বা কৌশল মাত্র যা কোনো একদিন আয়ত্ত করে ফেলা যায়। কিন্তু ভালো লোকটি ঘুমোলে বা নিদ্রাকালীন সে আর ভালো লোক নয় যেহেতু তখন সে আর কর্ম করছেনা। অধ্যাপকের ভাষায় 'The good man is not good when asleep or on a journey, unless when it is good to sleep or to go on a journey.' এই প্রসঙ্গে সক্রাটেসের

উদাহরণটি ওঠে যে তিনি বলেছিলেন ন্যায়ের অর্থ যদি সম্পত্তি রক্ষা করা হয় তবে সৎ লোকটিতে আর তস্করে কোনো তফাৎ থাকবে না যেহেতু রক্ষা করার মতো চুরি করাও একটি দক্ষতা। এই বক্তব্যের জবাব হলো ধর্ম কখনোই দক্ষতা নয়, ধর্ম সর্বদাই আচরণ। সৎ লোকটি কেবলমাত্র সম্পত্তি রক্ষার কৌশলটি জানেন না, তিনি তাকে কাজেও প্রকাশ করেন। কাজেই সম্পত্তি রক্ষার সামর্থ্য (capacity) ও সম্পত্তি চুরি করার সামর্থ্য এক হতে পারে কিন্তু রক্ষার কর্মটি অপহরণের কর্মটি থেকে পৃথক।

যে সত্য জানে সে এক ধরণের ব্যক্তি আর জেনে যে সত্যকে ব্যবহার করে সে অন্য ধরণের মানুষ। চিত্রকর ছবি আঁকতে আঁকতে একদা আঁকা বন্ধ করতে পারেন কিন্তু সৎ ব্যক্তি কোনোদিনই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ মানুষ হিসেবে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মের সমাপ্তি ঘটতে পারে না।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি আরো একটি প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন যে **ধর্মের সত্তা সঙ্কল্পে প্রকাশ পায়।** এই তত্ত্বটি বোঝাতে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কাণ্টের উদাহরণ দিয়েছেন। ভালোভাবে আঁকতে না-পারলে শত বাসনা ও সৎ বাসনা সত্ত্বেও কোনো চিত্রকর ভালো শিল্পী হতে পারবেন না। কিন্তু কাণ্টের মতে 'সাধু সঙ্কল্প' (good will) ফল না দিলেও আপনা থেকেই ভালো। কাণ্টের ভাষায় জানছি 'A good will is good not because of what it performs or effects, not by its aptness for the attainment of some proposed end but simply by virtue of the voliton.'। এরিস্টটল একই রকমে বলেন সৎ লোক এমন অবস্থায় পড়তে পারেন যেখানে তার শ্রেষ্ঠ বৃত্তিকে তিনি প্রকাশ করতে পারছেন না, তবু সেই প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁর মহত্ত্ব জলজল করে। কারণ, যে কোনো কাজই সে করবে তাতে মহত্ত্বের ছাপ থাকবে।

যদিও দক্ষতার ক্ষেত্রে শিল্প-কলায় উদ্দেশ্য থাকে, শুধু মাত্র কলাকৌশল বা প্রয়োগটাই সব নয় তবু শিল্পে সিদ্ধিটাই সব ; কিন্তু জীবনের নৈতিক কর্মে অন্তর্নিহিত লক্ষ্যটাই মূল। নৈতিক কর্মে ত্রুটি ঘটতে পারে কিন্তু ত্রুটির বিচার হবে তার লক্ষ্য অর্থাৎ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা মিলিয়ে।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির বক্তব্য আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এবার বিচার করা যাক। ওঁর মতে শিল্পে প্রস্তুত দ্রব্যটিই মূল্যবান অর্থাৎ আঁকা ছবি বা লিখিত

গ্রন্থ ইত্যাদি। এখানে সবটাই নগদ বিদায়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে জীবনের কর্ম প্রবাহমান। সুতরাং কলা (দক্ষতা) র সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের কোনো যোগ নেই। ওঁর প্রথম যুক্তি যে কর্মেই ধর্ম প্রকাশিত আমাদের মানতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তিনি চিত্রকরের উদাহরণে কিছু কিছু ভুল করেন। চিত্রকর ভালো শিল্পী কিন্তু আঁকার দক্ষতার জন্যেই হননা, ভালো আঁকেন বলেই হন। অথচ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি আঁকতে পারার ওপর জোর দিচ্ছেন। আমরা কাউকে যখন ভালো শিল্পী বলি তখন তাঁর আঁকতে পারার সম্ভাব্য দক্ষতাকে প্রশংসা করি না। কার্যকরী ভাবে অঙ্কিত ছবির ওপরেই রায় দিই এবং আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আরো ভালো আঁকবেন। পরবর্তীকালে কিছু ছবি খারাপ আঁকলেও তাঁকে আমরা সরাসরি রায় দিইনা যে তাঁর সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে, বলি আরো কিছু দিন দেখা যাক। দক্ষতার প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই দেখানো যায় যে অধ্যাপকের মতে দক্ষতার কারণে ওই চিত্রকর চিরকাল ভালো আঁকবেন কিন্তু আমরা বলছি দক্ষতা ও চিত্র এক জিনিস নয়। ওই চিত্রকরটি দক্ষতা সত্ত্বেও যেমন খারাপ এঁকেছে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'নীরব কবিত্ব' বলে একটি ঠাট্টা চালু করেছিলেন। লোকটির নিশ্চয়ই ছন্দশাস্ত্র জানা ছিলো তবু মনে চূড়ান্ত কাব্য নিয়েও সে যেহেতু কবিতা লেখেনি তার দক্ষতা তাকে রবীন্দ্রনাথের ঠাট্টা থেকে বাঁচাতে পারলো না। বা আমরা যেমন জানি 'গোরা'র মতো শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেও রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' বা 'শেষের কবিতার' মতো নিকৃষ্ট লেখা লেখেন; যদিও কিন্তু অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির হিসেবে তাঁর দক্ষতা একটুও কমেনি বা কমতে পারে না। দ্বিতীয়ত এই সম্ভাব্য কর্ম ও সম্পাদিত কর্মের ফারাক দেখাবার চেষ্টায় অধ্যাপক যখন বলেন ঘুমন্ত শিল্পী বড়ো শিল্পী কিন্তু ঘুমন্ত সৎ ব্যক্তি সৎ নয় তখন এই তফাতের সীমাবদ্ধতা বোঝা যায়। অধ্যাপক ভুলে যাচ্ছেন যে সমস্ত সৎ ব্যক্তিকেও আমরা সৎ বলি কারণ তাঁর পরিচয় তাঁর পূর্ববর্তী কর্মে যেমন শিল্পীর পরিচয় তাঁর আগেকার আঁকা ছবির জন্য, দক্ষতার কাহিনীর জন্য নয়। এমন ধারা তফাৎটি অধ্যাপক যে করেন তার কারণ তিনি প্রথমত ধরে নিয়েছেন কর্মের প্রবাহ এমন একটানা যে ঘুমোতে গেলে কর্ম বন্ধ থাকায় সৎ ব্যক্তিকে আর সৎ বলে চেনা যাবে না। তিনি নজর করেন না যে জীবনে কর্মেও ছেদ আছে এবং প্রাক্তন কর্মের

ম্যাকেঞ্জি কলার চরিত্র ভুল বোঝেন

জোরেই (যাকে আমরা ভারতবর্ষে 'সুকৃতি' বলি) এক ব্যক্তির পরিচয় আমাদের মনে গেঁথে থাকে। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রেও যেমন প্রকাশের (কর্মের) ওপর রায়, জীবনেও তেমনি কর্মের ওপর নৈতিকতার রায় দেওয়া হয়। এখানে কলা ও নীতিশাস্ত্রে কোনো বিরোধ নেই।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কলা ও কর্মে এমন একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরি করেন যে খেয়াল করেন না কলা সহজেই কর্মে মিশে যেতে পারে। যা আছে তা সহজেই বদলাতে বদলাতে কর্তব্যে রূপান্তরিত হতে পারে। দক্ষতা থাকে বলেই কর্মের পরিণতি পাওয়া যায়। এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে আগে থেকেই জানা থাকে না কোন্ কর্মের কি কর্তব্য। কিন্তু একটি লোক জীবনে নৈতিক কর্মের চর্চায় জানতে পারেন কি ভাবে চললে তাঁর বক্তব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হবে। এই জানাটাই, কর্মের ধারা-নিয়ন্ত্রক বোধটিই তাঁর দক্ষতা কারণ ওই বোধ তিনি অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে দক্ষতা শেখালেই সম্ভাব্য কর্মের নিশ্চিতি আসে না। যেমন ছন্দশাস্ত্র শিখলেই বড়ো কবি হওয়া যায় না। এবং পৃথিবীতে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিই ছন্দ শাস্ত্র বিষয়ে নিছক অজ্ঞ ছিলেন। কাজেই দক্ষতা ও কর্ম জাতে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। দক্ষতা থেকে কর্মের প্রকৃতি আসে এবং কর্ম দক্ষতাকে নির্দিষ্ট আদর্শ জোগায়। একথা ঠিক যে কর্মের কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা নেই, অথচ দক্ষতা মোটামুটিভাবে সবাইকে শেখানো যায়। এ ক্ষেত্রেও বক্তব্যে ত্রুটি থাকে কারণ দক্ষতা ও কর্মে গুণগত তফাৎ না থাকায় বলা যায় দক্ষতা সাধারণভাবে শেখানো যায় বটে, সবাই কিন্তু কার্যত দক্ষ হয়ে উঠে না। তেমনি কর্মও লোককে শেখানো যায়। কিন্তু তার দ্বারা সবাই নৈতিক ভাবে শক্তিমান কর্মী হয় না। যেমন, শিশুকাল থেকেই আমাদের কর্মের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, 'সদা সত্যকথা বলিবে'। তৎসত্ত্বেও আমরা সদা সত্য কথা বলিনা বা এ বিষয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করি না। কেউ যদি সত্যি সত্যিই বক্তব্যটিকে জীবনে প্রয়োগ করে তবে নিশ্চয় বলা চলবে সে বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা থেকে পাঠ গ্রহণ করেছে।

ম্যাকেঞ্জি কলা ও কর্মে ভুল তফাৎ করেন

দক্ষতার সঙ্গে কর্মের একটিই তফাৎ। কর্ম একটানা চলে, দক্ষতা নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ। কর্ম যেহেতু পুরো মানুষটির এবং জীবন যাত্রার সর্ব স্তরেই ব্যাপ্ত তাই কর্মের পরিধির সঙ্গে দক্ষতার তুলনা চলে না। এ কারণেই মৃত্যু পর্যন্ত

কর্ম চলে। কিন্তু ব্যাপ্তি বাদ দিলে দক্ষতা কর্মের সহায়ক। কর্মই দক্ষতাকে পরিচালিত করতে পারে। কলা বলতে আবার শুধুমাত্র দক্ষতা বুঝাবার কোনো যুক্তি নেই কলা জীবনে নীতিকে প্রয়োগের কথা বলে। শুধুমাত্র জ্ঞানসঞ্চয়ের স্তর থেকে সরে এসে জীবনে সঞ্চিত জ্ঞানকে পরীক্ষা করে দেখার কথা কলা ঘোষণা করে। সুতরাং কলা কর্মের কেন্দ্রকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় স্থাপন করে। ভারতবর্ষে যেমন পুঁথিগত জ্ঞানকে সত্য জ্ঞান বলা হতো না, একমাত্র সাধককেই জ্ঞানী বলা হতো। কারণ একমাত্র তিনিই জানেন বাঁচার শিল্প (art of living), যেহেতু তিনিই মন ও মুখ এক করে কর্ম ও কল্পনাকে মেলাতে পারেন।

কর্ম একটানা চলে কিন্তু দক্ষতা নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ

তৃতীয়ত, কান্টের উদাহরণ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি সঠিক তোলেন নি। ইতিপূর্বেই 'ন্যায্যতা' বিচারে আমরা দেখিয়েছি যে আমাদের সংজ্ঞায় নৈতিক কর্মে ঘনিষ্ঠ উদ্দেশ্য থাকে এবং এই উদ্দেশ্যের আলো ছাড়া জীবনের কর্মকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কান্ট উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য বলেন কিন্তু লক্ষ্য করেন না মহাপুরুষেরাও শুধুমাত্র কর্তব্য করেন না। তাঁদের সামনে জীবনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। যেমন যীশুর সামনে ছিলো মানুষকে উদ্ধারের ব্রত। এটা শুধু 'সাধুসঙ্কল্প' নয়, প্রেমের দ্বারা সেই সঙ্কল্প জারিত। বাঙলা দেশেই শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামপ্রসাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন।

সুতরাং বলতে পারা যায় নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে কলার কোনো বিরোধ নেই। যেমন বিরোধ নেই বিজ্ঞানের সঙ্গেও। নীতিশাস্ত্র উভয়তই কলা এবং বিজ্ঞান। আমাদের 'তত্ত্ব ও তথ্য' অংশে এ বিষয়ে অন্যদিক থেকে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

৪। নীতিশাস্ত্রের উপযোগিতা (Uses of Ethics)

শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা বিচার করা হয় পাঠক বা জিজ্ঞাসুদের তরফ থেকে। যে কোনো শাস্ত্রই সামাজিক মানুষের। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে, প্রতিটি শাস্ত্রের পেছনেই মানুষের মন ও লক্ষ্য কাজ করে। প্রত্যক্ষ ভাবেই যে সর্বত্র প্রয়োজনের কথা থাকে তা নয়, যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিছক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ততোটা প্রকট নয়। তবু তাদের ফলিত প্রয়োগ আছে কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিকটা অনেক গৌণ। তেমনি আবার অনেক শাস্ত্র আছে যা প্রত্যক্ষত প্রয়োজন সিদ্ধির মাধ্যম হিসেবে শুরু হলেও তাত্ত্বিক আলোচনায় সাময়িক প্রয়োজন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তবু

আমরা মানতে বাধ্য যে মানুষের শাস্ত্র মানুষের লক্ষ্য সাধন করে বলেই, শুদ্ধ প্রয়োজন মেটাক বা শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করুক, তার সঙ্গে প্রয়োজনের যোগ আছে। শুদ্ধ জ্ঞানও মানুষের বাঁচা মরা বা আনন্দের সঙ্গে জড়িত। প্রকৃতির চাপে মানুষের মন সাড়া দিয়েছে বলেই তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। নিছক চাঁদকে ভালোবাসাতেও তাই মানুষের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে শাস্ত্র চর্চাই অসম্ভব।

নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ। প্রাচীন পণ্ডিতরা সরাসরি উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে ছকতেন। তাঁদের মতে নীতিশাস্ত্র জীবনের নৈতিক কর্মে উপযুক্ত করে তোলে কাজেই নীতিশাস্ত্রের উপকারিতা অত্যন্ত বেশি। প্রাচীনদের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো পদ্ধতিতে। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের পাঠ তারা ব্যবহারিক জীবনের জন্যেই গ্রহণ করেছেন, ভালো মানুষ হবার কল্পনাতেই নীতিশাস্ত্র জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এ কারণেই শিক্ষার সঙ্গে নীতির গভীর যোগের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকরা নীতিশাস্ত্রকে স্বীকার করে নিয়ে শুধু ঘোষণা করেছিলেন 'জ্ঞানই ধর্ম বা সত্তা' (Virtue is Knowledge)।

গ্রীক চিন্তায় জ্ঞানই ধর্ম

গ্রীকরা যুক্তি বিচারকে জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন তাই সক্রাটেসের বক্তব্যে থাকে যে সত্য মিথ্যার জ্ঞান থেকেই কর্মের সত্তা তৈরি হয়। কারণ মিথ্যা থেকে সত্যকে তফাৎ করতে পারলেই কেউ আর সাধ করে অন্যায় কাজে হাত দেবে না। গ্রীক চিন্তায় যুক্তিকে এতো উঁচু স্থান দেওয়ায় একটা সমস্যা চাপা পড়ে গিয়েছিলো যে মানুষ কেবল মাত্র যুক্তিতেই চলে না, আবেগেও চালিত হয়; ফলে, কখনো সে যুক্তির সত্য জেনেও আবেগের মিথ্যায় পা বাড়াবে। যীশুর চিন্তায় আবার উল্টো বক্তব্যটি প্রধান স্থান জুড়েছিলো। যীশু আত্মদানের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন বলে যুক্তিবিচারের পথ ত্যাগ করে আবেগের শুদ্ধতায় মহত্ত্বকে বসিয়েছিলেন। কারণ মানুষের আবেগ শুদ্ধ হলে স্বভাবতই সে ন্যায় পথে চলবে যেহেতু আবেগেই মানুষ কর্ম করে। এই দুটি বক্তব্যের ঝোঁক একপেশে হলেও আমরা দেখতে পারছি যে প্রাচীন মনীষীরা তত্ত্ব ও তথ্যের মিথ্যা দ্বন্দ্বে ভোগেন নি। তাঁরা মনে করেন নি যে নীতিশাস্ত্র জীবনে কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় কেবল মাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়।

আধুনিক পণ্ডিতরা নীতিশাস্ত্রকে শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা বলায় নীতিশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনটি আর থাকছে না সবার জন্যে। যিনি এই শাস্ত্র চর্চা করেন

তিনি জ্ঞানবান হবেন। তিনি 'ন্যায়', 'মঙ্গল', 'সততা', 'অন্যায়' ইত্যাদির যুক্তি-সঙ্গত তাত্ত্বিক আলোচনা করবেন কিন্তু বলবেন না যে এই প্রত্যয়গুলির তাৎপর্য নেই কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায়। এমন কি কোন্ কর্ম ভালো তাঁরা আলোচনা করবেন কিন্তু কর্মটি কার্যত করবার দরকার নেই। এই পণ্ডিতরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের নজীরে নীতিশাস্ত্রকে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান করতে চাচ্ছেন কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন নীতিবিজ্ঞানের চর্চা মানুষ ও মানুষের কর্ম বিষয়ে এবং কর্মের সূত্রেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমাজ। কর্ম একটি প্রয়োগহীন তত্ত্ব নয়, কর্ম মানুষের মনুষ্যত্বের কেন্দ্র। সুতরাং এই পণ্ডিতরা নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনকে বিমূর্ত করে দেবার চেষ্টায় গ্রীকদের দ্বন্দ্বে উপস্থিত হয়েছেন। কারণ সব জেনেও এঁরা কর্মে অপটু থাকতে পারেন। নিজেদের ব্যক্তিগত কর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের মতো ব্যবহার করতে পারেন অথবা তত্ত্ব ও কর্মের বিরোধ তৈরি করায় সহজেই অন্যায়, অসৎ আচরণে গা ভাসাতে পারেন।

নীতিশাস্ত্রের উপকারিতা বা প্রয়োজন তাই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকেই মূল্যবান। অনেকে অবশ্য বলেন যে নীতিশাস্ত্র পাঠ করলে লৌকিক ভুলভ্রান্তিকে সংশোধন করা যায় এবং নিজেই জ্ঞানলাভের ফলে সৎকর্মে নিযুক্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক লিলি প্রথম কর্তব্যটিকে না-ধর্মী কাজ বলেছেন। ওঁর মতে নীতিশাস্ত্রের চর্চা লৌকিক সংস্কার ও ভুলভ্রান্তিকে দূর করতে পারে।

নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানকে সঞ্চয় করে না। জীবনে ব্যবহার করে

অধ্যাপক লিলির বক্তব্যের দুটি দিক আছে। তিনি যেমন সঠিক বলেছেন যে নীতিশাস্ত্র পাঠে আমরা লৌকিক সংস্কার ও ভুলভ্রান্তিকে শুধরে নিতে পারি, তেমনি লক্ষ্য করছেন না যে নীতিশাস্ত্র যদিও সামান্য নীতির কথা বলে কিন্তু তার কাজ ব্যক্তিকে নিয়ে। সামাজিক সংস্কার বা প্রতিটি লোকের সংস্কার দূর করবার ক্ষমতা নীতিশাস্ত্রের নেই। নীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয়। সুতরাং তাতে জ্ঞানের উদ্বর্তন নেই। দর্শনের আলোচনায় জানি যে আমরা দর্শনে জ্ঞানকে সঞ্চিত করি না বিজ্ঞানের মতো। নীতিশাস্ত্রেও তাই আমরা পুরোনো জ্ঞানকে বাতিল করে নতুন জ্ঞানকে জমা করিনি। এমন জ্ঞানের প্রসঙ্গ থাকলে বলা যায় যে লৌকিক ভুল বা ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আমরা এই শাস্ত্রপাঠ করিয়ে দূর করবো। পদার্থ বিদ্যায় যেমন, যদি ধারণা থাকে জল উঁচু দিকে যায় তবে জলের গতি দেখিয়ে ভুল ধারণা বদলানো যায়। নীতিশাস্ত্র এমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

নীতিশাস্ত্র কয়েকটি সামান্য নিয়ম গড়ে কিন্তু বলে এই নিয়মগুলোর কোনো অর্থ নেই ব্যক্তিবিশেষ তার জীবনে পালন না করলে। কর্মেই যখন নীতির প্রশ্ন, প্রতিটি মানুষ নীতি অনুযায়ী চললেই তার চরিত্রের পরিবর্তন। কিন্তু লৌকিক ভুলভ্রান্তি দূর করবার কথা তুললে সম্পূর্ণ অবান্তর একটি কথা বলা হচ্ছে। আমরা বড়োজোর বলতে পারি যে নীতিশাস্ত্রে আমরা কিছু কিছু তত্ত্বের আলোচনা করি এবং সেই আলোচনা থেকে কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করি। এই জ্ঞানের অর্থ এই নয় যে তা পুরানো সমস্ত ধারণাকে পদার্থ বিদ্যার মতো বাতিল করে দিচ্ছে। এই জ্ঞানের অর্থ গভীর বোধ। আমরা আরো একটু তলিয়ে বুঝতে শিখছি মাত্র। জ্ঞান আহরণ করে আমরা কিন্তু নৈতিক লোক হয়ে যাচ্ছি না। শুধু কিছু সংবাদ আহরণ করছি। এবার নিজেদের জীবনে তাকে প্রয়োগ করবার কথা। প্রয়োগের সিদ্ধিতেই জ্ঞানের পরীক্ষা।

তবে এ-কথা ঠিক যে জ্ঞানে আমাদের আচরণ প্রভাবান্বিত হয়। আমরা আরো কিছুটা তলিয়ে বুঝতে শিখি এবং নিজেদের জীবনে তত্ত্বকে প্রয়োগ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে পারি। ব্যক্তিগত কর্মের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে, ভালোমন্দের তফাৎ বুঝে নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। কিন্তু এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সম্ভাব্য কারণ কর্মের সঙ্গে শুধুমাত্র বুদ্ধির যোগ নেই যুক্তি ও আবেগকে সমন্বয়ে বাঁধতে পারলেই কর্মের পরিবর্তন সম্ভব। এবং তা পুঁথি পাঠ করে হয় না।

নীতিশাস্ত্রের প্রভাব অবশ্য বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখার ওপর পড়ছে। বিশেষত সমাজবিজ্ঞানের ওপর। নীতিশাস্ত্র সামাজিক মানুষের শুভাশুভের আদর্শ তৈরি করে এবং সমাজবিজ্ঞানগুলো নীতিশাস্ত্রের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র যেমন বলে স্বাধীন কর্মেই মানুষের মনুষ্যত্ব। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি শাস্ত্র এই বক্তব্য থেকে জানে যে মানুষ স্বভাবতই নীতির পরিমণ্ডলে বাস করে এবং এই নীতিপরম্পরা তার পরিবার মারফৎ তার মনে দানা বাঁধে। নীতিহীন স্বেচ্ছাচারী মানুষ কখনো দেখা যায় না। সমাজতত্ত্ব তাই মানুষের এইসব নৈতিক সংগঠনের পরিচয় নেয় এবং মনস্তত্ত্ব দেখে সুস্থ মানুষের সুস্থতায় কেমন আদর্শ ও সমাজের সঞ্চিত নৈতিক ধারণা সুপ্ত থাকে। রাষ্ট্রনীতি নীতিশাস্ত্রের কাছ থেকে শেখে স্বাধীন মানুষের

সমাজ বিজ্ঞানে নীতি-শাস্ত্রের প্রভাব পড়ছে

স্বাধীন কর্ম অর্থাৎ তার আত্যন্তিক স্বাধীনতার কথা। রাষ্ট্রনীতি সংঘবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সংগঠনের আলোচনা করে। কিন্তু আলোচনার ভিত্তি হিসেবে রাষ্ট্রনীতি মানুষের চরিত্র ও লক্ষ্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ না করলে প্রতি পদেই ভুল করবে এবং মানুষের চারপাশে এমন অনৈতিক সংগঠন তৈরি করবে যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রশ্ন অবান্তর।

বর্তমান কালে প্রাচীনকালের মতোই নীতিশাস্ত্র সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বের মতকে উদ্‌বুদ্ধ করছে। সারা পৃথিবীতে সাম্য ও স্বাধীনতার যে বক্তব্য উঠেছে—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের যে তর্ক চলছে তা সবই কার্যত নীতিশাস্ত্রের মৌলিক বক্তব্য থেকে। মানুষের পরিপূর্ণতার তত্ত্ব নীতিশাস্ত্র দিচ্ছে বলেই সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিজেদের লক্ষ্য নীতিশাস্ত্রের চাপেই তৈরি করার দিকে ঝুঁকেছে।

পরমার্থ বিষয়ে নীতিশাস্ত্র মানুষকে সচেতন করতে চায়। কাজেই পরম-কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষের জীবনকে গড়বার বাসনা নীতিশাস্ত্র যুগে যুগে সমাজে ছড়িয়ে দেয় ও প্রতিটি মানুষের ধর্মকে সেই নীতিতে বিচার করতে শেখায়।

৪। নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান (Ethics and Psychology)

নীতিশাস্ত্র স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীন কর্মের আলোচনা করে। কর্মের ক্ষেত্রে আমরা গ্রীক ও খৃষ্টীয় আদর্শের কথা বলেছি যে গ্রীকচিন্তায় যুক্তিকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে আর খৃষ্টীয় চিন্তায় আবেগকে। নীতিশাস্ত্র আবেগ ও যুক্তির নিয়ম মেনে চলে কারণ মানুষের জীবনে উভয় বৃত্তিই সত্য। প্রতিটি কর্মের পেছনে যুক্তি ও আবেগ কাজ করে। এই যুক্তি ও আবেগের সূত্রে মনস্তত্ত্বের কথা উঠেছে। কারণ আবেগ ও যুক্তি মন থেকেই উৎসারিত হয়। মানুষের কর্মের উৎস ভিন্ন হলে মনকে বা মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার শাস্ত্র মনস্তত্ত্বকে বাতিল করা চলতো কিন্তু নীতিশাস্ত্র পরিপূর্ণ মানুষের কর্ম প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকায় মনস্তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের যোগ স্বভাবতই প্রাধান্য পাচ্ছে।

আমরা সাধারণ ভাবেই দেখেছি যে মানুষের জীবন একটি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। আদর্শই জীবনকে পরিণতির নির্দেশ দেয় এবং পরিণতির পথে চালায়। জীবনে শুভবোধ বা মঙ্গলের হিসেবে বাসনা মেটাবার

কথা থাকে এবং সাধারণ কামনা বাসনা মেটাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বুঝতে পারে যে সে কতোটুকু তার আদর্শের দিকে এগোচ্ছে। বাসনা মেটাবার উপকরণ এমনিতে আমরা পার্থিব বস্তু নিচয়কেই ভাবি কিন্তু বিবেচনা করলেই দেখা যায় যে বহুক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে বস্তু নিচয়ের কামনা ত্যাগ করতে পারলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। বাসনা মেটাবার প্রয়োজন মনকে প্রশান্ত করবার জন্যে। মনের স্বাভাবিক প্রশান্তি ও আনন্দ থেকেই নতুন কর্মের উদ্ভব হয়। এই প্রশান্তি ও আনন্দের জন্য বহুক্ষেত্রে মানুষ কষ্টকেও বরণ করে। কারণ কষ্ট বা যন্ত্রণাই তখন তার মানসিক স্থৈর্যের কারণ। বিখ্যাত ভোগী লালাবাবুর গল্পে যেমন সমস্ত বিলাস উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও 'বেলা যে পড়ে এলো' শুনেই লালাবাবুকে পথে বেরুতে হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণের জন্য। নিছক বাসনা মেটাবার হিসেব করলে দেখা যাবে সব ছেড়ে তিনি প্রচণ্ড দারিদ্র্য ও দুঃখই বরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি দুঃখ পেলেন? উল্টোটাই সত্যি যে ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে তাঁর এক মুহূর্তও দ্বিধা হয়নি কার্যত প্রশান্তি বা আনন্দ তাই মনে। সুতরাং মানুষের মঙ্গল প্রধানতই অন্তরের ঘটনা, বাহ্য বিষয় বা বস্তুনিচয় নয়।

বাসনার সঙ্গে কর্ম জড়িত

৭। নীতিশাস্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা (Definition of Ethics)

অন্যান্য মানবিক শাস্ত্রের মতোই নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় মানুষ। কিন্তু মানুষ নিজের বিষয়ে আলোচনা ছাড়াই প্রকৃতির বিষয়েও আলোচনা করে। প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনার নামকরণ করা হয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের যোগ পদ্ধতিতে। নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানের মতোই যুক্তির পরম্পরা ও শৃঙ্খলে তার বক্তব্য উপস্থিত করে। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রকৃতি বিষয়ে নয়, মানুষই তার আলোচনার কেন্দ্র। মানুষ বিষয়ক আলোচনায় থাকে মানুষের ইতিহাস, তার জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিণতির কথা। নীতিশাস্ত্রে যদিও মানুষের কথাই প্রধান তবু মানুষের ইতিহাস তার লক্ষ্য নয়। ইতিহাসে মানুষ যে কর্মের দ্বারা নিজের অন্তর্নিহিত চরিত্রকে প্রকাশ করে সেই কর্মই নীতিশাস্ত্রের মূল বিবেচ্য। কারণ, প্রকৃতিতে মানুষ জড় ও নিম্নতর প্রাণীর সঙ্গে তফাৎ হয়েছে তার কর্মে।

নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য মানুষ

কর্মের দ্বারা যেহেতু মানুষ পৃথক সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মানুষের কর্ম

প্রকৃতির নিয়মে সম্পূর্ণ পরিচালিত নয়। প্রকৃতির নিয়মে বিধিবদ্ধতা আছে, পরম্পরা আছে, বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু তাতে স্বাধীনতার অবকাশ নেই। প্রকৃতিতে একমাত্র মানুষ কর্মে তার স্বাধীনতার ছাপ ফেলে। প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হলেও মানুষের বৃত্তি মানুষের পরিমণ্ডলেই গড়ে। মানুষের বৃত্তি কিছুটা প্রকৃতি থেকে পাওয়া। প্রতিকূল প্রকৃতি থেকে জীবনধারণের উপকরণ মানুষকে আদায় করে বড়ো হতে হয়েছে। প্রকৃতি থেকে আদায়ের সূত্রেই তার নিজস্বতা তৈরি হয়েছে। কারণ সে তার নিজের মতো দাবিকে পূর্ণ করেছে। সুতরাং মানুষের কর্ম মানুষের নিজের হাতে গড়া, সর্বত্রই তাতে কমবেশি ইচ্ছার ছাপ লাগানো।

মানুষের বৃত্তি গড়ে মানুষের পরিমণ্ডলে

মানুষের কর্ম দুটো ভাগে বিভক্ত। একটি কর্ম প্রকৃতির উপর প্রযুক্ত, যার পরিচয় বিজ্ঞান এবং অন্য কর্মটি তার নিজের ক্ষেত্রে, যার পরিচয় সামাজিকতায়। সামাজিক কর্মেই তার নীতির ক্ষেত্র। আদিতেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কাজেই তার নিজের বাঁচা মরার সঙ্গে গোষ্ঠী বা সমাজের বাঁচা মরা জড়িত। বা উল্টোভাবে গোষ্ঠীর স্থায়িত্বে তার প্রাণের স্থায়িত্ব ও বিকাশ। সমাজের স্থিতি ও তার প্রাণের নির্ভরতায় কর্মের প্রসঙ্গ এসেছে। কারণ, প্রতিমুহূর্তের কর্মে যেমন তার বাঁচার সম্ভাবনা তেমনি একক বাঁচার ভিত্তি দিয়েছে গোষ্ঠী অর্থাৎ প্রতিটি লোকের একত্রিত কর্ম। কর্মের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে, সম্পর্কের বিবর্তনে তার কর্মের স্বরূপ পালটেছে। কর্ম-জীবনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে এবং সম্প্রসারিত জীবন নতুন কর্মকে সৃষ্টি করে। কর্মই তার জীবন এবং কর্মেই জীবনের প্রতিষ্ঠা।

কর্মের সূত্রে বিজ্ঞান ও সামাজিকতা

কর্মের এই গভীর এবং আত্যন্তিক গুরুত্বে তার মনুষ্যত্ব ও সামাজিকতা প্রকাশ পাওয়ায় কর্মের চরিত্রে ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। কারণ কর্ম তাকে রক্ষা করবে অথবা মৃত্যুতে ঠেলে দেবে। কর্ম তার সমগ্র জীবন ব্যেপে, এবং কোনো কর্মই সম্পূর্ণ একক নিঃসঙ্গ জগতে নয়। সামাজিক মানুষের সামাজিক কর্মই তাই নীতিশাস্ত্রের উপজীব্য। নীতিশাস্ত্র মানুষের কর্মের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। আগেই বলা হয়েছে যে কর্ম থেকে সে প্রয়োজন মতো বাছাই করে এবং করেছে। বাছাই অনুযায়ী তার নিজের এবং সমাজের চরিত্র

কর্মেই ভালোমন্দ

নির্ভর করছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মানুষের কর্ম এবং স্বাধীন কর্মেই ভালোমন্দের প্রশ্ন। বাধ্যতায়, প্রকৃতির নিয়মের অমোঘ অনিবার্যতায় মানুষের শুভ অশুভ নেই। প্রকৃতির নিয়মে জীবনের দুটি কেন্দ্র, জন্ম ও মৃত্যু। এই দুটি ঘটনার কোনো নৈতিক তাৎপর্য নেই কারণ তারা ঘটবেই ঘটবে। যা ঘটবে, যা একান্তই অনিবার্য তাকে যেমন ভালো বলা যায় না, তেমনি মন্দও বলা যায় না। ভালো মন্দ তৈরি হয় মধ্যবর্তী পর্যায়ে। যখন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে স্বাধীন কর্মে প্রকাশ করতে যায়। প্রকাশের দুটো দিক, একটি সম্পূর্ণ তার নিজের, যা তার অন্তর্নিহিত তাকে সে প্রকাশ করে। অন্যদিকে স্বকীয় কর্মে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্যবহারের সূত্রে সমাজ বা অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এই দুটো স্তরেই তার কর্মের বিচার থাকে। সামাজিক কর্মের যেমন ন্যায় অন্যায়, তেমনি ব্যক্তিক কর্মেরও ন্যায়-অন্যায়। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চলেনা। দুটি ক্ষেত্রেই নীতি থাকে। আমরা যেমন আগেই দেখিয়েছি নিজের ক্ষেত্রে সে নীতিকে মানে ও ব্যতিক্রমকে সংযুক্ত করে। সমাজের ক্ষেত্রে সে সামান্য নিয়মটিকে বলবৎ রাখে। এইভাবেই তার তত্ত্ব ও তথ্যের মিলন। নীতিকে গড়ে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে, উদ্দেশ্য তৈরি হয় সামাজিক ও ব্যক্তির জীবন যাত্রার সম্পর্কে। কারণ উভয়তই জীবনরক্ষা ও জীবন প্রকাশের দায়িত্ব। উদ্দেশ্য থাকে তার অস্তিত্ব ও বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে। যেহেতু মানুষ নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে প্রতিনিয়ত অবস্থান্তরে যায়।

নীতিশাস্ত্রকে তাই বলা হবে **এমন শাস্ত্র যা সচেতন স্বাধীন মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কর্মের ব্যাখ্যা করে, চরিত্রের নির্দেশ যে দেয় কয়েকটি নীতির সঙ্গে মিলিয়ে, যে-নীতি মানুষ গড়ছে সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রায়, নিজের ও গোষ্ঠীর বাঁচা মরা ও বিকাশের সত্যকে মিলিয়ে।**

এ-কারণেই আমরা দেখিয়েছি নীতিশাস্ত্র নীতির লক্ষ্যে তাত্ত্বিক আলোচনা আর জীবনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক। তত্ত্বে ও ব্যবহারে কোনো ফারাক নেই। যেমন দেখাতে চাচ্ছেন বর্তমানের বহু দার্শনিক। কারণ, ফারাক যদি থাকে তবে মানুষের কর্মের উৎস বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হবে এবং জীবনযাত্রার মৌলিক নিয়মটি অন্ধতায় নিমজ্জিত হবে। এ-কারণেই আমাদের স্মরণ রাখতে হয় যে নীতিশাস্ত্র মূলতই বিচারমূলক শাস্ত্র এবং তার পদ্ধতি নিছক যুক্তির। যুক্তিকে অস্বীকার করলে আমাদের আচরণের ভালো বা

মন্দ বিষয়ে কোনো আলোচনাই সম্ভব নয় এবং কেনো একটি ঠিকই গ্রহণ করেছি এবং অন্যটি বাতিল করেছি প্রশ্নে খেয়ালখুশির অন্ধতা ছাড়া আর কিছুই বলবার থাকে না। বর্তমানে অনেক দার্শনিক বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের ভালো-মন্দের বোধটা সম্পূর্ণ আবেগজাত, তাতে কোনো বিচার নেই। এ-কথা মানলে মানুষকে প্রকৃতির নিয়মের দাস বলতে হয় এবং তাকে স্বাধীন কর্মের জগত থেকে সরিয়ে এনে প্রবহমান স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হয়। কারণ মানুষ কর্ম বাছাই করে বিবেচনায়, সচেতন ভাবে। অধ্যাপক ডি. ডি. র‍্যাফাএল যেমন বলছেন 'Subjective fact of my approbation is all that there is any **ground** for stating, or perhaps that it is all that any reasonable person is prepared on reflection to affirm' অর্থাৎ আমার যদি রসগোল্লাটা খারাপ লাগে তবে কারো প্রশ্নের জবাবে আমি বড়ো জোর বলতে পারবো যে 'ওটা আমার খারাপ লেগেছে'। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বক্তব্য অত্যন্ত মারাত্মক এবং সম্পূর্ণ ভুল।

নীতিশাস্ত্র নীতির লক্ষ্যে তাত্ত্বিক, জীবনের লক্ষ্যে ব্যবহারিক

হেনরী সিজউইক সঠিক দেখিয়েছেন যে আমার রসগোল্লা বিষয়ে মতামত ও নৈতিক বোধে অনেক তফাৎ। তিনি বলছেন 'But there appears to be a fundamental difference between this ease and that of moral feeling' কারণ রসগোল্লার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অমন মতামত দিলেই ফুরিয়ে যায় কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে ঘটনাটি এতে সহজে শেষ হয় না। শুধু মাত্র মনোভাব না জানিয়ে, মনোভাবের স্বপক্ষে আমি কারণ দর্শাতে থাকি যেহেতু আমার বক্তব্যটি আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি তার জন্যে অনেকদূর পর্যন্ত এগোতে পারি। অর্থাৎ আমার আবেগ ছাড়াই বক্তব্যটিকে আমি সত্য বলে ভাবছি। সিজউইক তাই চমৎকার লিখেছেন যে 'The peculiar emotion of moral aprobation is, in my experience, inseparably bound up with the conviction, implicit or explicit, that the conduct approved is 'really' right—i.e. that it cannot, without error, be disapproved by any other mind'। কার্যত এমনভাবে অনুভব করেছি বলে আমি ঘটনাটিকে ন্যায্য বলিনা। আমি অমন ভাবে অনুভব করছি কারণ আমি মনে করছি আমার বক্তব্যটি সম্পূর্ণ

নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে আবেগের যোগ আছে

ন্যায্য। সিজউইক জানান যে আবেগ যদিও যুক্তি নয় কিন্তু আবেগের চরিত্র থেকেই বুদ্ধি ও যুক্তির নির্ভরতাকে আঁচ করা যায়। একই ভুল টমাস হব্‌স করেছিলেন যখন তিনি লেখেন 'whatsoever is the object of any man's desire, that it is which he for his part calleth good, and the object of his aversion, evil'। হব্‌স ভুলে যাচ্ছেন যে বহু সময়েই আমরা অনেক কিছু ভুল বা অন্যায় জেনেও গভীর ভাবে চাই বা একান্ত ভাবে করি। সেক্ষেত্রে হব্‌সের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের আর অন্যায় বা ভুল বলা চলবে না। একই রকমে অনেক কিছু চাইনি বা বাধা দিয়েছি অথচ পরিশেষে দেখা গেলো তারাই অত্যন্ত উপকারে লাগছে ও জীবনে মঙ্গল এনে দিচ্ছে।

[ইংরেজী 'এথিক্‌স' (Ethics) শব্দটি এসেছে গ্রীক 'এথিকা' (Ethica) থেকে। 'এথিকা' শব্দটি দিয়ে গ্রীকরা চরিত্র ও বুদ্ধির তফাৎ করেছেন। 'এথিকায়' যদিও চরিত্রই লক্ষ্য ছিলো কিন্তু সিজউইক দেখিয়েছেন যে চরিত্রের গুণাবলীকে আমরা ধর্ম (virtue) ও অধর্ম (vice) বলি তা এই শব্দটির সামান্য একটি অংশ গ্রহণ করেছে মাত্র। অন্তত এরিস্টটল সে ভাবেই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এরিষ্টটলের বক্তব্যে নীতিশাস্ত্রের মুখ্য চর্চা হলো 'all that is included under the notion of what is ultimately good or desirable for man, all that is reasonably chosen or sought by him, not as a means to some ulterier end, but for himself'। ব্যক্তির নিজের জীবনের জন্য যা চূড়ান্তভাবে শুভ তাকেই এরিস্টটল নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বলেন।]

আমাদের আলোচনার সূত্রে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ও অধ্যাপক লিলি প্রদত্ত সংজ্ঞা দুটির উল্লেখ করা যায়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি লেখেন 'Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct'। আর লিলির ব্যাখ্যায় জানা যায় 'We may define Ethics as the normative subject of the conduct of human beings living in societies—a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way'। অধ্যাপক-দ্বয়ের সংজ্ঞা থেকে নির্দিষ্ট কটি প্রত্যয়ের আলোচনা উঠ্‌ছে। এদের মতে নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন কারণ এই

নীতিশাস্ত্র সামান্য নীতির জন্ম দেয়

প্রত্যয়গুলোর আলোতেই মানুষের কর্মের ব্যাখ্যা, যে-কর্মে এরিস্টটল কথিত চরিত্রের পূর্ণতা এবং আত্ম-আবিষ্কার। আমাদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে নীতিশাস্ত্র সামান্য (universal) নীতির জন্ম দেয় যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়তই প্রযোজ্য। এই সামান্য নীতিগুলোর সূত্রেই ইতস্তত নানা প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। সমাজের চরিত্র বুঝতে এদের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ব্যক্তির নীতি নির্দেশিত কর্ম ও ব্যতিক্রমের তাৎপর্য বুঝতে। আমরা এবার কয়েকটি প্রত্যয়ের আলোচনা করে তাদের অর্থ অনুধাবন করবো।

৮। মূল কয়েকটি প্রত্যয় (Some Fundamental concepts of Ethics)।

নীতিশাস্ত্রে ঘুরে ফিরে কয়েকটি শব্দ নানা সূত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন শুভ-অশুভ, ন্যায্যতা ও উচিত-অনুচিত।

(ক) শুভ (Good)—'শুভ' প্রত্যয়টির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মতৈক্য নেই। 'শুভ' শব্দটিকে সাধারণত আমরা জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারি। মানুষের স্বভাব মূলতই কতকগুলো লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্ম। আবেগে এই প্রয়াসের জন্ম। তারপর ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ রূপ নিতে থাকে। কিন্তু, এরিস্টটল যেমন দেখিয়েছেন, পরিপূর্ণ রূপ কখনোই জানা যাচ্ছে না। শুভ এই চর্চা বা সন্ধানের সঙ্গে জড়িত। তাই একমাত্র শুভ বা মঙ্গল যা এই লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্মের পরিপূর্ণতা দেয়। যেমন ধরা যাক আমি সাহিত্যিক হতে চাচ্ছি। আমার মনে সাহিত্যিকের একটি আদর্শ রূপ ও কল্পনার দিকে যে কর্ম আমাকে নিয়ে যাবে তাকেই আমি 'শুভ' কর্ম বলবো। কল্পনার পরিপূর্ণতা পেলে তাকেই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলবো।

লক্ষ্য-নির্দিষ্ট কর্মই শুভ

এই উক্তিটি বর্তমানের বিতর্কে এমন গুলিয়ে আছে যে আমাদের কয়েকটি বিষয়ে মন পরিষ্কার রাখতে হয়। শুভর তন্নিষ্ঠতা (objectivity) ও স্বাভাবিকতা (naturalness) বিষয়ে নানা তর্ক আছে। আমরা তন্নিষ্ঠতা বিষয়ে বলবো আবেগবাদীদের মতো যে, শুভ কখনোই বস্তু বিষয়ে মনের আবেগ-বাসনা থেকে পৃথক নয়। একটি বস্তু মঙ্গলময় কারণ সে আমাদের ইচ্ছা ও বাসনাকে চরিতার্থ করে। আবার তেমনি বস্তু আমাদের বাসনা মেটাবে কি মেটাবে না জানা নেই অথচ শুভর একটি তন্নিষ্ঠ চরিত্র আছে। তার প্রমাণ হলো সে আমাদের বাসনা

চরিতার্থ করে। এইগুণটি তার নিজস্ব। শুভর স্বাভাবিকতা বিষয়ে গোড়ায় আমরা মেনে নিই যে, কোনো বস্তু সত্যিই আমাদের কি কারণে খুশি করে জানবার জন্যে প্রকৃতির বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। আবার তেমনিই মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতির দাস নয় যে সে প্রকৃতির ছক বাঁধা পথে চলবে। মানুষের সমস্ত সত্তা চলে লক্ষ্যের ঝোঁকে। সুতরাং তার জীবনের লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার কর্মকে বোঝা যাবে না। সুতরাং শুভর চরিত্র কখনোই বোঝা যাবে না মানুষ কি চায়, কি পছন্দ করে ও কি তার বাসনা ইত্যাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোচনা ছাড়া।

বস্তু আমাদের বাসনা মেটায়

আমাদের আলোচনা থেকে জানা গেলো যে যে-কোনো শুভ কর্ম বা মঙ্গলের জন্য দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন; (ক) কিছুটা তৃপ্তি ও সুখ এনে তা আমাদের খুশি করে, ও (খ) তা আমাদের কিছু অভাব দূর করে। এই বক্তব্য বিষয়ে দুটো আপত্তি উঠ্‌তে পারে।

(ক) আমার অভিজ্ঞতায় আনন্দ বা সুখ নেই অথচ কাজটি মঙ্গলকর, (খ) কাজটি মঙ্গলময় অথচ পরিপূর্ণতা পাইনি ও (গ) দুটিই উপস্থিত অথচ কাকে 'শুভ' বলে বুঝতে পারছি না। (ক) এর উদাহরণ মিলবে পাহাড়ে ওঠা ইত্যাদি কর্ম থেকে। এভারেষ্ট বিজয়ে প্রচুর দুঃখ কষ্ট বরণ করতে হয়েছে। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে গোড়াতেই বলা যায় যে কোনো কর্মই সম্পূর্ণ আবেগ বর্জিত হতে পারে না এবং এভারেষ্ট আরোহণ নামক ঘটনায় যতোই দুঃখ কষ্ট থাক, শুধুমাত্র দুঃখকষ্টই নেই। নিছক দুঃখ ও নিছক যন্ত্রণার কথা সত্য হলে এভারেষ্ট বিজয়ে মানুষ পা বাড়াতো না। (খ) এর প্রসঙ্গে উদাহরণ ওঠে যে অনেক ঘটনাই তৃপ্তিকর কিন্তু তার জন্যে আমার কোনো অভাব বোধ নেই। আমি হাসির গল্প শুনতে চাইনি কিন্তু কেউ যখন গল্পটা শোনালো আমার খুব ভালো লাগলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বক্তব্য, অভাব বোধটি এমন প্রত্যয় নয় যে সচেতন ভাবে সর্বদাই তা স্মরণ রাখতে হবে। হাসির গল্পের জন্য আমার মনের তলায় চাপা আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং থাকে বলেই সহজে তাতে সাড়া দিতে পারি। অর্থাৎ পরিহাসবোধ নামক মানসিকতা প্রস্তুত না থাকলে হাসির গল্পে তেমন সাড়া দিতে পারতাম না। আর কালা হলে নিশ্চয়ই হাসির প্রশ্নই উঠ্‌তো না।

শুভ আমাদের অভাব মেটায়

আমাদের সংজ্ঞা বিষয়ে চূড়ান্ত আপত্তি উঠ্‌তে পারে। অধ্যাপক মূর বলছেন, ধরা যাক জীবনের দৈর্ঘ্যকে মনে মনে আমি কামনা করলাম। আমি জানি

আমাকে খুশি করবার গুণ তার আছে। এই গুণটি থকলেই যদি তাকে শুভ বলা হয়, এবং আমি তো জানিই তার এই গুণটি আছে, তাহলে প্রশ্নের আদিতেই জবাবটা আমার জানা আছে। প্রশ্ন করাটাই তখন অর্থহীন। 'শুভ'-র অর্থ যদি 'তৃপ্তিকর' হয় তবে তৃপ্তিকর বিষয় 'শুভ' কিনা প্রশ্ন করা যায় না। কারণ তাহলে প্রশ্নটা হাস্যকর শোনাবে যেহেতু প্রশ্ন হবে 'তৃপ্তিকর বিষয় কি তৃপ্তিকর'? অথচ আমরা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারি 'তৃপ্তিকর' বিষয় শুভ কি না, মূর বলছেন শুভকে তার তৃপ্তিকরতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা আমাদের সংজ্ঞায় তা করিনি সুতরাং মূরের প্রতিবাদ এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে খাটে না।

মূর বলেন শুভ বিষয়ে তৃপ্তির কথা আগেই জানা

মূরের জবাবে আমরা বলবো, যে কোনো একটা পরীক্ষা নেওয়া যাক। এমন একটা অভিজ্ঞতা ধরা হোক যা আমাদের তৃপ্তি দেয় ও কোনো একটা বাসনা মেটায়। তারপর প্রশ্ন করা যাক, এই অভিজ্ঞতাটি আবার চাইব কি না। উত্তরে সব সন্দেহর নিরসন হবে। আত্যন্তিক ভাবেই ওই অভিজ্ঞতার মূল্য আমরা স্বীকার করি এবং বারবার পেতে চাই। যা আমরা এমন করে চাই, যেমন বন্ধুত্ব, প্রেম, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি, তার মঙ্গলময়তা বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

মূরের সূত্রেই আরো একটি প্রশ্ন ওঠে। অধ্যাপক মূর জানিয়েছিলেন 'শুভ' শব্দটিকে সংজ্ঞা দেওয়া যাবেনা কারণ ওটি একটি 'সরল' শব্দ। আর, আমরা সবিশেষ জানি যে, এক এক ব্যক্তির কাছে মঙ্গল বা শুভর এক এক রকম ধারণা। অথচ একথাও সত্যি যে প্রত্যেক মানুষের মনে যতোই শুভ বিষয়ে পার্থক্য থাক, একটি ন্যূনতম ঐক্য তাদের মনে কাজ করে। প্রত্যেকেই শুভকে জীবনে উপকারী বলে ধরে নেয়। জীবনে যে-কাজ কিছু-না কিছু উপকার করে না তাকে কেউই শুভ বলে না।

(খ) **ন্যায্যতা (Right)** প্রথমেই মনে রাখতে হবে শুভ বোধ ছাড়া ন্যায্যতার কোনো তাৎপর্য নেই। কোনো কাজ ন্যায্য হয়েছে কিনা প্রশ্নে আমরা জানতে চাইবো তার লক্ষ্য কি। যদি জানা যায় কাজটি থেকে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা পাবে তবেই তাকে ন্যায্যতার ছাড়পত্র দেওয়া হবে। তাহলে ন্যায্যতার সংজ্ঞা দাঁড়াবে এই যে 'an action is right if, and only if, it tends to bring into being

ন্যায্যতার সঙ্গে শুভ ও লক্ষ্য জড়িত

as much experience that is atonce satisfying and fulfilling as any alternative action,' বিকল্প কর্মের মধ্যে যে কাজটি আমার লক্ষ্য-নির্দিষ্ট জীবনে সর্বাধিক মঙ্গল আনবে তাকেই ন্যায্য বলা হবে।

আমাদের কর্মের ন্যায্যতা বিষয়ে এই সংজ্ঞার সবচেয়ে তীব্র সমালোচক হলেন 'কর্তব্যবাদী'রা (deontologists)। আমরা বলেছি ন্যায্যতার উৎস শুভবোধ। এই বক্তব্যটি সত্য হলে সর্বত্রই বলতে হবে যে এমনভাবে কাজ করো যা সর্বাপেক্ষা মঙ্গল আনবে জীবনে। এই নীতিটির যদি কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় তবেই বিপদ। 'কর্তব্যবাদীরা কয়েকটি ব্যতিক্রম করেন। তাদের মতে, শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের জন্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন কিছু করতে হয় যা ঠিক ন্যায্য নয়। যেমন **প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির উদাহরণ**।

কর্তব্যবাদীদের আপত্তি

ধরা যাক আমি বিত্তবান 'ক' ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছি এবং মাসের ১লা তারিখেই ফেরৎ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ১লা তারিখ পকেটে টাকা নিয়ে আমি ক বাবুর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথে আমার এক বন্ধু খ এর সঙ্গে দেখা হলো। ওর টাকার বিশেষ প্রয়োজন। আমার পকেটে টাকা আছে। আমি খ এর বিপদ দূর করতে পারি। আমি কি তাকে টাকা দেবো? মনে মনে আমি সর্ব শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের নীতির কথা ভাবলাম। এক্ষেত্রে যার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন তাকে দিলেই কি সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না? কিন্তু একথাও ঠিক যে আমার এমন ব্যবহার লোকেরা সহ্য করবে না, নীতি নির্ভর আমার এই কীর্তিটিকে তারা সন্দেহের চোখে দেখবে। তাদের মতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে সর্বপ্রথম কর্তব্য তা রক্ষা করা। তার জন্যে পৃথিবী রসাতলে যায় তো যাক। আমার কর্তব্য শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের পরিচর্যা করা নয়, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

প্রতিশ্রুতির উদাহরণ

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই 'কর্তব্যবাদী'দের সঙ্গে একমত যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই সাধারণত মানুষের কর্তব্য। একথাও জানাচ্ছি যে ন্যায় অন্যায় বিষয়ে সাধারণ ধারণাকেও স্বীকার করতে হয়। কারণ আমরা তার ভিত্তিটি খুঁজছি, যা জানা থাকলে কর্মের চরিত্র নির্ধারণ করা সহজ হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে বর্তমান উদাহরণে কোন্ কর্তব্যটির সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের প্রশ্ন বিবেচিত হবে। যারা বলেন যে দুঃস্থ বন্ধুকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল সুতরাং শ্রেষ্ঠ ন্যায়

তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষার সঙ্গে মঙ্গলকে জড়াতে নারাজ। কার্যত, প্রতিশ্রুতি রক্ষার ঘটনায় মঙ্গলের কোনো প্রসঙ্গই নেই যেহেতু আমি আমার দেয়টি ফেরৎ দিতে বাধ্য। সাধারণভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষাই কর্তব্য এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে বাছাইয়ের কোন সুযোগ নেই। ওখানে কর্মমাত্র একটিই। যাঁরা বলেন বন্ধুকে সাহায্য করা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন, যে প্রয়োজনের হিসেবে দুঃস্থ বন্ধুর দাবি সর্বাধিক কিছু আমাদের বক্তব্য মতো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই কর্তব্য। কারণ সেটাই সাধারণ নিয়ম। প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রসঙ্গে সাক্ষাৎভাবে মঙ্গলটি নজরে না পড়ায় অনেকে কর্তব্যের চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হন। কিন্তু এই ঘটনাতেও মঙ্গলের কথা থাকে। প্রতিশ্রুত টাকা ফেরৎ দেওয়া কর্তব্য এবং তা আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না কারণ আমাকে জানতে হয় আমার কর্মে একটি সামাজিক সামান্য নীতির প্রসঙ্গ থাকছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে এই সামান্য সামাজিক নিয়মটি নষ্ট হয়।

নিয়মের তাৎপর্য বিষয়ে অধ্যাপক জন রল্‌স দেখিয়েছেন যে দুভাবে নিয়মকে বোঝা যায়। এক অর্থে নিয়ম বলতে আমরা বুঝি কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মীমাংসিত কর্তব্য। সমাজ প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে যে ভাঙার চাইতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেই সুবিধে বেশি। সুতরাং সবাই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

নিয়ম : মীমাংসিত কর্তব্য

এই বক্তব্যে প্রয়োজনসিদ্ধিটাই আসল। কোথাও নিয়ম মানলে দেখি নিয়ম মতো সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোথাও নিয়মের সঙ্গে আমার সুবিধের যোগ নেই। তখন তা মানি না। অর্থাৎ নিয়মকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে ব্যতিক্রমের নজীরে। ব্যতিক্রমটা আমরা ব্যাখ্যা করছি।

কিন্তু অন্য একটা স্তরে জানি নিয়ম বিষয়ে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরকম। নিয়ম ব্যবহারের সংজ্ঞা দেয় ও সীমা নির্ধারণ করে। আমরা জানতে পারি যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে ব্যবহার বা আচরণের এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্যদের ভাবনা ও কর্ম অনুযায়ী নিজের কর্মকে ছকা যায় না। বরং তখন উল্টোটাই ভাবতে হয়। রল্‌স লিখেছেন 'As an alternative one realizes that what is required is the establishment of a practice, the specification of a new form of activity ; and from this one sees that a practice necessarily involves the abdication of full liberty to act on utilitarian and

prudential grounds" ব্যক্তি কখনোই প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাৎপর্য বুঝবে না যদি না সে এটাকে বৃহত্তর সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বা রক্ষা না-করা বিচারে ব্যক্তি নিজের বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে না, তখন স্বেচ্ছায় সামাজিক অনুশাসনটিকেই অনুসরণ করবে। নিজেকে একক এবং একমাত্র বিচারক মনে করলে এবং সেই ভাবনা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে সামাজিক স্থিতির বন্ধনটিই নষ্ট করা হয়। আমার মতো সবাই তখন তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি বিচারের দায়িত্ব নেবে এবং যে যার খুশি মতোই কর্ম করতে থাকবে। তাতে দুটো অসুবিধে। প্রথমত, কোনো কর্মের বিচার থাকবেনা ও দ্বিতীয়ত, বিচার থাকলেও তা আলোচনার যোগ্য হবে না যেহেতু সমস্তটাই ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে যাবে। সুতরাং দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়, প্রতিশ্রুতি রক্ষার পেছনে বৃহত্তর মঙ্গলের স্পষ্ট-নির্দেশ আছে এবং 'what is at stake is not merely the value of my act, but the value of the practice of which that act is a part.'

প্রতিশ্রুতি বৃহত্তর সংস্কারের সঙ্গে জড়িত

আমাদের আলোচনায় ন্যায়ের সামাজিক চরিত্র ও কর্মের ভিত্তিকে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলো। এই বক্তব্য থেকে প্রথমত আমাদের জানতে হচ্ছে যে ব্যক্তির কর্মের নৈতিকতার পেছনে সামাজিক কর্ম-প্রবর্তনা ও কর্ম-বিচার থাকে। ব্যক্তি তা ভাঙতে পারে না, ভাঙা তার পক্ষে উচিত নয়। যেহেতু তাতে সমাজের ভিত্তি নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির কর্মের স্বাধীনতা, যেমন উপযোগিতাবাদীরা দাবি করেন, থাকতে পারে না। অথচ আমরা আমাদের সংজ্ঞা প্রকরণে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলেছি এবং জানিয়েছি যে তথ্য ও তত্ত্বের মিলন বললে সামাজিক নীতি ও ব্যক্তির বিবেচনাকে মেলাতে হয়। সেক্ষেত্রে আমরা নীতিকে স্বীকার করে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমকে মেনেছি। ব্যতিক্রমকে জীবনে অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং ব্যতিক্রমের স্বাধীনতা ব্যক্তিকে দিতেই হবে। অবশ্য ব্যতিক্রমটাই নিয়ম নয়; নিয়মের সূত্রেই ব্যতিক্রমের তাৎপর্য। ব্যতিক্রমের প্রসঙ্গটি মূল্যবান কারণ মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা জানি তাঁরা প্রচলিত বিধি নিষেধকে ভেঙে নতুন বক্তব্য আনেন। তাঁরা যদি তাঁদের স্বকীয়তার জোরে নিয়ম ভাঙতে পারেন তবে নিশ্চয়ই প্রতিটি ব্যক্তির সে অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকারের সীমা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও

নিয়ম ও ব্যতিক্রম

সমাজের মঙ্গলের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ তাকে ভাঙবার সঙ্গেসঙ্গেই নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রমাণ দিতে হবে।

মানুষকে বিচারের জন্য সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন জীবনেও তাই মনের খোঁজ নিতে হয়। হেনরী সিজউইকের বক্তব্যে তাই পাই বাইরের হিসেবে মানুষকে বিচার করতে গেলে বহু ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কর্মের চরিত্র বিচার করতে হয় কর্মীর উদ্দেশ্য, চিন্তা ও কল্পনা দিয়ে। তিনি লিখছেন 'from a consideration of the external effects of their actions .. judgments are to be superficial and erroneous, and that a certain state of agent's mind, a certain quality of intention, purpose, motive or disposition, is required to constitute an act morally good'। রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস কবিতাটিতে এই সমস্যার আভাস আছে। মৈত্র মশায় মোক্ষদার মুখের কথা শুনেছিলেন দুরন্ত পুত্রকে সাগরে ভাসিয়ে দেবার বক্তব্যে, অন্তরের ভাষা শোনেন নি। শুধু মুখের কথায় মোক্ষদার বক্তব্য বিচার করলে নিশ্চয়ই পুত্রকে ভাসিয়ে দেওয়া কর্তব্য, যা মৈত্র মশায় করেছিলেন। কিন্তু কার্যত মোক্ষদাই ব্যাপারটা স্পষ্ট করেন ঈশ্বরকে অভিযোগ করে যে তুমি কি জননীর অন্তরের কথা শোনোনি। সুতরাং কর্মের নৈতিকতা বিচারে ব্যক্তির মনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কর্মীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বাসনা-কামনা, স্বাধীনতা-পরাধীনতার মাত্রা জানা না থাকলে কর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। মনস্তত্ত্ব মনের ক্রিয়া-কলাপ ও নিয়মাদির আলোচনা করে সুতরাং নীতিশাস্ত্র মনস্তত্ত্বের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত।

কর্মকে মনের সঙ্গে মেলাতে হয়। বাহ্য বিচারে ভুল থাকে

কর্মকে বাহ্য প্রভাবের দিক থেকে যখন আলোচনা করা হয় তখনো আমরা জানি তার বিচার চলে অন্যের ওপর কর্মের প্রভাব থেকে। মানুষের ইচ্ছা ও কল্পনার ওপর অন্যদের কর্মের প্রভাব থেকেই ভালো ও মন্দের চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করা হয়। সুতরাং নীতিশাস্ত্রজ্ঞরা যে কোনো গোষ্ঠীরই হন না কেনো তাঁদের চর্চায় মানুষের মনের প্রসঙ্গ মৌলিক। হেনরী সিজউইকের বক্তব্যে তাই চমৎকার ভাবে জানতে পারছি যে নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় মনস্তত্ত্ব আসছে দুভাবে।

আবেগ ও কাজের গুণাগুণ

(ক) whether (1) they hold that man's ultimate end is

to be found in psychical existence regarded as merely sentient and emotional, identifying it with some species of desirable feeling or pleasure, or the genus or sum of such feeling; or whether (2) they rather maintain that the well being of the mind must lie solely or chiefly in the quality of its activity—its Virtue.' সিজউইকের ভাষ্যে, প্রথমটি হলো, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা আবেগের অস্তিত্বে মানুষের লক্ষ্য সম্ভবত আনন্দ বা সুখজনক বোধ এবং দ্বিতীয়টি, মনের মঙ্গল নির্ভর করে তার কাজের গুণাগুণের ওপর। এই দুটি বক্তব্যের যে কোনোটিকে বিশ্লেষণে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করলেই মনস্তত্ত্বের সংযোগ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ প্রথমত আমাদের সুখ দুঃখের মাত্রা বিষয়ে আলোচনা করতে হয় এবং দ্বিতীয়ত, চরিত্রের বিভিন্ন গুণাগুণের সম্পর্ক ও বৈপরীত্য বিষয়ে অবহিত হতে হয়।

গ্রীক চিন্তায় প্রভাবিত থেকে যদিও আমরা জীবনে যুক্তি বিবেচনাকে উঁচুতে স্থান দিয়েছি তবু মানতে বাধা নেই যে খৃষ্টীয় বক্তব্যের গুরুত্ব জীবনে অসাধারণ। হেনরী সিজউইক মানছেন যে যতোই 'যুক্তির বাছাই' বলি না কেনো একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে কর্মের উৎস শেষ পর্যন্ত 'বুদ্ধি' নয়, মূলতই 'আবেগ'। সুতরাং সতর্ক মনস্তাত্ত্বিক বিচার নীতিশাস্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের জীবনের কাম্য বিষয়ের আলোচনাও স্বভাবতই মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় যেহেতু কামনা মানুষ যুক্তিতে ভেবে ভেবে স্থির করে না। স্বাভাবিক বৃত্তি ও সামাজিক পরিবেশের টানাপোড়েনে তা গড়ে ওঠে। মনস্তত্ত্ব স্বাভাবিক বৃত্তির পরিচয় দেয়, টানাপোড়েন চরিত্র বিষয়ে আমাদের অবহিত করে। সুতরাং সিজউইকের বক্তব্য বিনা দ্বিধায় মানা যেতে পারে যে 'all important ethical notions are also psychological.'

নীতিশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বের একটি প্রধান পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের সূত্রেই বিজ্ঞান ও নীতির সমস্যাটি স্পষ্ট হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞান বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে অগ্রসর হয়, অস্তিত্বের মূল্য বিচার করে না। বস্তুর অস্তিত্বকে মেনে নিলে তবে একটিমাত্র কর্তব্য থাকে এই অস্তিত্বের বিভিন্ন সম্পর্ককে বিচার করা। প্রকৃতি বিজ্ঞান কখনোই অস্তিত্বের তাৎপর্য বা অস্তিত্ব কেনো এই প্রশ্নটি করে না। অস্তিত্ব তার কাছে একটি স্বীকৃত তথ্য এবং সে তথ্যের সম্পর্ক

মনস্তত্ত্ব কী বিষয়ে আলোচনা করে আর নীতিশাস্ত্র ভালোমন্দ

নির্ধারণ করে মাত্র। আর যে কোনো নীতিমূলক শাস্ত্রের প্রধান কথাই হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বকে এমনিতে স্বীকার না করা। তারা আদিতেই অস্তিত্বের মূল্য বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। জানতে চায় কেনো এই অস্তিত্ব, তার দ্বারা কী প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে। এই কেনো এবং কী-এর সূত্রেই তুলনামূলক বিচারের সূত্রপাত ও প্রয়োজনীয়তার তারতম্যভেদ। মূল্যের তারতম্য ভেদে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে বুঝবার চেষ্টায় নীতিমূলক শাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে মূলতই পৃথক আলোচনায় পর্যবসিত হয়। পদার্থবিদ্যা যেমন বস্তুর সত্য অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্বকে নানা নিয়মে স্থির করতে চাচ্ছে আর নীতিমূলক শাস্ত্র বলছে সত্য জানলেই চলেনা সত্যের ব্যবহারে মূল্যের তারতম্য ভেদ আছে, ভালোমন্দ আছে। পারমাণবিক শক্তির জ্ঞান ভালো কিন্তু পারমাণবিক বোমায় মানুষকে হত্যা করা ভালো নয়। নীতিশাস্ত্র এই দ্বিতীয় বক্তব্যের দলে আর মনস্তত্ত্ব প্রথম দলে। মনস্তত্ত্বের খোঁজ কেমন করে মন কাজ করে আর নীতিশাস্ত্রের বক্তব্য কেনো সে কী করবে। একটি অস্তিত্ব বিষয়ে চিন্তিত আর একটি ঔচিত্য বিষয়ে।

কাজেই মনস্তত্ত্ব নীতিশাস্ত্রের সর্ববিধ বক্তব্য বিষয়ে জড়িত হলেও 'শুভ, 'অশুভ', 'ন্যায় ও অন্যায়' ইত্যাদির বিরোধ বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। কারণ মনস্তত্ত্ব অস্তিত্বের আলোচনা করে ঔচিত্যের নয়। তেমনি নীতিশাস্ত্রের পরিধি থেকে মনোবিজ্ঞানের পরিধি বৃহত্তর। নীতিশাস্ত্র কেবলমাত্র সঙ্কল্পজাত স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ে আলোচনা করে আর মনস্তত্ত্ব মনের তিনটি প্রধান ক্রিয়া বিষয়েই চর্চা করে। মনের এই তিনটি প্রক্রিয়া হলো চিন্তা, অনুভূতি ও সঙ্কল্প। এই তিনটি প্রক্রিয়া ছাড়াও মনস্তত্ত্ব সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, স্বপ্ন, কল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।

নীতিশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বের আরো একটি তফাৎ হলো এই যে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা মানসিক ক্রিয়াজাত ফলের বিষয়ে, আর মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে নিছক প্রক্রিয়া ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে। প্রতিক্রিয়ার অর্থ মন কিভাবে কাজ করে, এবং মানস-উদ্ভূত চিন্তা আবেগ ইত্যাদির ক্রিয়া আবার মনে কেমন প্রভাব বিস্তার করে। নীতিশাস্ত্র কখনোই ক্রিয়া বা প্রভাব বিষয়ে চিন্তা করে না কারণ তার লক্ষ্য কর্ম। কর্মের চরিত্র বুঝবার জন্যে নিশ্চয়ই মনস্তত্ত্বের সাহায্য তাকে নিতে হয় কিন্তু কর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মানসিক ফলাফল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোনো তাৎপর্য নেই।

বর্তমান কালে অনেক পণ্ডিত মনস্তত্ত্বের ওপর নীতিশাস্ত্রের প্রভাবের কথা বলছেন। সাধারণভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নজীরে মনস্তত্ত্ব চলে তাই নীতিশাস্ত্রের বক্তব্যকে এতোকাল মনস্তত্ত্বের গবেষণাগারের বাইরে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু একদল পণ্ডিত সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন যে মনস্তত্ত্বের একটি অংশ শুধু মাত্র তাত্ত্বিক আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকতে পারেনা কারণ মানুষের মন মৃত জড় বস্তু নয় যে তাকে জীবন্ত দেহ থেকে পৃথক করে সম্পর্কহীনভাবে বিচার করা চলবে। কিছুদূর পর্যন্ত সম্ভব হলেও আলোচনায় পুরো মানুষটির সত্তা উপস্থিত হয় এবং প্রভাব ফেলতে থাকে। তার সমগ্র সত্তাকে বুঝতে না পারলে তার মনের কার্যকারণ সঠিক বোঝা যাবে না। যেমন মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ফ্রয়ডীয় বিচার থেকে নানা সমস্যাবলী মাথা তোলে। অসুস্থ ব্যক্তিটিকে কেমন করে বোঝা যাবে? তাকে কি সম্পূর্ণ মানব সমাজের নীতির পরিমণ্ডল থেকে তফাৎ করা সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাবে নানা শাখায় মনস্তাত্ত্বিকরা বিভক্ত হয়ে যান; এবং চিকিৎসার তত্ত্বে ক্রমশ অনেকে বলতে থাকেন যে চিকিৎসককে নীতিশাস্ত্র বিষয়ে অবহিত হতে হবে যেহেতু তাঁর বিবেচনা ও কল্পনার ওপর অসুস্থ ব্যক্তিটির সমস্ত জীবন নির্ভর করছে। অর্থাৎ তিনি যখন তাকে বাঁচার নির্দেশ দেবেন তখন সমাজিক নৈতিক মানটি তাঁকে জানতে হয়। অর্থাৎ দুভাবে নীতি-শাস্ত্র আসছে। প্রথমত রোগীকে বুঝবার জন্যে ও দ্বিতীয়ত তাকে সুস্থভাবে জীবনে পুনর্বার স্থিত করবার জন্যে অবশ্য। এই বক্তব্য এখনো সবাই স্বীকার করেন না। তাঁরা মানুষ পূর্ণাঙ্গ সত্তা ছাড়াই দৈহিক যন্ত্রপাতির পরিচয় নিচ্ছেন বা নিতে যাচ্ছেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়ড তাঁর 'Introductory Lectures to Psycho Analysis' গ্রন্থে তাই তাঁর বিরুদ্ধে অনৈতিকতার অভিযোগের জবাবে স্পষ্ট লিখেছেন 'It is no part of our intention to deny the nobility of human nature, nor have we ever done anything to disparage its value. On the contrary, I show you not only the evil wishes which are censored, but also the censorship which suppresses them and makes them unrecognizable. We dwell upon the evil in human beings with the greater emphasis only because others deny it, thereby making the mental life of mankind not indeed better but in-

মনস্তত্ত্ব বর্তমানে নীতিশাস্ত্রকে কিছুটা মানছে

comprehensible. If we give up the one-sided ethical valuation then we are sure to find the truer formula for the relation of evil to good in human nature'.

৫। নীতিশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব (Ethics and Sociology)

সমাজতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক যোগ মানুষকে কেন্দ্র করে। সমাজে মানুষের পরিপূর্ণতা। এবং পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায় তার স্বাভাবিক কর্মে সুতরাং কর্মের দিক থেকে নীতিশাস্ত্র সমাজে আসে এবং সামাজিক মানুষের পরিপূর্ণতার বিচারে সমাজতত্ত্ব নীতিশাস্ত্রের নিকটবর্তী হয়।

নীতিশাস্ত্র স্বাধীন মানুষের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্মের আলোচনা করে। আলোচনার সূত্রপাতেই নীতিশাস্ত্র জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করে ও সেই লক্ষ্য অনুযায়ী জীবনকে সংগঠিত করবার নির্দেশ দেয়। সমাজতত্ত্ব অবশ্য সামাজিক মানুষের বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু এবং পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র আলোচনা করে। সাধারণভাবে এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজতত্ত্ব প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাছাকাছি কারণ সংগঠনের রূপ ও চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করলে চর্চার বিষয় হয় বাহ্য কাঠামোটি অর্থাৎ যাকে বিজ্ঞান বলে নিছক অস্তিত্ব। সমাজতত্ত্ব নিশ্চয়ই এই অর্থে বিজ্ঞান কিন্তু মানুষের কোনো সংগঠনের রূপ ও চরিত্র তার তাৎপর্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত অবস্থায় বোঝা যায় না। মানুষ তার জীবনের কল্পনা ও সত্যকেই বিভিন্ন সংগঠনে প্রকাশ করে। সংগঠনের বাহ্যরূপ ও সম্পর্কে সেই সত্যের পরিচয় থাকে। সুতরাং এই আদর্শ ও কল্পনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য পরিপূর্ণ মানুষটিকে বোঝা দরকার। মানুষটিকে বুঝতে গেলেই তার জীবনের লক্ষ্য বুঝতে হয় এবং লক্ষ্যের উত্থানপতনের সঙ্গে মিলিয়ে তার কর্মকে ব্যাখ্যা করতে হয়। যেমন ধরা যাক আমরা বা সমাজতত্ত্ব 'পরিবার' বা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামক সংগঠন দুটিকে জানবে। যে-মুহূর্তে পরিবার বা শিক্ষা সংগঠনের স্বরূপ সমাজতত্ত্ব বুঝতে চাইবে সে-মুহূর্তেই তাকে ইতিহাসের সাহায্য নিতে হবে কারণ ইতিহাসেই সে দেখতে পাবে সংগঠন দুটি স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ ভাবে অনাদিকাল [illegible] এক এবং অবিকৃত অবস্থায় নেই। বার বার তার পরিবর্তন হয়েছে। সমাজতত্ত্বকে যদি পরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তিত রূপ বিষয়ে জানতে হয় তবে প্রথমেই প্রশ্ন করতে হবে কেনো এই পরিবর্তন? কেনোর জবাবের জন্য তাকে স্থান ও কালে নিবদ্ধ বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর খবর নিতে হবে। পাত্র-

সমাজতত্ত্বও উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন

পাত্রীরা যেহেতু জীবন্ত মানুষ, সমাজতত্ত্বে পাত্রপাত্রী বলতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, তাদের স্থায়ী সম্পর্ক বোঝায়। অর্থাৎ পাত্রপাত্রীকে বুঝবার জন্তে তাদের সংস্কৃতির কাছে যেতে হবে। সংস্কৃতি থেকে খোঁজ পাওয়া যাবে তাদের জীবনের মৌলিক লক্ষ্য ও প্রেরণার কথা। এবং সংস্কৃতিই জানাবে কেনো বিভিন্ন কালে সংগঠনগুলোর বিভিন্ন রূপ। আমরা এ-কথাও জানি যে সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সুতরাং সর্বজনীন বিশ্বমানবিক কোনো বক্তব্যে সংগঠনগুলোর পরিচয় মিলবে না। কাজেই সমাজতত্ত্বকে বারংবার মানুষের খোঁজ নিতে হয় এবং এই পূর্ণ মানুষের সঙ্কল্প ও চরিত্রের আদর্শ জানায় নীতিশাস্ত্র। কাজেই নীতিশাস্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতত্ত্বের চলে না। বিজ্ঞান হলেও সমাজতত্ত্ব কোনো মতেই প্রকৃতিবিজ্ঞান হতে পারে না। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মানুষের নীতি ও আদর্শ তাকে গ্রহণ করতে হবে।

অনেক পণ্ডিত বলতে চাচ্ছেন যে নীতিশাস্ত্রের মতো সমাজতত্ত্বের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। কারণ সমাজতত্ত্ব শুধুমাত্র সংগঠনের গড়ন বিষয়ে চিন্তিত আর নীতিশাস্ত্র জীবনের মৌলিক লক্ষ্য অনুযায়ী আলোচনাকে গড়েছে। সমাজতত্ত্ব নিজে থেকে সম্ভবত কোনো নির্দিষ্ট সত্য স্থির করেনি কিন্তু সামাজিক মানুষের জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে চর্চা করবার জন্য তাকে বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের চর্চা করতে হয়।

অনেকের মতে সমাজতত্ত্ব সমগ্র সমাজের আলোচনা করে আর নীতিশাস্ত্র ব্যক্তির কর্মকে নির্দেশ দেয় মাত্র। কাজেই সামান্য সত্যের বিচারে নীতিশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বে বৃহৎ ফারাক। কথাটা আদৌ সত্য নয়। সমাজতত্ত্ব যেমন বিভিন্ন সমাজের আলোচনা থেকে মৌলিক সামান্য নিয়ম খোঁজে, নীতিশাস্ত্রও তেমনি মূলনীতির নিয়ম আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে তুলনায় বরং উল্টোটাই সত্য

সমাজতত্ত্ব সমগ্র সমাজের আলোচনা করে, নীতিশাস্ত্র ব্যক্তির

যে সমাজতত্ত্ব মানুষের বিভিন্নতার কারণে কখনোই কোনো সামান্য সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারবে না। অথচ চিরকালীন মানুষের মনের ঐক্যের কারণে নীতিশাস্ত্র অনেক বেশি সহজে সামান্য নিয়মের নির্দেশ দিতে পারে। যেমন ধরা যাক, সমস্ত দেশেই সর্বকালে নীতিশাস্ত্র বলছে 'সত্যকথা বলতে হবে' বা 'বলা উচিত'। এ বিষয়ে স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ ভাবেই ঘোষণা করা যায়। কিন্তু সমাজতত্ত্ব কখনোই বলতে পারেনা পরিবার নামক সংগঠনটি একটি সর্ব জাগতিক ছকে বিবর্তিত হচ্ছে।

বরং সমাজতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রে সমাজের কারণেই গভীর ঐক্য রয়েছে। দুটি শাস্ত্রই সমাজবদ্ধ মানুষের আলোচনা করে। সমাজতত্ত্ব সংগঠনের সামাজিক রূপটির নির্দেশ দেয় আর নীতিশাস্ত্র সামাজিক উচিত ও কর্তব্যের বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। অবশ্য নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ ব্যক্তিগত কর্মেই প্রকাশিত আর সমাজতত্ত্বের সংগঠনে ব্যক্তির প্রসঙ্গটি অবান্তর। নীতিশাস্ত্র সামান্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করলেও গোড়াতেই মেনে নিয়েছে যে সামাজিক কর্মের অর্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন সংকল্প এবং স্বাধীন কর্ম। কাজেই সমাজের ভালোমন্দের পাশাপাশি ব্যক্তি তার ধারণা ও বিবেচনা মতো কাজ করবে। কাজের ক্ষেত্রে তার কর্মের উৎস ভিন্ন কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার ও তত্ত্বই প্রযুক্ত হবে। সমাজতত্ত্বে ব্যক্তির সংগঠন বলতে কিছু নেই কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজের অর্থই হলো পারস্পরিক সম্পর্ক।

বর্তমানে অনেকে বলতে চাচ্ছেন যে নীতির জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু বিষয়ে মানুষের জ্ঞান সমাজতত্ত্ব নির্ভর। সমাজতত্ত্বই এই নীতিগুলোর সামাজিক উৎসের অনুসন্ধান করে এবং আবিষ্কার করে। কাজেই নীতিশাস্ত্র তার নীতিকে জানবার জন্যে সমাজতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। এই বক্তব্যটি আংশিক ভাবে সত্য এবং আংশিক ভাবে মিথ্যা। সমাজতত্ত্ব নিশ্চয়ই প্রত্যেক তত্ত্বের সামাজিক উৎস ও কার্য-কারণ নির্ণয় করে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই শাস্ত্রের নির্ভরতা সমাজতত্ত্বের ওপর বর্তাচ্ছে। সমাজতত্ত্ব তথ্যের সামাজিক শিকড়টি না-জানালেও স্মৃতি পরম্পরায় জানা থাকে যে কোনো এককালে বিশেষ কার্যকারণের ফলেই তত্ত্বের জন্ম হয়। কিন্তু তত্ত্বের জন্ম বৃত্তান্ত জানলেই তত্ত্বের চরিত্র বোঝা যায় না। সমাজতত্ত্ব বহু ক্ষেত্রে জন্ম বৃত্তান্ত দ্বারা তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে চায়। দর্শনে এই ভ্রান্তিকে 'জন্মগত ভ্রান্তি' বা 'জেনেটিক ফ্যালাসী' বলা হয়। যেমন পাঁকে পদ্মফুল জন্মায় কিন্তু তার দ্বারা কখনোই পদ্মের চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায় না। যে-কোনো তত্ত্বই জন্মের পর নিজস্ব স্বাধীন সত্তায় বিমূর্ত রূপ গ্রহণ করে। কাজেই নীতিশাস্ত্রকে তার তত্ত্বগুলোর জন্য সমাজতত্ত্বের মুখাপেক্ষী থাকার কোনো কারণ নেই।

অনেকের মতে নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান সমাজতত্ত্ব নির্ভর

বরং তত্ত্বের চরিত্র বুঝবার জন্য বহুক্ষেত্রেই সমাজতত্ত্বকে নীতিশাস্ত্রের কাছে যেতে হয়। নীতিশাস্ত্র সমাজতত্ত্বের থেকে সামাজিক রীতিনীতি, সংগঠনের রূপ ও সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য জেনে নিয়ে তার তত্ত্ব ঠিক করবার চেষ্টা করে।

৬। নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতি (Ethics and Politics)

নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির যোগ জীবনের সামগ্রিক কল্যাণের সূত্রে। নীতিশাস্ত্র মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা বলে যা প্রতিটি ব্যক্তিকেই সচেতনভাবে পাবার চেষ্টা করতে হয়। আর রাজনীতি তেমনি রাষ্ট্রের সামনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য উপস্থিত করে যা নাগরিকদের জীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। নীতিশাস্ত্র যেমন সামাজিক মানুষের ভালোমন্দের বিচার করে রাজনীতিও সামাজিক মানুষের ভালোমন্দ, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মাথা ঘামায়। নীতি-শাস্ত্রের দুটো দিক, একটি সামান্য নিয়ম ও অন্যটি ব্যক্তির সেই নিয়ম অনুযায়ী কর্ম। রাজনীতিরও দুটি দিক। একটি ব্যক্তির সচেতনতা ও সেই সচেতনতা অনুযায়ী কর্ম ও অন্যটি রাজনীতির সামান্যতত্ত্ব।

ব্যক্তির কর্মের দিক থেকে রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রের গভীর মিল আছে। নীতিশাস্ত্র-সর্বদাই বাস্তব কর্মে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের প্রতিফলন আশা করে। নীতি-শাস্ত্রের আদর্শ ব্যক্তির কর্মেই একমাত্র রূপ পেতে পারে। রাজনীতিতে এই বক্তব্যের কিছু পরিচয় আছে। কারণ রাজনীতি যদিও প্রধানতই রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে জড়িত তবু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। সিজউইক তাই সঠিক বলেছেন যে নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির যোগ ব্যক্তির দিক থেকে স্পষ্ট কারণ 'as a study of the Gcod or wellbeing of men, so far as this is attainable by the rational activity of individuals as such'। একটি উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

ব্যক্তির কর্মে রাজনীতি নীতিশাস্ত্রের যোগ

ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্রে একটি বিশেষ অধ্যায় আছে যেখানে বিভিন্ন রাজ্যকে কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশগুলোর কোনো আইনী ক্ষমতা নেই। ওই সব নির্দেশে সাম্য স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা আছে সমাজতন্ত্রের নজীরে। এই নীতিগুলো মানতেই হবে এমন নয়, আবার কেউ কেউ পুরো মানতে পারে। যে মানবে তার আচরণে এই সব আদর্শের সার্থক প্রতিফলন পাওয়া যাবে এবং সমাজেরও উপকার হবে। আবার তেমনি ব্যক্তির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া যায় যে গণতন্ত্র কার্যত নির্ভর করে ব্যক্তিদের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও কর্মের ওপর। ব্যক্তিরা নিজেরাই সচেতন না-হলে কেউ তাদের জীবনে মঙ্গল এবং গণতন্ত্র এনে দিতে পারবে না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ব্যক্তির কর্মের সূত্রে রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রের গভীর

যোগ। নীতিশাস্ত্রের কাছ থেকে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে জীবনের কল্যাণের আদর্শ গ্রহণ করে।

রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রের প্রধান পার্থক্য এই যে রাজনীতিতে ব্যক্তির নিজস্ব প্রসঙ্গ থাকলেও তার ক্ষেত্র ক্রমশই সীমাবদ্ধ হতে হতে নেহাৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। বর্তমানে রাষ্ট্র নামক নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনটি সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা করতলগত করেছে। ফলে ব্যক্তির জীবনের সমস্ত কর্মের নির্দেশ ও বিচার আসছে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংগঠনের কাছ থেকে। সঞ্চালকতন্ত্রে (dictatorship) ব্যক্তির জীবনকে রাষ্ট্রই সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে ব্যক্তির কর্ম ও কল্পনা প্রধানতই অর্থনৈতিক ব্যবহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নীতিশাস্ত্রে ব্যক্তির এখনো স্বাধিকার। যদিও তার ওপর জোরজবরদস্তি চলছে বর্তমানের রাষ্ট্রগুলোতে, তার নৈতিক কর্ম ও বক্তব্যকে কাগজ-বেতার-নাটক-চলচ্চিত্রের মধ্যে বদলে দেবার চেষ্টা চলছে, তবু এখনো ব্যক্তিকে পৃথক ভাবে আলোচনা করা যায় ও ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মকে চালাতে এবং বিচার করতে পারে। সিজউইকের ভাষায় জানা যাচ্ছে 'Still we may to a great extent, study the elements and conditions of the good of individual men, so far it is attainable by the rational activity of themselves or other individuals acting as persons', এবং যতোটুকু পারা যাবে ততোটুকুই নীতিশাস্ত্রের নিজস্ব চরিত্র।

রাজনীতির সমস্ত প্রভাব ও চাপ আসছে বাইরে থেকে। কারণ রাষ্ট্র তার বিধি-নিষেধ আরোপ করে আইনের মারফৎ। বাধ্যবাধকতায় জোর জবরদস্তি করতে পারে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে কিন্তু তার নিয়ম ব্যক্তিদের চিরকাল শরীরের ওপর কার্যকরী, মনের ওপর নয়। যে-কারণে রাষ্ট্র বিরোধী শারীরিকভাবে অত্যাচার করতে পারে, তাদের নৃশংসভাবে নির্যাতন করতে পারে কিন্তু তাদের মনকে মানিয়ে নিজের কথা স্বীকার করাতে পারে না। কিন্তু **নীতিশাস্ত্রের কাজ ভেতর থেকে, মনের ওপর।** নীতিশাস্ত্রের নিয়ম কেউ চাপায় না, ভাঙলেও কেউ বাধা দেবে না বা ভয় দেখিয়ে মানাবে না। অথচ মানুষ বিনা দ্বিধায় নীতিশাস্ত্রের বচন মানছে। কখন অজান্তেই মনের ভেতর তার কাজ শুরু হয়ে যায়। নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সর্বদাই তাই স্বাধীনতার যোগ। আমাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে নীতিশাস্ত্র স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্কল্পস্থিত কর্ম সুতরাং স্বাধীনতার অভাবে কর্ম নৈতিক হতে পারে না।

নীতিশাস্ত্রের স্থান রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্রের নিয়মটি হয় জীবনের মৌলিক নিয়ম বা লক্ষ্য রাষ্ট্র যা মানে অথবা মানে না। মানুক বা না-মানুক রাষ্ট্রকে সর্বদাই তার নিজস্ব নৈতিক বক্তব্য তৈরি করতে হয় কারণ নীতির লক্ষ্যেই সংগঠন গুলো তৈরি হয় এবং চলে। সে কি গণতন্ত্র কি সাম্যবাদ। সম্পূর্ণ নীতিহীন রাষ্ট্র বলতে পৃথিবীতে কিছু হতে পারে না। মুসোলিনীর বক্তব্যে তাই পাচ্ছি—'Fascist State is itself conscious, and has itself a will and a personality—thus it may be called the 'ethic' State.' আবার অন্যত্র বলছেন 'We Fascists have always expressed our complete indifference towards all theories····it is sufficient to have a single fixed point: the nation'. এটাও একটি নৈতিক বক্তব্য কারণ বিচার করে মুসোলিনী তাঁর রাষ্ট্রের কর্তব্য স্থির করেছেন যা এবার নাগরিকদের অনুসরণ করা হবে। হিটলারের এক সহকর্মী যেমন ঘোষণা করেন 'I am ordering you now to be intolerant with everything else. In future there must be in Thuringia one political faith only · the Nazis claim the right to be intolerant in view of the necessity for uniform thinking and acting in the nation as a whole. রাষ্ট্রকে নীতির জন্য নীতিশাস্ত্রের কাছেই প্রধানত আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। কারণ ব্যক্তির জীবনের সর্বোচ্চ কল্পনার সঙ্গেই সমাজের লক্ষ্য জড়িত। রুশো যাকে 'সাধারণ সঙ্কল্প' বলেন তাকে প্রকাশ ও পরিস্ফুট করাই রাষ্ট্রের কাজ। সুতরাং রাষ্ট্রকে 'সাধারণ সঙ্কল্পে'র অন্তর্নিহিত সত্যকে জানবার জন্য নীতিশাস্ত্রের কাছে ব্যক্তির পুরুষার্থের কল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

নীতিশাস্ত্রের স্থান রাষ্ট্রের ওপর

প্লেটো-এরিস্টটল রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্রের অধীন শাস্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ওঁদের মতে ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য আছে, পরিণতির লক্ষ্য নীতিশাস্ত্রের কাছ থেকেই পায়। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ সত্তাতত্ত্ব নিহিত। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ব্যক্তির জীবন ও সামাজিক জীবনের আদর্শ থেকে প্রাণ পায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার রাষ্ট্রের কর্মে নিশ্চয়ই নীতির প্রকাশ থাকে এবং ব্যক্তিরা নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রকে গড়ে নেবার চেষ্টা করে।

৭। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম (Ethics and Religion)

ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধারণভাবে মনে হয় ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের কোনো পার্থক্য নেই। ইতিহাসে যে-কোনো সাংস্কৃতিক পর্বেই দেখা যাচ্ছে নীতিশাস্ত্রের বক্তব্য সেই ধর্মের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তৈরি হয়েছে। ধর্মের লক্ষ্যই নীতির শাস্ত্রের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। ভারতীয় হিন্দুধর্মের সঙ্গে যেমন হিন্দুদের নীতিশাস্ত্র জড়িত, খৃষ্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে খৃষ্ট-বাদীদের নীতিশাস্ত্র জড়িত। নীতিশাস্ত্রের মৌলিক কিছু প্রত্যয় সামান্য এবং সর্বজনীন কিন্তু তার প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে সংস্কৃতিভেদে প্রচুর পার্থক্য। সেজন্যেই অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় শাস্ত্রে 'love thy neighbour' (প্রতিবেশীকে ভালোবাসা) নামক নির্দেশটি দেখতে না-পেয়ে মনে করেন ভারতবর্ষীয়দের কোনো নৈতিক বক্তব্য নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় দার্শনিক হেগেল যেমন ভারতীয় ধর্মে খৃষ্টধর্মের তুলনায় নিচুস্তরের মন খুঁজে পেয়েছিলেন।

কার্যত কিন্তু নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম কিছুটা পৃথক শাস্ত্র। ধর্মের দুর্থাইম কৃত একটি সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক: দুর্থাইম লিখেছেন 'The first article of all religions is belief in salvation through faith'. আত্মোদ্ধার বা মুক্তির প্রসঙ্গ ধর্মের চরিত্র হলে নিশ্চয়ই নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য থাকে। নীতিশাস্ত্র মুক্তির কথা বলে না, জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী কর্মের কথা বলে। এই লক্ষ্যে মুক্তির আদর্শ নেই। অন্য এক পণ্ডিত ধর্মের সংজ্ঞা দিচ্ছেন 'The belief that there is an unseen order and that our Supreme good lies in harmoniously adjusting ourselves thereto. (William James)। উইলিঅম জেমসের ব্যাখ্যায় অনৈসর্গিক শৃঙ্খলার কথা উঠেছে এবং এই অনৈসর্গিক শৃঙ্খলাকে অনেকে ব্যাখ্যা করছেন মানুষের চেয়ে বড়ো কোনো ক্ষমতার তত্ত্বে। যেমন পাওয়া যাচ্ছে 'Religion is man's belief in a being or beings mightier than himself'.

উইলিঅম জেমসের ব্যাখ্যা স্বীকার করলে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের কোনো প্রভেদ থাকে না। ওঁর মতে ধর্ম একটি বিশ্বব্যাপী নিয়ম এবং এই নিয়মটিই শুভ। নীতিশাস্ত্রও একই কথা বলে। নীতিশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপাদ্য

এই যে জীবনকে ব্যেপে একটি অকথিত অলিখিত নিয়মশৃঙ্খলার ক্রম আছে, এই নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারলেই মহত্তম শুভের জন্ম হবে। নীতিশাস্ত্রের বিধির লক্ষ্য মানুষ, সামাজিক মানুষ। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভালোমন্দের যোগ আছে। সামাজিক ভালোমন্দের সূত্রপাত হয়েছে সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার নিয়মে। এই নিয়ম ও ভালোমন্দের ধারণা থেকেই জীবনের বিমূর্ত মঙ্গল ও শ্রেয়র ধারণা তৈরি হয়। নীতিশাস্ত্র বিশ্বব্যাপী একটি মঙ্গল বা শ্রেয়র কল্পনা করে এবং তাকে কখনোই মানুষের জীবনের বাইরে মনে করে না। প্রতিটি লোককে তখন এই নিয়মটি জানবার চেষ্টা করতে হয় এবং যতোটুকু তারা করে ততোটুকু তাদের জীবনে নৈতিকতা ও অনৈতিকতার প্রশ্ন। গ্রীসদেশে তাই তাদের 'লোগোস' তত্ত্ব নৈতিকতারই প্রতীক কারণ লোগোস শুধু মহাবিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলারই নিয়ম নয়, জীবনেরও নিয়ম। ভারতবর্ষের ঋতঃ তত্ত্ব একই রকমে জীবন ও মহাজগতের নিয়মের কথা বলে।

জেমস বলেন ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে কোনো প্রভেদ নেই

জেমসের ব্যাখ্যায় ধর্ম নিয়মশৃঙ্খলার বোধ হলে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই। কারণ নীতিশাস্ত্র শুভবোধের প্রসঙ্গ তোলে এবং প্রকৃতি ও বিশ্বজাগতিক নিয়মকে শুভবোধের প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু ডঃ ফ্লিণ্টের সংজ্ঞা মানলে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মে তফাৎ তৈরি হয়। ফ্লিণ্টের মতে ধর্মে বিশ্বাসের অর্থ একটি অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস। সে ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে শুভ বা অশুভ বোধের কোনো যোগ নেই। অতিপ্রাকৃত সত্তার বোধ স্বভাবতই কোনো শ্রেয় বা প্রেয়র প্রসঙ্গ তোলে না। অন্তত ডঃ ফ্লিণ্ট সে-ধরণের কোনো কথা বলছেন না। এই ব্যাখ্যায় যে ধর্মের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের তফাৎ করা চলে তার প্রমাণ ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম ও চীনের কনফুশিয়াসের প্রবর্তিত মতবাদ। বুদ্ধদেব ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তাকে স্বীকার করবার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। বুদ্ধদেব জীবনে আচরণীয় কিছু শীলের কথা বলেছিলেন যা ব্যক্তিকে সংসার চক্র থেকে মুক্তি দেবে। এই শীলগুলোর অধিকাংশ জীবনে প্রতিদিনকার কর্তব্য হিসেবে পালনীয়। নিজের ব্যক্তিগত কর্মেই তার প্রকাশ হবে। কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা এসে তা গ্রহণ করবে না বা তার ফল দেবে না। কনফুশিয়াসও একইভাবে জীবনের কয়েকটি কর্মের নীতি বিষয়ে উপদেশ দেন।

এই নীতিগুলোকে আমরা নৈতিক শীল বলতে পারি কারণ এই নীতিগুলোর লক্ষ্য ঈশ্বর নয় এবং নীতি ইহ-জীবনেই ফলপ্রসূ হয়। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের স্বেচ্ছামূলক কর্ম শুভ বোধের কিছু নীতি অনুসরণ করে তার জীবনের লক্ষ্য সাধন করছে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ে যে ঋত: বা নৈতিক শৃঙ্খলার বোধ আসছে তার উৎস কি? আমরা তো জানি প্রত্যেক ধর্মের পরিমণ্ডলেই জীবনযাত্রার নৈতিকতা তৈরি হয়। ধর্মের বক্তব্য বাদ দিলে এই নীতির কোন তাৎপর্য নেই। যে কারণে একটি দেশের নীতি অন্য দেশের সঙ্গে মেলে না। ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে ধর্মের উৎস থেকেই নীতির জন্ম। কারণ ধর্মই জীবনের চরম লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে, জগত বিষয়ে মনোভাব গড়ে এবং জগত ও মানুষের সম্পর্কে বিচারের মানদণ্ড জোগায়। ধর্ম সমগ্র জীবনকে বুঝবার তত্ত্ব। ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ কল্পনা করা যায়। আবার ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও চলা যায়। কার্যত **ধর্মকে আমরা বলতে পারি এমন একটি মৌলিক প্রত্যয় যা আমাদের জীবনের তাৎপর্য বুঝতে শিক্ষা দেয় এবং সেই তাৎপর্যের অর্থকে জীবনে ধারণ করতে সমর্থ করে তোলে।** হিন্দুর বিশ্বাসের যোগ নাড়িতে নাড়িতে ঈশ্বরের সঙ্গে, কিন্তু বৌদ্ধ বিশ্বাসে কোনো ঈশ্বর নেই। কিন্তু দুটো বিশ্বাসই ধর্ম যেহেতু বৌদ্ধরাও জীবনের মূল তত্ত্বকে বুঝতে চাচ্ছেন এবং সেই তত্ত্ব অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাচ্ছেন। নীতিশাস্ত্র ধর্মের কাছ থেকে জীবনের সমগ্র তাৎপর্যটি গ্রহণ করে ও দৈনন্দিন কর্মে তাকে প্রয়োগ করে কারণ কর্ম ব্যতিরেকে নীতির কোনো অর্থ নেই। পাহাড়বাসী ভারতীয় সাধকের ধর্ম আছে কিন্তু সাধারণভাবে তার কোনো নীতি নেই। সাধক যতোক্ষণ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যাপৃত থাকবেন, অন্যের সম্পর্কে সম্পর্কিত হবেন না, তাঁর কর্মের কোনো প্রভাব সামাজিক জীবন যাত্রার ওপর পড়বেনা, তিনি নীতিশাস্ত্রের আওতার বাইরে থাকবেন। কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারবোনা যে ওঁর কোনো ধর্ম নেই।

নীতিশাস্ত্র ধর্মের কাছে জীবনের সমগ্র তাৎপর্য জানে

ধর্মের সূত্রেই যে নীতিশাস্ত্র তা বুঝবার আর একটি প্রমাণ আছে। ধর্ম মানুষকে জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের জ্ঞান ধর্ম জানালেও, প্রতিদিনকার কর্মে যেহেতু সামাজিক জীবন ব্যাপৃত থাকে, ধর্ম নির্দিষ্ট নিয়ত কর্মের সম্পর্কে কিছু জানায় না। সামাজিক শাস্ত্রাদিই তখন

মূল ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে কর্তব্য কর্ম ও জীবনের শীলগুলোকে ছকে। ধর্মের ক্রিয়াকলাপ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যদিও ধর্মের মূল বক্তব্য কিছু থাকে কিন্তু কার্যত ওই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে সমাজের মনটিই প্রকাশিত হয়, ধর্মের মৌলিক তত্ত্বের চাইতে সামাজিক রীতিনীতি, বিধিনিষেধ ও কর্মের স্বরূপই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে বেশি। এবং আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে ওই কর্মের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের কতো গভীর যোগ।

অনেকে বলতে চান যে নীতিশাস্ত্রের উৎস ধর্ম নয়। প্রমাণ, বহু ব্যক্তি জীবনে ধর্ম না মেনেও নৈতিক জীবন যাপন করেন। বহু ব্যক্তি তেমনি ধর্ম মেনেও অনৈতিক হতে দ্বিধা করেন না। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বহু ব্যক্তি জীবনের শীলগুলো যথাবিহিত অনুসরণ করে যাচ্ছেন এবং শুভবোধকে জীবনে প্রতিফলিত করেছেন, তেমনি বহু ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো দ্বিধা না করেই অন্যায় আচরণ করেন। কিন্তু এই উদাহরণে নীতিশাস্ত্রের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হলেও তার ধর্ম-বিরহিত চরিত্রের কথা প্রমাণ হয় না। কারণ, প্রথমত আমরা ধর্মের ব্যাখ্যায় জানিয়েছি যে, ধর্ম ঈশ্বর বা কোন অতিপ্রাকৃত সত্তাকে বাদ দিয়েও চলতে পারে। ধর্ম বিশ্ব প্রপঞ্চের জ্ঞান মানুষকে দেয়, তদনুযায়ী জীবনকে নতুনভাবে গড়তে বলে। জীবন গড়ার অংশটা নৈতিক অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র তাকে পরিচালিত করে আর বোধের অংশটা ধর্মের। সুতরাং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি নীতির শীল অনুসরণ করে ধর্মকেই প্রকাশ করছেন। যেহেতু জীবনের নীতি অনুসরণ করাই জীবনের ধর্ম। দ্বিতীয়ত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র দেশের নীতির পেছনে থাকে ধর্মের অনুশাসন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি শুধুমাত্র মানবতাবাদের ভক্ত হয়ে যদিও নৈতিক কর্ম চালিয়ে যেতে পারেন, সামাজিক কর্মের জন্যে বহুক্ষেত্রেই ধর্মকে না মেনে তাঁর উপায় থাকবে না। অবশ্য এই প্রতিবাদে ধর্মের বক্তব্য স্বীকৃত হচ্ছে না তবু ধর্ম যে অবিশ্বাসী ব্যক্তির চারপাশে আছে, যা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না তাঁর কর্মে, সে কথাই বলা হচ্ছে; তৃতীয়ত, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি (ঈশ্বরে অবিশ্বাস বলতে ধর্মবিরোধী ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে) মানবতাবাদকে কেন্দ্র করে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারেন কিন্তু বিশ্ব সংসার বিষয়ে তাঁকে ভাবতেই হবে এবং ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে মন স্থির করতেই হবে। শুধুমাত্র নৈতিক কর্ম করেই তিনি জীবনের দায় মুক্ত হতে পারবেন না।

অনেকের মতে ধর্মের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের যোগ নেই, ধর্ম না মেনেও নৈতিক হওয়া যায়

আর এক অর্থে ধর্ম নীতিশাস্ত্রকে সাহায্য করে। ব্যক্তির লক্ষ্য-নির্দিষ্ট কর্মকে আমরা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন থাকে নীতিশাস্ত্র জীবনের শ্রেয় ও প্রেয়র আদর্শ কোথায় পায়? প্রেয় বিষয়ে অবশ্য বলা যায় যে দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের কেন্দ্র থেকে তৈরি করা হয়। কিন্তু শ্রেয় আদর্শের সঙ্গে দৈনন্দিন কর্মের যোগ কেবলমাত্র আদর্শের অর্থাৎ যা আমরা লক্ষ্য হিসেবে জীবনের সামনে রাখবো। সুতরাং শ্রেয় আদর্শ কখনোই জীবনের কর্মকেন্দ্র থেকে তৈরি হয় না। শ্রেয় আদর্শ নিশ্চয়ই জীবনের সঙ্গে জড়িত কিন্তু এই সংযোগ মানুষ অন্য শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে বিচার বিবেচনায় স্থির করে। আমরা জানি যে ধর্ম জীবনের মৌল সংগঠন ও আদর্শ বিষয়ে চর্চা করে এবং আমাদের মহাবিশ্ব বিষয়ে বোধ জন্মায়। সুতরাং ধর্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, পরিপূর্ণতার লক্ষ্য অর্থাৎ শ্রেয় বিষয়ে জানায়। নীতিশাস্ত্র কর্মেই এবং কর্মের লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের বিষয়ে চিন্তিত হয় না। যেমন গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেন। নির্মোহ হতে বলেন। এই নিষ্কাম কর্মের প্রত্যয়টি জীবনে ব্যবহার করতে হবে জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য। এটা ধর্মের কথা, শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকেই প্রকাশ করেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে। আর নীতিশাস্ত্রকে এই বক্তব্য থেকেই পাঠ নিতে হয়। এই বক্তব্য অনুযায়ী কর্মকে বিধিবদ্ধ করবার কথা বলা হয়। ধর্ম তাই শ্রেয়র চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করে এবং নীতিশাস্ত্র সেই শ্রেয়কে জীবনের কর্মে অনুসরণ করে। এ-বিষয়ে হেনরী সিজউইক চমৎকার লিখেছেন 'Ethics and Theology were indissolubly blended. Nor, 'again' must the distinction be taken to imply a complete separation of the two subjects; on the contrary, in almost every philosophical system in which the universe is contemplated as having an ultimate end or Good, the good of human beings is conceived as either identical with, or included in, this Universal Good —or at any rate closely related to it in the way of resemblance or derivation'. সিজউইকের মতে এই ultimate goodই হলো ঈশ্বর।

নীতিশাস্ত্র জীবনের শ্রেয় ও প্রেয়কে জানে ধর্মের কাছ থেকে

ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক বিষয়ে দার্শনিকদের মতবিরোধ আছে।

দেকার্তে ও লক বলেন—ধর্ম থেকেই নীতির উদ্ভব। ধর্ম ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে গড়ে। নীতি ও নীতির আদর্শ ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। নিজের ইচ্ছে থেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টির বাসনা জাগে এবং তিনি মানুষ সৃষ্টি করে জীবনের নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ তৈরি করে দেন। তিনি নিজেই স্থির করেছেন কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা শ্রেয় আর কোন্‌টা নিছক প্রেয়। ভালো কাজের সূত্রেই একমাত্র তাঁর করুণা পাওয়া যায়। মন্দ কাজের ফলভোগ দুঃখের যন্ত্রণায়। কাজেই মানুষ জেনেশুনেই নীতির পথে থাকতে চায়। ঈশ্বরের বিধান মতো নীতির রাস্তায় চলাটাই তাকে শ্রেয় বিবেচনা করতে হয়।

দেকার্তে ও কান্টের মতে ধর্ম থেকেই নীতি

দেকার্তে ও লকের এই বক্তব্যে যেমন কিছুটা সত্য আছে, তেমনি বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। ওঁরা সৃষ্টির কার্য-কারণ বলে নীতির কথায় এসেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা নীতিশাস্ত্রের নয় কিন্তু ঈশ্বরের বিধান প্রসঙ্গে সমালোচনা তোলা যায়। ঈশ্বর যদি স্বয়ং ভালো মন্দ স্থির করেন, লাভক্ষতি ও মঙ্গল-অমঙ্গলকে বণ্টন করেন তবে কর্মের প্রতি ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের নির্দেশ মানতে হয়। ঈশ্বর ছাড়া কর্ম তখন কেমন করে সম্ভব বোঝা যায় না। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর প্রতিপদে হস্তক্ষেপ করলে মানুষকে আর স্বাধীন কর্মের ক্ষেত্র দিচ্ছেন কেনো? বা, জীবনে এতো অন্যায় অবিচার ও মঙ্গলকে রাখছেন কেনো? তিনি ইচ্ছে করলেই যা-খুশি করতে পারেন। কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে আমরা জানি, (যেমন গ্রীসের লোগোস ও ভারতীয় ঋতঃ দেবতাদের ওপরেও প্রযোজ্য এবং স্বয়ং ঈশ্বর তা মেনে চলেন) নীতিকে ঈশ্বর পরিবর্তিত করতে পারেন না। কারণ, তাহলে ভালোমন্দ ইত্যাদির কোনো স্থির মান থাকে না। আরো বলা যায় যে নীতির প্রকাশ স্বাধীন কর্মে এবং যে কর্ম মানুষের স্বভাব থেকে উৎসারিত হচ্ছে। প্রত্যাশা বা লোভের আশায় যে কর্ম তাতে স্বাধীনতার ছাপ নেই, মোহের প্রকাশ আছে মাত্র। কাজেই ঈশ্বরের পুরস্কার বণ্টনের ব্যাপারটা সমর্থন যোগ্য নয়।

কাণ্ট, মার্টিনু প্রমুখরা দেকার্তের বিরোধী কথা বলেন। তাঁদের মতে নীতি থেকেই ধর্ম এসেছে। কাণ্ট দেখান, ধর্মের বিশ্বাস থেকে একটি অতি প্রচলিত ধারণা আছে যে, ভালো লোক, সৎ লোক জীবনে সুখ পায়। তেমনি অসৎ ব্যক্তিরা তাদের আচরণের যথোচিত ফল লাভ করে। অথচ সত্যিকারের পৃথিবীতে

কাণ্ট ও মার্টিনুর মতে নীতি থেকেই ধর্ম

সাধারণতই এমন ঘটেনা। অসাধু-ব্যক্তিরা পরমানন্দে কাল কাটায় এবং সাধু ব্যক্তিরা দুঃখে যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হন। কাজেই আমাদের এমন একটা সহজ কথা বলা সাজে না যে সততার সঙ্গে সুখ ও অন্যায়ের সঙ্গে দুঃখ জড়িত। অথচ এ কথাও সত্য যে জীবনে সমস্ত সদাচরণের ফলে দুঃখ এবং সমস্ত অসদাচরণের ফলে সুখ ঘটতে থাকলে কেউ আর সদাচরণের কথা ভাববেন না এবং তখন অসদাচরণটাই জীবন নিয়ম হয়ে যাবে। কাজেই বিশ্বাস করতে হয় যে এমন একটা নৈতিক শক্তি বিশ্বে কাজ করছে যে, সদাচরণ ও সুখ, অসাদাচরণ ও দুঃখ মৌলিকভাবে জড়িত। অথচ ইহ জীবনে আমরা তা দেখতে পাইনা বলেই কান্ট আত্মার অমরতার কথা স্বীকার করেন এবং জানান যে এ-জন্মে ফল না-পেলে পর জন্মে পাওয়া যাবেই যাবে। এই বিশ্বব্যাপী অমোঘ নৈতিক নিয়মকেই কান্ট ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর নীতির সৃষ্টি করেন নি, নীতির সূত্রেই ঈশ্বর এসেছেন। সুতরাং ধর্মও এসেছে নীতি থেকে।

সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকে তৃতীয় একটি মত পোষণ করেন। তাঁরা বলতে চাচ্ছেন যে ধর্ম ও নীতি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার শুধু জন্মের কথাতেই নয়, জীবনে নীতি ও ধর্মের ক্ষেত্র বিষয়েও আমরা জানি যে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির ভয়ে মানুষ তাদের অনেক বড়ো করে ভাবে এবং বৃহত্তর শক্তির কল্পনা করে। এই শক্তির কল্পনা থেকেই ধর্মের জন্ম। নীতিশাস্ত্রের জন্ম মানুষের সামাজিক বিবেচনায়। যূথবদ্ধ জীবনে, বাঁচার প্রয়োজনেই এমন কর্ম ও আচরণের প্রয়োজন যা সহজে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করবে। সুতরাং ধর্ম ও নীতির উৎসের ক্ষেত্রে কোনো যোগ নেই। পরবর্তীকালে অবশ্য দুটি শাস্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

৮। নীতিশাস্ত্র ও পরাবিদ্যা (Ethics and Metaphysics)

পরাবিদ্যার আলোচনা এই জগত প্রপঞ্চের চরিত্র ও সত্য বিষয়ে। সব শাস্ত্রের শেষ প্রশ্ন এই জগত মূলত কী, মানুষ মূলত কী এবং তাদের সম্পর্কটাই বা কী? পরাবিদ্যা সেই শাস্ত্র যা এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই শাস্ত্র জাগতিক বিষয়ে মাথা ঘামায় না। জাগতিক বিষয়ের শাস্ত্রাদিকে বলা হয় অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা জাগতিক বিষয়ে মাথা ঘামায় না কারণ দৈনন্দিনের কার্য-কারণ ও সম্পর্কে

সত্যের মূল বিষয়ে প্রশ্ন ওঠেনা, সর্বত্রই আমরা মোটামুটি ভাবে সাধারণ কিছু সত্যকে আশ্রয় করে চর্চার শুরু করি। কিন্তু পরাবিদ্যা এই সাধারণ স্বীকৃত সত্যবিষয়ে প্রশ্ন তোলে, জানতে চায় এই সত্যই চরম কিনা এবং এর আড়ালে অন্য কোনো স্থায়ী সত্য আছে কিনা যা সমস্ত জাগতিক সত্য সমূহকে তাৎপর্য দেয়, ব্যাখ্যা করে এবং জীবনের মূল লক্ষ্য ও জগতের লক্ষ্যকে সম্পর্কিত করে।

পরাবিদ্যার লক্ষ্য তাই একটি মৌলিক প্রশ্ন যা সহজ স্বীকৃতির আড়ালে মৌলিক সত্যকে জানতে সাহায্য করবে। আমরা যেমন সমস্ত সামাজিক শাস্ত্রের উৎস হিসেবে মানুষকে ধরে নিয়েছি। মানুষকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় জ্ঞানের চর্চা। আমরা নিজেদের মানুষ বলেই জানি। কিন্তু কেউ কখনো প্রশ্ন করিনি যে মানুষ বলতে কি বোঝায়। আমরা ধরে নিয়েছি মানুষের জীবনের লক্ষ্য মঙ্গল। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করেনি শেষ পর্যন্ত মঙ্গল কি বা কাকে মঙ্গল বলা হবে। পরাবিদ্যা এই প্রশ্নগুলো তোলে এবং ব্যাখ্যা করে মানুষের স্বরূপ, মঙ্গলের চরিত্র এবং কেনো মানুষকে মঙ্গলের লক্ষ্যে চলতে হয়।

নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে পরাবিদ্যার নাড়ীর যোগ। নীতিশাস্ত্রের শুরু কর্ম নিয়ে। স্বাধীন মানুষের স্বাধীন কর্ম। শুধু কর্ম বললেই চলে না কারণ প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না-করলে কর্মের কোনো তাৎপর্য নেই। ছোট হোক বা বড়ো হোক, সাময়িক হোক বা বৃহত্তর ভবিষ্যত কল্পনা হোক, প্রতিটি কর্মই মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কর্ম যদি উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয় তবে আমাদের জানা দরকার কর্মের মৌলিক প্রয়োজনটি কি এবং কেনো কোনো বিশেষ লক্ষ্যকে স্বীকার করতে হবে। নীতিশাস্ত্র এসব প্রশ্নের পুরো জবাব দিতে পারে না। কারণ পুরো জবাব দেবার জন্য তাকে জগত সংসারের মূল সত্যকে জানতে হয়। একমাত্র পরাবিদ্যাই সে সত্যের বিষয়ে জবাব দিতে পারে। দার্শনিক ব্র্যাডলী যেমন বলেন মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তার আত্মোপলব্ধি। সঙ্গেসঙ্গেই তিনি জানাতে ভোলেন না যে, এই আত্মোপলব্ধির কথা বলার অর্থই হচ্ছে 'আত্ম' বিষয়ে সত্য জানবার কথা এবং কেমন করেই বা তাকে উপলব্ধি করা যাবে সেই আলোচনা। তিনি তাই স্পষ্টই বলেন যে এটা হচ্ছে 'Something like a system of metaphysic' অর্থাৎ এই সব প্রশ্নের সূত্রে আমরা পরাবিদ্যায় পৌঁছে যাচ্ছি।

পরাবিদ্যার সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের গভীর যোগ কর্মের উদ্দেশ্য বিষয়ে

ব্র্যাডলী সে জন্যে আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন আমরা নীতিশাস্ত্রের সামনে কিছু কার্যকরী ধারণা (practical end) রাখতে পারি। যেমন বলেছেন কাণ্ট ও উপযোগিতাবাদিরা। কিন্তু কার্যকরী ধারণা থেকে সাময়িক প্রয়োজন মিটতে পারে, জীবনের মূল্য তাতে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা যায় না বা জীবনের মূল লক্ষ্যও তাতে স্পষ্ট হয় না। তার জন্যে প্রয়োজন নির্দিষ্ট লক্ষ্য, যেমন ব্র্যাডলী আত্মোপলব্ধির কথা বলেন। ব্র্যাডলী লিখেছেন 'The practical end, if it is to be practical goal and standard, must present itself to us as some definite unity, some concrete whole that we can realise in our acts, and carry out in our life.' ব্র্যাডলী দেখা যাচ্ছে একটি 'নির্দিষ্ট ঐক্যের' কথা বলছেন। এই ঐক্যটি একমাত্র জগত বিষয়ে মূল ধারণা থেকেই আসতে পারে যা নীতিশাস্ত্র নিজে থেকে তৈরি করেনা বা করতেও পারে না। একমাত্র পরাবিদ্যা তা নীতি-শাস্ত্রকে জানায়।

আমরা সংজ্ঞাপ্রকরণে সিদ্ধান্ত করেছি যে নীতিশাস্ত্র মূল্যবোধের শাস্ত্র। মূল্যবোধের কারণেই নীতিশাস্ত্র 'যা আছে' তা থেকে যা 'হওয়া উচিত' এই আলোচনায় রূপান্তরিত হয়। উচিতের সূত্রেই নীতির প্রশ্ন আসে। মূল্যের আলোচনা থেকেই আমরা পরাবিদ্যার চর্চায় পৌছাই। কারণ, আমাদের জানতে হয় মূল্য কী এবং জগতে কেনো মূল্যের এতো প্রয়োজন। মূল্যের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মূল্যের আলোচনাতেই মানুষের নিজের কথা ওঠে। বুঝতে চাই কেনো মানুষ শুধুমাত্র যা আছে (অস্তি) তা নিয়ে খুশি নয়, স্বভাবতই অন্যকিছু বা ঔচিত্যে পৌছাতে চায়। ব্র্যাডলীর আলোচনাতেই জানি যে কর্মের সঙ্গে সঙ্কল্পের যোগ এবং সঙ্কল্প সর্বদাই নির্দিষ্ট কিছু চায়। সঙ্কল্প ও কর্মের যোগাযোগে মানুষ ধাপে ধাপে প্রতিটি কর্মের চরিত্র ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল্যকে আবিষ্কার করে এবং জানে সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে তার সংযোগের মূল্যায়ণ কি ভাবে হবে। সে কি কেবল বিজ্ঞানের একটি আপতিক (accidental) ঘটনা যার অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই? না, প্রাণের প্রবাহে, জড় থেকে প্রাণে বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে মানুষের সম্ভাবনাই নিহিত ছিলো? মানুষেই সৃষ্টির মহত্তম প্রকাশ?

ঔচিত্য থেকেই পরাবিদ্যার সূত্রপাত

এবারে একটি প্রশ্ন ওঠে যে মূল্যের সূত্রে আমরা সত্যকে যদি জানতে চাই

তবে পরাবিদ্যা কি নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে নির্ধারণ করে? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে পরাবিদ্যা তার আলোচ্য বিষয় স্থির করে না। প্রতিটি শাস্ত্রেরই নিজস্ব চর্চার বিষয় আছে। ব্র্যাডলী লিখেছেন 'Philosophy in general has not to anticipate the discoveries of the particular sciences nor the evolution of history; the philosophy of religion has not to make a new religion or to teach an old one, but simply to understand the religious consciousness; an aesthetic has not to produce works of fine art, but to theorize the beautiful which it finds; political philosophy has not to play tricks with the state, but to understand it; and ethics has not to make the world moral, but to reduce to theory the morality current in the world.' এই বক্তব্যে ব্র্যাডলী যদিও নীতিশাস্ত্রের কার্যকরী চরিত্রকে কম মূল্য দিচ্ছেন তবু বিভিন্ন শাস্ত্রের নিজস্ব বিষয়ের সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। আমরা জানতে পারি যে পরাবিদ্যা নীতিশাস্ত্রের চর্চাকে বিষয় জোগায় না কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তার তত্ত্বাদির লক্ষ্য, চরিত্র ও মূল্যকে বিশ্লেষণ করে। মূল্যবিচার নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য হওয়ায় মূল্যই পরাবিদ্যার সঙ্গে তাকে সম্পর্কিত করে।

পরাবিদ্যা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় স্থির করে না

অনুশীলনী

১। Define Ethics and explain its relation with Metaphysics and Theology.

২। Define Ethics, indicate its scope and discuss its relation with Psychology.

৩। Explain the relation of Ethics to Psychology and Metaphysics

৪। Give a clear idea of the subject matter of Ethics and discuss the relation of Ethics to Religion.

৫। Discuss the nature of Ethics as the science of conduct. How is it related to Sociology?

৬। Can Ethics be independent of Theology?

৭। Discuss the relation of Ethics with Politics or the relation of morality with Religion.

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ক্রিয়া ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

১। নৈতিক কর্মের চরিত্র (Characteristics of Moral actions)

নীতিশাস্ত্রের বিচার স্বাধীন মানুষের স্বাধীন কর্ম বিষয়ে। সারাজীবনে সমাজবাসী মানুষ অসংখ্য কর্মে লিপ্ত। প্রতিটি কর্মের মূল্য বা চরিত্র এক নয়। প্রতিটি কর্মও আবার ইচ্ছাসঙ্গত নয়। এমন অনেক কর্ম আছে যা আমরা হঠাৎ করে ফেলি, আবেগ আমাদের করতে প্ররোচিত করে। বহু কাজ লজ্জা, ঘৃণা বা ভয়ে করি। কিছু কাজ করি স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে, ভালো মন্দের বিচার করে, আবার কিছু কাজ বিষয়ে আমাদের কোনো বিবেচনা বা ধারণাই থাকে না। করবার পর ফল বিষয়ে সচেতন হই। কাজেই মানুষের সর্ববিধ কর্মকেই নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলা যায় না।

স্বাধীন কর্মকেই আমরা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বলবো। কিন্তু স্বাধীন ভাবেই মানুষ এমন অনেক কাজ করে যাকে নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করলে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের বিরোধ লাগবে। সাধারণ ভাবে নীতিশাস্ত্রের ব্যাপারে আমরা বলছি যে নীতির দ্বারা পরিচালিত হলেই কর্মকে নৈতিক বলবো। যেমন আমি বাড়িতে আগুন লাগাবো ভেবেই পেট্রোলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আগুন জেলে দিলুম। বাড়ীতে আগুন ধরলো। কাজটা নিশ্চয়ই 'নৈতিক' কারণ আমি নীতি অনুসরণ করে এগিয়েছি। এই কাজটিকে নৈতিক বললে নানা সমস্যার সূত্রপাত হবে। কারণ পরের বাড়িতে আগুন লাগানো নামক ঘটনাকে এতোকাল আমরা অনৈতিক বা অন্যায় ভেবে এসেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'নৈতিক' হলেই কাজে ন্যায় জড়িত থাকে না। ন্যায়ের প্রত্যয়টি সম্পূর্ণ পৃথক। নীতিশাস্ত্র সম্মত কর্মের জন্যে প্রয়োজন শুভ-অশুভের বোধ জনিত কর্ম।

দার্শনিক ব্র্যাডলী তাঁর নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে নৈতিক কর্ম বা নীতিশাস্ত্রান্তর্গত কর্ম বিষয়ে চমৎকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সত্যিকারের নৈতিকতার জন্যে প্রয়োজন তিনটি বৈশিষ্ট্য। (১) শুভের ধারণা

(২) **অশুভর ধারণা ও (৩) আত্মসচেতন সঙ্কল্প।** এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমাদের অবহিত থাকতে হয় কারণ ব্র্যাডলীর মতে আমরা যতোক্ষণ না সচেতন ভাবে উপলব্ধি করবো নৈতিক প্রত্যয়গুলি কি, ততোক্ষণ সত্যকারের নৈতিকতা বলতে কিছুই হয় না। আমাদের কর্ম শুভ ও অশুভর ছক মিলিয়েই সম্পন্ন হতে পারে কিন্তু কার্যত পুরোপুরি ভাবে তাদের ভালো বা মন্দ কিছুই বলা চলে না। দ্বিতীয়ত ব্র্যাডলী জানান যে শুভ-অশুভর ধারণা (একটা ছাড়া আর একটাকে জানা অসম্ভব) হয় না যদি না আমরা কোনো একটিকে আমাদের চিন্তায় স্থান দিয়েছি বা আমাদের সঙ্কল্পে উপস্থিত করেছি। কারণ শুভ ও অশুভর ধারণা নিছক বাহ্য ব্যাপার নয়। ব্র্যাডলী লিখেছেন 'Their originals are in the subject, and if he does not know them there first, he will never know them at all. Knowledge of morality is knowledge of specific forms of the will, and just as will can be known only because we know our will, so these forms of will demand personal and immediate knowledge.' আমাদের সঙ্কল্পের মধ্যেই তার স্থান। সুতরাং আমাদের সচেতন ভাবেই তাদের জানতে হবে। আমরা সচেতন ভাবে জানবো যে এটা সৎ, এটা ন্যায় এবং বলবো ওটা অসৎ, ওটা অন্যায়।

ব্র্যাডলীর নির্দেশ :
(ক) শুভ ধারণা
(খ) অশুভ ধারণা
(গ) আত্মসচেতন সঙ্কল্প

সুতরাং কর্মকে আমরা প্রথমে দুভাগ করবো। (১) **নৈতিক** ও (২) **অনৈতিক।** পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্রে নৈতিক কর্মকে আবার দুভাগে ভাগ করতে হয়। একটির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের যোগ আছে, কিন্তু অন্যটির সঙ্গে নেই। নীতি-জড়িত কর্ম যদি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তাকে বলবো (ক) **নৈতিক।** কিন্তু সাধারণ যে কোনো নীতির দ্বারা পরিচালিত হলে বলবো (খ) **নীতি-নির্দিষ্ট।** নৈতিক কর্মের সঙ্গে ব্র্যাডলী কথিত তিনটি বৈশিষ্ট্য জড়িত আর নীতি-নির্দিষ্ট কর্মের ভালো-মন্দ নেই। যদি তারা কখনো ভালো মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে চলে আসে তবে তখন তারা নৈতিক কর্মের বিষয় হয়ে উঠবে। এই সূত্রেই ব্র্যাডলীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনে রাখতে হবে যে **সেই কর্মই নৈতিক কর্ম যা আত্ম-সচেতন সঙ্কল্প** অর্থাৎ যা সচেতন ভাবে আমরা করে থাকি।

কর্ম :
নৈতিক ও নীতিনির্দিষ্ট

২। অচেতন কর্ম (Non-Voluntary actions)

কর্মের প্রসঙ্গে ব্র্যাডলী যখন সচেতনতার কথা তোলেন তখন বোঝা যায় যে মানুষের বিচিত্র কর্মের সবটাই সচেতন, বুদ্ধিবিবেচনাজাত কর্ম নয়। নিছক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও কর্ম বহুবার অচেতন ভাবে চালিত হয়। অচেতন কেনো? মনস্তাত্ত্বিকরা, বিশেষত ফ্রিগমুণ্ড ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে এ-কথা সবাই জানেন মনই কর্মের উৎস। কিন্তু এই মনের বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার অন্ত নেই। ফ্রয়েডের পূর্বপর্যন্ত ভেবে আসা হয়েছে মন সচেতনভাবেই সমস্ত কর্মকে পরিচালিত করে। কিন্তু তিনি দেখালেন যে মনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং জীবনের অধিকাংশ কর্মই সচেতন ভাবে সংঘঠিত হয় না। ভাসমান হিমশিলার যেমন অধিকাংশ জলের তলায় থাকে তেমনি আমাদের কর্মের অধিকাংশটুকু অবচেতন ও অচেতন মনের লীলা। এমনকি সচেতন কর্মও বহুক্ষেত্রে অবচেতনের দ্বারা চালিত সুতরাং সচেতন কর্ম বুঝবার জন্যে আমাদের মনের অন্তর্গূঢ় অচেতন কার্য-কারণকেও জানতে হয়। নীতিশাস্ত্রে জন্য যদিও তাদের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় তবু তাদের বিষয়ে খোঁজ রাখলে সহজেই আমাদের কর্মকে বাছাই করতে সুবিধে হয়।

পণ্ডিতরা এই অচেতন কর্মকে প্রধাণত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া (Spontaneous action), (খ) প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) ও (গ) সাহজিক ক্রিয়া (instinctive action)।

(ক) স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া—বাইরের উদ্দীপনা ব্যতিরেকে আপনা থেকেই যে ক্রিয়া ঘটে তাকে বলা হয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া। যেমন শিশু জন্মের পর থেকেই হাত পা ছুঁড়তে থাকে। অনর্গল শব্দ করে। এই ক্রিয়ার পেছনে তার কোনো সচেতন ভাবনা থাকে না। তার বৃদ্ধির জন্যেই ক্রিয়া ঘটতে থাকে।

(খ) প্রতিবর্তী ক্রিয়া—বাইরের উদ্দীপনা যখন কোনো ক্রিয়ার স্বাভাবিক জন্ম দেয় তখন তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে। যেমন আগুনের শিখার কাছ থেকে আমরা আপনা থেকেই হাত সরিয়ে নিই। চোখের কাছাকাছি কিছু আসবার আগেই আমরা চোখ বন্ধ করি। এই ক্রিয়াগুলির জন্য বাইরের উদ্দীপনার প্রয়োজন। বাইরের উদ্দীপনার ফলে আমাদের মনে একটি বিশেষ সংবেদন উপস্থিত হয় এবং আমরা কিছু বিবেচনা

করবার আগেই ক্রিয়াটি ঘটতে থাকে। এই ক্রিয়াটিও অচেতন কারণ আমরা ভেবে স্থির করবার আগেই ঘটনাটি ঘটে। যেমন আগুনের শিখার কাছ থেকে আমরা হাতটা টেনে নিই। টেনে নেবার পেছনে, নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার বৃত্তি কাজ করে। কিন্তু এই আত্মরক্ষার বৃত্তি আমরা জেনেশুনে, বিচার-বিবেচনায় ব্যবহার করিনা। কোনো না কোনো সময়ে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থেকে শরীর ও মন এমন ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আমাদের অজান্তেই শরীর আত্মরক্ষা করতে প্রবৃত্ত হয়। রুশ বৈজ্ঞানিক পাভলভ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কোনো একটি প্রাণীকে অভ্যাসের দ্বারা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্ম দেওয়া যেতে পারে। তিনি কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। আমরা সবাই দেখেছি যে খাবার সামনে থাকলে লালা ক্ষরণ হয়। পাভলভ একটি কুকুরকে যখন খাবার দিতেন তখন প্রতিবারই একটি ঘণ্টা বাজাতেন। ঘণ্টা ও খাবারের তিনি এমন একটা অনুসঙ্গ তৈরি করেন যে এরপর শুধু মাত্র ঘণ্টা বাজালেই, খাবার ছাড়াই কুকুরটির মুখ দিয়ে লালাক্ষরণ হতো। অর্থাৎ লালাক্ষরণ নামক ক্রিয়াটি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে কুকুরের দৈহিক-মানসিক বোধে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে যতোবার ঘণ্টা ততোবারই লালাক্ষরণ ঘটতে আরম্ভ করেছে।

(ক) **সাহজিক ক্রিয়া**—সাহজিক ক্রিয়ার উৎস আমাদের প্রকৃতি। প্রকৃতিতে প্রাণীরা এমনভাবে নির্দিষ্ট যে তাদের কিছু কিছু বৃত্তি প্রকাশ পাবেই পাবে। মৌমাছি মৌচাক বানায়, পিঁপড়েরা অত্যাশ্চর্য সমাজ-সংগঠন করে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। যেহেতু মৌমাছিরা বা পিঁপড়েরা জানেনা কেনো তারা যথানির্দিষ্ট ভাবে চিরকাল মৌচাক বানাবেই বানাবে এবং সুন্দর করে বানাবে। পিঁপড়েরাও জানে না কেনো তারা ঠিক একই রকম সমাজ সংগঠন গড়ে যাচ্ছে অনাদিকাল ধরে কিন্তু অন্যরকম বানাচ্ছে না। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বংশ বিস্তারের বাসনা ইত্যাদি। যতোই শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও বিবেচক মানুষ হোক না কেনো, ক্ষিধে পেলে তাকে চঞ্চল হতেই হবে। দিনের পর দিন খেতে না-পেলে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন মানুষ এক আস্তাকুঁড় থেকেও খাবার সংগ্রহ করবে।

এই ক্রিয়াটি ও অচেতন ক্রিয়া। কারণ এই ক্রিয়ার ওপর সচেতনতার বিশেষ কোন হাত নেই। প্রকৃতি বাধ্য করবেই করবে, প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার

কোনো সামর্থ্য মানুষের বা প্রাণীর নেই। মানুষ কেবলমাত্র এই সাহজিক ক্রিয়াগুলোকে একটু অন্য ধরণের রূপ দিতে পারে মাত্র। কিন্তু তার এই কৃতিত্বের পেছনে প্রকৃতির পূর্ব-স্বীকৃতি থাকে।

এই তিনটি প্রধান অচেতন ক্রিয়ার সঙ্গে আরো দুটি ক্রিয়ার উল্লেখ করা যায়। তাদের আমরা বলি **অনুকৃতি** (imitative action) ও **অনুষঙ্গজাত** (Ideo-moter actions) ক্রিয়া।

অনুকৃতি যে অত্যন্ত মূল্যবান এ-বিষয়ে ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ টার্ডে ও লির্বঁ নানা ধরণের আলোচনা করে দেখিয়েছেন। ট্রটার তার নাম দিয়েছেন যূথবৃত্তি (herd instinct)। টার্ডে ও লির্বঁর মতে সমাজের একটি ধার শক্তিই হলো অনুকৃতি। কিছু কিছু অনুকৃতি আপনা থেকেই ঘটতে থাকে, যেমন শিশুর ব্যবহার। সে না-জেনে, না-ভেবেই তা করে। আর কিছু অনুকৃতি মানুষ সচেতন ভাবেই করে।

অনুষঙ্গজাত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মানুষ আমাদের বিশেষ ক্রিয়ায় মাতিয়ে তোলে। ভিড়ের মধ্যে যেমন এমন একটা জোয়ালো অনুষঙ্গ কাজ করে যে আমরা সচেতনতা সত্ত্বেও অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মাতি। গানের আসরে যেমন আপনা থেকেই প্রায় অনেকে তাল দিয়ে মাথা দোলায়।

৩। আত্মসচেতন কর্ম (Self conscious or Voluntary action)

যে কর্মের পেছনে সচেতন মন কাজ করে তাকেই আমরা আত্মসচেতন কর্ম বলি। আত্মসচেতনতার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্য সাধনের জন্যই, উচিত অনুচিত, ভালোমন্দ বিচার করে এই কর্মে নামা হয়। অর্থাৎ সচেতন কর্মের দায়িত্ব কর্তার, যেহেতু সে জ্ঞাতসারেই কর্মে পা বাড়িয়েছে। আত্মসচেতনায় বাছাইয়ের প্রশ্ন থাকে। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে বাছাই করেই নিজের উদ্দেশ্যের কথা ভাবা হয়। এই ভাবনার সঙ্গে দুটি প্রত্যয় জড়িত। প্রথমত, **আমি জানি যে আমার বাছাইয়ের স্বাধীনতা আছে**; দ্বিতীয়ত, **বাছাই অনুযায়ী আমার কর্মটি করবার স্বাধীনতা আছে।** দার্শনিক ব্র্যাডলীর ভাষায় স্বাধীনভাবে কাজ করবার এই ইচ্ছাকে বলতে পারি 'uncaused cause'। অর্থাৎ আমি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমার কর্মের ক্ষেত্রে আমিই প্রধান। এই কর্মে আমি কি হবো, কি করবো সবই অন্য

সচেতন কর্ম : বাছাই

সবার কাছে অজ্ঞাত অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত। আমার যা-কিছু হবার বা করবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাটাই স্বাধীনতা। ব্র্যাডলী চমৎকার লিখেছেন 'Freedom means **chance**; you are free, because there is no reason which will account for you particular acts, because no one in the world, not even yourself; can possibly say, what you will, or will not, do next. You are 'accountable', in short, because you are wholly 'unaccountable' creature; এই যে 'unaccountability'—যা আগে থেকেই জানানো যায় না—আছে বলেই সচেতন কর্মের এতো মূল্য এবং সচেতন কর্মকে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

সচেতন কর্মের তিনটি স্তরের কথা বলা হয়। শারীরিক, মানসিক ও জাগতিক। সচেতন কর্মে শারীরিক স্তরটি প্রাথমিক। অচেতন কর্মেও তাই। কারণ প্রাণ যেহেতু দেহকে ঘিরেই, দেহকে বাদ দিয়ে কোনো কর্মেরই প্রসঙ্গ ওঠে না। নৈতিক কর্মের ফলাফল দেহ যেমন তৈরি করে তেমনি ভোগও করে। কাজেই শরীরকে আলোচনায় রাখতেই হবে। মানসিক স্তরে কর্মের প্রয়োজন বোধের কথা। মনেই কর্মের জন্ম। মন কর্মটির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। জাগতিক স্তর সর্বদাই আমার কর্মের সঙ্গে জড়িত। কারণ আমার কর্ম কোনো-না-কোনো রকমে জগতকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন ধরা যাক, আমার হঠাৎ কৃষ্ণনগরের সরভাজা খেতে ইচ্ছে হয়েছে। মনে এই ইচ্ছের জন্ম তখনকার অভাববোধ থেকে, যেহেতু, অনেকদিন আমি সরভাজা খাইনি। শারীরিক পরিতৃপ্তি ও মানসিক শান্তির জন্য সরভাজা জোগাড় করতে হবে। সুতরাং শরীরকে পরিশ্রমটুকু নিতেই হবে। আমার সরভাজা কেনার ফলস্বরূপ বিক্রেতার লাভ হচ্ছে সুতরাং জগতের আরো অনেকে আমার ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে।

তিনটি স্তর: শারীরিক মানসিক ও জাগতিক

(ক) **মানসিক স্তর**—সচেতন কর্মের মানসিক স্তরে ইচ্ছার জন্ম ও মৃত্যু। প্রতিটি সচেতন কর্মের পেছনে কর্মের উৎস থাকে। উদ্দেশ্যহীন কর্ম বলে পৃথিবীতে কিছু সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে এই উৎসটিকে নাম দেওয়া হচ্ছে অভাব বোধ। এই অভাব বোধটি যে সবসময়েই সঙ্গত তা নয়। অভাব বোধটি সমস্ত সময়ে যে বাস্তব হবে তা-ও নয়। সম্পূর্ণ কাল্পনিক অভাব বোধ

থেকেও মানুষ অনেক কাজ করে। কিন্তু অভাব বোধ সঙ্গত না-হোক, বাস্তব না-হোক, তা সম্পূর্ণ কাল্পনিকই হোক—অভাব ব্যতীত কোনো কর্মের কোনো প্রেরণাই মানুষের নেই।

অভাব বোধ থেকে তৈরি হয় অভাব মেটাবার কল্পনা, যা-পেলে অভাব বোধটির নিরসন হবে। সুতরাং প্রত্যেক অভাব বোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

অভাব বোধ থেকে মনে কামনার (desire) উদয় হয়। কামনাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটে উপাদান পাই। প্রথম উপাদান জ্ঞানাত্মক (cognitive)। কামনার সঙ্গে সচেতনতার যোগ ঘনিষ্ঠ কারণ জেনে শুনেই কামনা গড়েছি। কী আমি চাই তা জানা নেই এমন কামনা কথনো সম্ভব নয়। লক্ষিত বস্তুটি সব ক্ষেত্রেই জ্ঞানের গোচরে থাকে। কামনার দ্বিতীয় উপাদান অনুভূতিমূলক (conative)। কামনার বস্তুটি না-থাকায় মনের অস্বস্তি। অস্বস্তিতে পাবার সম্ভাবনায় যেমন ভবিষ্যত আনন্দের সূত্র থাকে তেমনি না-পাবার ভয়ও থাকে। সুতরাং অনুভূতির টান দুই দিকে। তৃতীয় উপাদানকে বেদনাত্মক (Affective) বলা যায়। মনের আকুলতায় এই মনোভাবের প্রকাশ।

কামনার প্রথম উপাদানটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য (Motive)। কামনার সঙ্গে কাম্য বস্তুর যোগ খুব ঘনিষ্ঠ এবং কামনার উদ্দেশ্য লক্ষ্য সাধন করা। সুতরাং কামনার উদ্দেশ্যটি সচেতন এবং প্রত্যক্ষ।

কামনার সঙ্গেই কিন্তু অন্যান্য ভাবাবেগ, বিবেচনা মনকে আচ্ছন্ন করে। যা চাই তা নিঃসন্দেহেই চাই কিন্তু মন সে-বিষয়েই নানা প্রশ্ন তোলে। তার সাধ্য ও সাধের মধ্যে নানা সমস্যাকে নির্দেশ দেয়। সত্যিই চাওয়া উচিত কিনা, কামনার লক্ষ্যটি পেলে সমস্যা দেখা দেবে কিনা বিষয়ে মন এতো উল্টো প্রসঙ্গ তোলে যে বোঝা যায় কোনো কামনাই সরাসরি নিরঙ্কুশ বাধাহীন ভাবে চলে না। রবীন্দ্রনাথের দুটি পঙ্‌ক্তিতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

অর্থাৎ আমাদের কামনার মধ্যে নানা উত্থান-পতন, বাদবিতণ্ডার টানাপোড়েন চলে। বাসনার সঙ্গে সঙ্গেই বাসনা-বিরোধও উপস্থিত হয়। দার্শনিক হেগেল যেমন জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া বিষয়ে তিনটি বিখ্যাত নীতির উল্লেখ করেছেন। কোনো

বিষয়ে জ্ঞানের সূত্রপাতেই থাকে একটি স্থিতবক্তব্য (thesis)। এই স্থিতবক্তব্যকে মন অবিলম্বেই সন্দেহ করতে থাকে। প্রস্তুত হয় একটি বিরোধী অবস্থা। পূর্ববর্তী 'হাঁ' এবার 'না'-এ পরিণত হয়। হেগেল এই অবস্থার নাম দিয়েছেন বিরোধ (antithesis)। কামনা জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া হিসেবে হেগেলের এই প্রত্যয়টির অঙ্গীভূত অর্থাৎ কামনার 'হাঁ' ধর্মী অবস্থাটি অবিলম্বে 'না' ধর্মী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। কামনার এই স্ব-বিরোধ, মনে রাখতে হবে, বাইরের ঘটনা নয়, সম্পূর্ণই মনের। মনই কামনা গড়ছে, এবং মনই কামনাটি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত করছে।

কামনার স্ববিরোধ কর্মে প্রকাশিত হতে চায়। উভবলী টানের কর্ম বিভিন্ন। হাঁ-ধর্মী কর্ম একদিকে ও না-ধর্মী কর্ম আর এক দিকে যেতে চায়। কিন্তু মানুষ যেহেতু প্রতিমুহূর্তেই নির্দিষ্টতায় সীমাবদ্ধ, সে একই সঙ্গে সমস্ত কর্ম বা বিরোধী কর্ম করতে পারে না। সুতরাং গ্রহণ বর্জন চলে। গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়ার প্রধান কথা বাছাইয়ের। বাছাই করতে হয় নিজের সামগ্রিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে। সুতরাং কামনা পরিপূর্ণ করবার প্রক্রিয়াটিতে সমস্ত অবস্থাতেই বিবেচনা করে বাছাই করতে হয়। বাছাইয়ের সঙ্গেই বিবেচনা চলে বা বলা যায় বিবেচনা মঙ্গলের আদর্শে পরিচালিত হয়ে বাছাইকে নির্দিষ্ট করে।

হাঁ-ধর্মী কর্ম ও না-ধর্মী কর্ম

বিবেচনা (Deliberation)-র প্রসঙ্গটি সমস্ত ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হয়। কারণ কামনায় কাম্য বস্তু সম্পর্কে অবহিত হলেই চলে না, কামনা চরিতার্থ করবার পদ্ধতিও জানা দরকার। নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে শুধু উদ্দেশ্য ও উপায়ই জড়িত নয়। তাদের সম্ভাব্য ফলাফলকেও বিচার করতে হয়। সুতরাং বিবেচনার প্রধানতই দুটো ভাগ ! একটা, **উপায়-চিন্তা** ও অন্যটা **পরিণাম-চিন্তা**।

সচেতন কর্মের মানসিক স্তরটিকে একটি শৃঙ্খলে সাজালে তাই দেখতে পাই যে একটি থেকে আর একটি অবস্থা কেমন করে তৈরি হচ্ছে। (ক) কামনা, (খ) কামনার সংঘাত বা স্ববিরোধী কামনা, (গ) বাছাইয়ের বিবেচনা, (ঘ) উপায় চিন্তা ও পরিণাম চিন্তা, (ঙ) পরিণাম চিন্তার ফলস্বরূপ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, (চ) উপায় চিন্তার ফলস্বরূপ উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট ভাবে পরিচালনার অভিপ্রায়।

অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা (Want, Appetite and Desire)— অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি প্রকৃতিতে তিন স্তরের প্রাণীকে লক্ষ্য করে তাদের মানসিকতা

ও কর্মের প্রেরণাকে তিনটি নাম দিয়েছেন। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অভাব, নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে আকাঙ্খা ও মানুষের ক্ষেত্রে কামনা। এই তিনটি শব্দ যদিও মানুষের জীবনে বহু প্রচলিত অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাদের ওপর বিশেষ অর্থ আরোপ করতে চাচ্ছেন। উদ্ভিদের ওপর যেমন প্রকৃতির প্রভাব বিদ্যমান, তেমনি প্রকৃতি উপস্থিত প্রাণীদের জগতেও। কিন্তু প্রাণের উদ্বর্তনে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। রূপভেদে কর্ম ও কর্মের চরিত্র অনেক বদলে গেছে। উদ্ভিদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ জড়ের নয়, তাতেও প্রাণ বিদ্যমান। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দেখিয়েছেন উদ্ভিদও বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় অর্থাৎ তারও চৈতন্যের ক্রিয়া চলছে। তবু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণতই আমরা স্থানুতা আরোপ করি। তাদের অভাব বোধ আছে, যেমন সূর্যের আলোর দিকে তাদের স্বাভাবিক গতি অর্থাৎ আলোর প্রয়োজনে তারাও আলোকে খুঁজছে কিন্তু এই অভাব বোধ সম্ভবত চেতনার স্তরে আসেনি অর্থাৎ বিবেচনা ও বাছাইয়ের স্তরে আসেনি। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সচেতনতা আছে। তাদের কর্মের পেছনে বিচার, বিবেচনা থাকে। কিন্তু তাদের বিবেচনার স্তর সীমাবদ্ধ। তারা সাধারণতই প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ বাছাইয়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। তাদের ক্ষেত্রে প্রধানতই সাহজিক ও প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মানুষ শুধু সচেতনই নয়, সে আত্মসচেতন। অর্থাৎ তার বাছাইয়ের ক্ষেত্র যেমন আছে তেমনি তার বাছাইয়ে সামগ্রিক ভালো-মন্দের বোধ ও বিবেচনা কাজ করে। ম্যাকেঞ্জির ভাষায় তাই 'desire implies a definite point or view, whereas there is no such implications in a mere appetite'।

দার্শনিক ব্র্যাডলী কামনার আলোচনা প্রসঙ্গে জানান যে সাধারণ ভাবে কামনাকে আকাঙ্ক্ষা বলা যায়। কিন্তু সামনে আকাঙ্ক্ষা হলো তার সম্পর্কে অভাববোধ। আকাঙ্ক্ষা জাগাবার জন্যে বস্তুর সঙ্গে সুখবোধ জড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই (কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী মনস্তাত্ত্বিকরা ভুল করে তা জড়ান)। বস্তুটিই এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তা থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কি ফল হবে বা হবেনা সে বিষয়ে কোনো ধারণাই দরকার করে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ব্র্যাডলী জানায় যে আকাঙ্ক্ষা আর নীচুস্তরে থাকে না, বদলে উঁচুস্তরে চলে আসে, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'কাম' (lust)। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনায় কাম হলো একটা আদর্শ অবস্থা (ideal)। অর্থাৎ ব্র্যাডলী বোঝাতে চাচ্ছেন আমাদের কামনা আর নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংবেদন দ্বারা চালিত নয়, এবার বস্তুর ধারণাটাই

কাজ করছে। এই ধারণাটার উল্লেখ এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে আকাঙ্ক্ষা মেটার পরেই আমরা ভুলে যাই কিন্তু কাম থেকে স্থায়ী কল্পনার জন্ম হয়।

৪। কামনা, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প (Desire, Wish and Will)

কামনার আলোচনায় আমরা দেখছি কামনার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতা জড়িত। এবারে প্রশ্ন ওঠে যে আত্মসচেতনতাকে বুঝবো কেমন করে? আত্মসচেতনতার এক অংশে আছে, আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে, প্রকৃতির প্রতিবর্তী ও সাহজিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধতা। অর্থাৎ প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়ার নির্দেশ না-মেনে নিজস্বতার ছাপ ফেললেই কর্মকে আত্মসচেতন বলা যায়। তবু 'আত্ম' শব্দের সাধারণ অর্থ স্পষ্ট না হলে আত্ম-সচেতনতার তাৎপর্য স্পষ্ট হয় না এবং কামনার স্বরূপ ও সঠিক ধরা যায় না। কামনার প্রসঙ্গ নির্দেশে জানানো হয়েছে কামনায় একটা দেখবার বিশেষ ভঙ্গি থাকে (point of view)। দেখবার এই ভঙ্গির ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার দেখবার ভঙ্গি হয় ব্যক্তি বিশেষের। সবাই এক রকমে দেখেনা বা ভাবে না। ইংরেজ দার্শনিক ও শিল্পরসিক জন রাস্কিন তাই বলেন যে কামনা নির্ভর করে ব্যক্তিটির স্বভাবের ওপর। তার স্বভাবেই আবার তার চরিত্রের প্রকাশ। সুতরাং কামনায় স্বভাব ও চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়। সাধারণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষের তফাৎ খুব সামান্য, পার্থক্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে কারণ কর্মেই কামনার কার্যকরী রূপ ফোটে। কর্মের মধ্যেই চরিত্র পরিস্ফুট হয়। সুতরাং বলা চলে যে কামনার সঙ্গে ব্যক্তির সমগ্র চরিত্রের যোগাযোগ। চরিত্রটি জানা গেলেই কামনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। উদাহরণত যেমন, একটি লোক চুরি করেছে। তার চুরির কর্মটি তখনই সঠিক বোঝা যাবে যখন আমরা জানতে পারবো সত্যি সত্যিই চুরি করা তার স্বভাব কিনা, চোরের চরিত্র তার চরিত্র কিনা। কোন সৎ লোক হঠাৎ চুরি করতে পারেন। ওই একটি কর্ম দেখেই তার বিষয়ে রায় দিলে চোরই বলতে হবে অথচ তিনি তার স্বভাবের সমগ্রতায় নিশ্চয়ই হয়তো চোর নন। যেহেতু তিনি সাধারণতই চুরি করেন না। ডস্টএভস্কির 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট' উপন্যাসে রাসকলনিকফ খুন করেছিলো। কিন্তু এই একটি খুন দিয়ে তাকে কেবলমাত্র খুনীই বলা হবে কিনা প্রশ্নে আমরা তার সমগ্র চরিত্র বিষয়ে জানতে চাইবো।

কামনা আত্মসচেতন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে জড়িত

তার স্বভাবটি জানা গেলেই তার বিষয়ে মনস্থির করা সম্ভব। মনস্থির করবার জন্যেই ডস্টএভস্কি দীর্ঘ উপন্যাসখানা লেখেন। দেখান যে সত্যিই সে খুনী নয়।

ব্যক্তির চরিত্রকে একটি জগতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কামনা এই জগতের সঙ্গে জড়িয়েই অর্থবান হয়। এই জগতটিই ব্যক্তির চরিত্র। কামনায় যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, বিরোধ জন্মায় তখন বুঝতে হবে ব্যক্তির চরিত্রের জগতে গোলোযোগ ঘটেছে। অর্থাৎ চরিত্রে নানা টান দেখা দিয়েছে, ব্যক্তি আর নির্দিষ্ট স্বরূপে স্থিত নয়। সে চঞ্চল হয়েছে, সুতরাং তার কামনা ও কর্মে এই চঞ্চলতা প্রকাশ পাবেই পাবে। অধ্যাপক ডিউঈ তাই লেখেন 'It is important to notice that it is a strife or conflict which gos on in the man himself; **it is a conflict of himself with himself'**—নিজের সঙ্গেই নিজের সংগ্রাম কারণ ব্যক্তির চরিত্র তখন ভারসাম্য হারিয়ে নানা দিকে ঝুঁকতে চাচ্ছে। ডিউঈ ঘটনাটিকে আরো ব্যাখ্যা করে লেখেন 'it is not a conflict of himself with something external to him, nor of one impulse with another impulse, he meanwhile remaining a passive spectator awaiting the conclusion of the struggle'। আসলে লড়াইটা সাময়িক অস্থায়ী কোনো আবেগের দ্বন্দ্ব নয় যে আবেগ প্রশমিত হলে মানুষটি যেমন ছিলো তেমনিই থাকবে। দ্বন্দ্ব এমনকি বাইরেরও কার্য-কারণ নয়। দ্বন্দ্ব নিজের সঙ্গে নিজের। কারণ, চরিত্র একটি স্থায়ী ব্যাপার। কিন্তু তাতে মৌলিক কোনো সংক্ষোভ উপস্থিত হলে চরিত্রের মোড় ফিরবার সম্ভাবনা থাকে। তখন আর সাধারণ ঘটনার মতো ভাবা যায় না যে ঘটনা শেষ হলে প্রভাবটিও নিঃশেষে মুছে যাবে। কামনার দ্বন্দ্ব তাই চরিত্রের নির্দেশক এবং কামনার দ্বন্দ্বেই চরিত্রের মূল ঝোঁক প্রকাশ পায়। দার্শনিক হেগেল তাই বলেছিলেন 'আমি যোদ্ধাদের একজন মাত্র নই, আমি প্রতিপক্ষের দুজনাই, সংঘর্ষটিও আমি।' ব্যক্তি নিজেই নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং সংগ্রামটি তার চরিত্র নিয়েই। গীতায় অর্জুনবিষাদ যোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তুমি তোমার স্বভাবকে প্রকাশ করো। স্বজন বান্ধব দেখে হঠাৎ বৈরাগ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে পালাতে পারো কিন্তু যেখানেই তুমি যাও সেখানেই তোমার যোদ্ধা-স্বভাবের পরিচয় তুমি দেবেই দেবে।

কর্মের সঙ্গে একটি জগত জড়িত

কামনা প্রসঙ্গে এইসব কথা আলোচনায় ওঠে কারণ স্বাধীন মানুষের স্বাধীন কর্মই নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য। স্বাধীন মানুষটি এবং তার কর্মের বিশ্লেষণ তাই এতো প্রয়োজনীয়।

অনেক সময় সাধারণ ভাবে আমরা **কামনা ও ইচ্ছাকে** একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু কামনা ও ইচ্ছেতে সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। কামনার স্তর ছাড়িয়ে ইচ্ছে কিছুটা কার্যকরী রূপ নিয়েছে। কোনো কামনা যখন নির্দিষ্ট কর্মের রূপ নেয় তখন তাকে ইচ্ছে বলা চলে। ধরা যাক আমার কোনো জিনিসের ওপর ভীষণ লোভ হয়েছে। কিন্তু আমি সেই লোভটাকে কার্যকরী ক্ষেত্রে দমিয়ে রেখেছি। এই অবস্থায় আমার কামনা মরেনি কিন্তু বলা হবে আমার ওই জিনিসটির প্রতি আর ইচ্ছে নেই। মনস্তাত্ত্বিকরা অবশ্য ইচ্ছার অবদমিত লুপ্ত চরিত্র বিষয়ে প্রচুর কথা বলেন। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে তাদের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। কামনা ও ইচ্ছেতে যেমন তফাৎ করা হচ্ছে তেমনি পার্থক্য আছে **ইচ্ছা** ও **সঙ্কল্পে**।

সঙ্কল্প তাকেই বলি যে ইচ্ছেটা সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আমরা শুধুমাত্র মনে মনে শ্রেয় বলে বাছাই করিনি, তাকে সফল করবার জন্যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকি। সঙ্কল্পের যোগ সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে করা হচ্ছে কারণ সঙ্কল্প অস্পষ্ট ধোঁয়াটে মনোভাব থেকে শ্রেয় বিবেচনায় নির্দিষ্ট স্পষ্ট রূপ নিতে চাচ্ছে। রূপ দেবার প্রয়াসে সমস্ত বিপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই জীবনের প্রকাশ। এই বক্তব্যে তিনি জীবনের সঙ্কল্পের চরিত্রকে বোঝাতে চাচ্ছেন কারণ সঙ্কল্পের মধ্যেই চরিত্র সচেতন ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা ভাবে।

সঙ্কল্প

সঙ্কল্প থেকে আসে **কর্ম**। সঙ্কল্প ও কর্মে তফাৎ আছে। সঙ্কল্প কর্মের পূর্ববর্তী অবস্থা সুতরাং সঙ্কল্পের সঙ্গে যোগ ভবিষ্যতের। কাজেই সঙ্কল্প ও কর্মে সময়ের ফারাক থাকতে বাধ্য। সময়ের ব্যবধানের জন্যই অনেক সময় সঙ্কল্প আর কখনো কর্মে পরিণত হয় না। রামায়ণের বিখ্যাত গল্পে তাই পাচ্ছি যে রাবণ রামকে কাজ ফেলে রাখতে মানা করে গিয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানের জন্যই আমরা বলি যে 'লোকটির সঙ্কল্পের জোর আছে। অর্থাৎ সে সঙ্কল্পকে কার্যকরী রূপ দিয়েছে। বাক্যের 'জোর' শব্দটিই শুধু সঙ্কল্প ও কর্মের তফাৎটা স্পষ্ট করছে।

কর্ম

সঙ্কল্প ও কর্মের সঙ্গে উদ্দেশ্য জড়িত। কোনো লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িয়ে যখন সঙ্কল্প স্থির হয় তখন তাকে বলে উদ্দেশ্য (purpose)। উদ্দেশ্যের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও ইচ্ছের অনেক তফাৎ। কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্যে এদের যে-কোনো একটিই যথেষ্ট কিন্তু তা-ই উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বিচার বিবেচনার ফল যা চরিত্রকে নির্দিষ্টতা দেয়।

উদ্দেশ্য

সঙ্কল্পের সঙ্গে চরিত্রের সংযোগ আর চরিত্র থেকেই তৈরি হয় কর্মের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম কখনোই সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হতে পারে না। দার্শনিক ব্র্যাডলী লিখেছেন 'To act you must will something, and something definite To will in general is impossible, and to will in particular is never to will nothing but a form'। ব্র্যাডলীর মতে অস্পষ্ট এলোমেলো যে কোনো ইচ্ছাই যেমন সঙ্কল্প নয় তেমনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সঙ্কল্প শব্দটি অর্থহীন।

৫। লক্ষ্য ও অভিপ্রায় (Motive and Intention)

কর্মের সূত্রে লক্ষ্য (motive) ও অভিপ্রায় (intention) নামক প্রত্যয় দুটি ওঠে। কর্মের পেছনে এই প্রত্যয় দুটির অনুপ্রেরণা থাকে। সুতরাং এই প্রত্যয় দুটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন।

লক্ষ্য বিষয়ে বলা যায় যা আমাদের কর্মে চালিত করে। কিন্তু শুধুমাত্র কর্মে চালিত করে বললে নানা গোলোযোগ দেখা যায় যেমন আমরা জানি আবেগ থেকেও আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই। সে ক্ষেত্রে আবেগ ও লক্ষ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সুতরাং আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যা আমাদের কর্মের একটি বিশেষ দিকে চালিত করে তাই লক্ষ্য। 'চালিত' করার ক্ষেত্রেও সার্থকতা আছে। স্নায়ুর দ্বারাও আমরা কর্মে চালিত হই, কোনো নির্দিষ্ট কল্পনা সাধনের জন্যেও কাজে নামি। সুতরাং লক্ষ্যর দুটি অর্থ সম্ভব ; (ক) যা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে ও (খ) যা বিশেষ ধরণের কর্মে প্রবৃত্ত করে।

লক্ষ্যের দুটি অর্থ : (ক) সকর্মে প্রবৃত্ত করে, (খ) বিশেষ ধরনের কর্মে নামায়

আমরা আবেগ ইত্যাদির দ্বারা চালিত কর্মকে নীতিশাস্ত্রের বিষয় মনে করিনা সুতরাং দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রাহ্য। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ভাষায় পাওয়া যায় 'Moral activity or conduct is purposeful action ; and action with a purpose is not simply moved by feeling ; it is moved rather by the thought of some end to be attained'। এই অর্থেই

এরিস্টটল লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে লক্ষ্যের সঙ্গে বিশেষ ধরণের বোধ জড়িত। অধ্যাপক রীচি অন্য কথা বলেন। ওঁর মতে 'কামনা হলো একটি পরজাতি (genus), আর লক্ষ্য তার উপজাতি (species)। তার অবচ্ছেদক (differentia) হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যের ধারণার উপস্থিতি।' কিন্তু এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রত্যেক কামনাতেই উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। তা বিশেষ করে লক্ষ্যের এমন কিছু চরিত্র নয় যে একমাত্র সেটাই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট বলবো।

দার্শনিক গ্রীন লেখেন, লক্ষ্য হলো তা ই যা আত্মসচেতন ব্যক্তি নিজের কাছে তুলে ধরেছে। 'Motive is an idea of an end which a self conscious subject presents to itself and which it strives and tends to realize'। অধ্যাপক ডিউঈ-ও হুবহু একই কথা বলেন যে নির্বাচিত কামনাটিই লক্ষ্য। অনেকে আবার সিদ্ধিকেই লক্ষ্য বলেন যেমন অধ্যাপক মুরহেড।

কামনার আলোচনা অনুযায়ী আমরা ঘোষণা করতে পারি যে লক্ষ্যের তিনটি চরিত্র। প্রথমত, অভাব বোধ; দ্বিতীয়ত' উপলক্ষ্যের বিষয়ে ধারণা ও তৃতীয়ত, তা লাভ করবার বাসনা।

অভিপ্রায় শব্দটির অর্থ প্রায় উদ্দেশ্য। বহু ক্ষেত্রেই শব্দ দুটি সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করবার জন্যে বলা যায় যে অভিপ্রায় দু ধরণের। (ক) অব্যবহিত (immediate) ও দূরবর্তী (remote)। মিলের একটি উদাহরণ এ-প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যায়। ধরা যাক ক জলে ডুবছে, খ ও গ তা দেখতে পেয়ে তাকে তুলবে স্থির করলো। খ বিবেচনা করলো ক-র প্রাণরক্ষা করবার জন্যেই সে তাকে উদ্ধার করবে আর গ ভাবলো ক কে ফাঁসী দেবার জন্যেই এখন প্রাণটা বাঁচানো উচিত। অব্যবহিত অভিপ্রায় দুজনারই এক, ক র প্রাণরক্ষা করা। কিন্তু দূরবর্তী অভিপ্রায়টি ভিন্ন। অনেকে দূরবর্তী অভিপ্রায়কে লক্ষ্য (motive) বলতে চান। কিন্তু প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত নয়।

(খ) কর্মের অভিপ্রায়কে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, অন্তস্থ (inner) ও বাহ্য (outer)। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি এ-প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কনের বিখ্যাত একটি গল্পের উদাহরণ দিয়েছেন। লিঙ্কন গর্ত থেকে একটা শুয়োরকে তুলেছিলেন। তোলার অভিপ্রায় হিসেবে তিনি জানান যে শুয়োরটার জন্যে তিনি শুয়োরটাকে তোলেন নি, তুলেছেন শুয়োরটার বিষয়ে নিজের মনের অস্বস্তি

দূর করবার জন্যে। এখানে বাহ্য অভিপ্রায় শুয়োরটিকে বাঁচানো কিন্তু অন্তস্থ অভিপ্রায় নিজের মানসিক অশান্তি দূর করা। অনেকে এই অন্তস্থ অভিপ্রায়কে লক্ষ্য মনে করেন।

(গ) তৃতীয় বিভাগে আমরা বলি **প্রত্যক্ষ** (direct) ও **পরোক্ষ** (indirect) অভিপ্রায়। সন্ত্রাসবাদীরা ইংরেজ পুরুষকে মারবার জন্যে সভায় বোমা ছুঁড়েছে। প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়টি শুধু তাকেই মারা কিন্তু পরোক্ষত আরো অনেকের মৃত্যুও এসে যাচ্ছে।

(ঘ) চতুর্থ বিভাগে **সচেতন** (conscious) ও **অচেতন** (unconscious) অভিপ্রায় থাকছে। অচেতন অভিপ্রায় বলতে নীতিশাস্ত্রে বোঝা যায় যখন কর্তা স্পষ্ট তার অভিপ্রায় ঘোষণা করে না। অনেক সময় বাইরে থেকে সৎকাজ দেখে মনে হয় লোকটি বুঝি নিছক মানব প্রেমের জন্যে করছে কিন্তু কার্যত সে হয়তো নিজের সুনামের জন্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সচেতনভাবে কর্তা যখন উদ্দেশ্য বাছাই করে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পদ্ধতি বিষয়েও অবহিত থাকে তখনই অভিপ্রায়ের সূত্রপাত। অভিপ্রায়ে তাই কেবলমাত্র মানসিক কামনাটই উপস্থিত নেই, কামনা চরিতার্থ করবার উপকরণ বিষয়েও জ্ঞান আছে।

লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের সম্পর্ক বিষয়ে প্রধান কথা হচ্ছে অভিপ্রায় বৃহত্তর ব্যাপ্তির কিন্তু লক্ষ্য ব্যাপ্তিতে সংকীর্ণ। কারণ, লক্ষ্যে কেবলমাত্র কামনা থাকে, কামনা সিদ্ধির উপকরণ পদ্ধতি বিষয়ে কোনো বোধ থাকে না। লক্ষ্য কখনই অভিপ্রায়ের পুরো বিস্তার পায় না। অধ্যাপক ডিউঈ এ বিষয়ে ভুল করে লিখেছেন যে "the foreseen, the **ideal** consequences are the end of the act, and as such form the motive'। ওঁর বক্তব্যে লক্ষ্যতেও অভিপ্রায়ের ব্যাপ্তি এসে গেছে যেহেতু আদর্শ ফলাফলের বিষয়ে সমস্ত ধারণাই লক্ষ্যের আছে।

এ বিষয়ে শেক্সপীঅরের একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ব্রুটাস দেশের মঙ্গলের জন্য সীজারের হত্যা চেয়েছিলেন। সুতরাং ব্রুটাসের অভিপ্রায়ে সীজারের হত্যার কথা উপস্থিত। কিন্তু সীজারের হত্যা তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ তাঁর লক্ষ্যে দেশের মঙ্গলটাই শুধু বিবেচিত হয়েছিলো।

অনুশীলনী

১। Explain the distinguishing characterstics of moral actions as compared with non-moral action.

২। Indicate the various stages in the development of Voluntary Action and discuss what particular elements in it should determine its moral quality.

৩। How would you distinguish between Motive and Intention? Is the moral judgment concerned with Motive or with Intention?

৪। Distinguish between moral actions. Which of these actions constitute the subject matter of Ethics and why?

৫। Define desire and point out its characteristics.

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক বিচার

১। নৈতিক বিচারের চরিত্র (Nature of the Moral Judgment)

দর্শনে আমরা দু রকম বিচারের কথা জানি। একটিকে বলে তথ্যমূলক বিচার (Judgment of fact) ও (খ) মূল্যবিচার (Judgment of value)। তথ্যমূলক বিচার আলোচ্য। তথ্যমূলক বিচারে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। সম্পর্ক নির্দেশের পদ্ধতিকে বলা যায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে তথ্যকে স্বীকার করে আমরা অগ্রসর হই। বলা যায় এই বিচারে তথ্যের উপস্থিতি (অস্তি) ই আমাদের বিচারের বিষয়। দুই বা বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা হয় বাইরের পরিচয় থেকে যে-পরিচয় সংখ্যানুপাতিক হিসাবে স্থির করা যায়। যেমন আমরা বললাম 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ ফিট ২ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন'। এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ব্যক্তির সঙ্গে আমরা সংখ্যানুপাতিক হিসাবের একটি খাপকে মিলিয়ে দেখছি। এই পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে বাক্য-বহির্ভূত কোনো সংবাদ জানবার কোনো প্রয়োজন নেই, বাক্যের মধ্যেই আলোচনার যাবতীয় উপকরণ আছে। যে কোনো লোক যে কোনো সময়েই-এই সম্পর্কটিকে বিচার করতে পারবে কারণ বাক্যের মধ্যেই আলোচনায় যাবতীয় উপকরণ আছে। যে কোনো লোক যে কোনো সময়েই এই সম্পর্কটিকে বিচার করতে পারবে কারণ সম্পর্কটি বাক্য এবং বিচার যোগ্য। অনেক নৈয়ায়িক আরো বলেন যে তথ্যের বিচারে সত্য মিথ্যা, ভুল ভ্রান্তির স্থান আছে। কারণ এই জাতীয় বাক্যে বক্তা কোনো না কোনো বক্তব্যকে উপস্থিত করে। বক্তব্য সর্বদাই সত্যমিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

বিচার : তথ্যমূলক ও মূল্যবিচার

মূল্যবিচার বলতে আমরা বুঝি যেখানে কোনো একটা মানদণ্ডে

স্তরবিভক্ত প্রত্যয়কে আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হয়। মানদণ্ড এ কারণে প্রয়োজন যে, স্তরবিভাগেই যেহেতু মনোভাব অনুযায়ী বক্তব্যকে সাজানো সম্ভব, মনোভাবের একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য প্রয়োজন।

মূল্যবিচারে মানদণ্ড থাকে

মানদণ্ড তথ্য বিচারেও থাকে যেমন দৈর্ঘ মাপবার গজফিতে। যেমন ওই গজফিতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মাপলেই ৬ ফিট ২ ইঞ্চির বক্তব্যটি সঠিক জানা যাবে। মূল্যবিচারের মানদণ্ডের সঙ্গে তথ্যবিচারের মানদণ্ডে একটি মৌলিক তফাৎ আছে। তথ্যের মানদণ্ড একটি সামান্য ধারণা। গজফিতেটি মোটামুটিভাবে ব্যবহারকারী সব ব্যক্তিদের স্বীকৃত, তার কোনো ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু মূল্যের মানদণ্ডটি সম্পূর্ণই প্রায় ব্যক্তিগত। প্রতি লোকের নিজস্ব রুচি, শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে এই বক্তব্যটি তৈরি হয়। সুতরাং মূল্য-বিচারে ঐক্যস্থাপন করা সুবিধেজনক।

আরো একটা তফাৎ আছে। মূল্য বিচার ব্যক্তিগত মানদণ্ডে নির্ধারিত হওয়ায় আমরা বলতে পারি যে মূল্য বিচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা মূলক নয়। বাইরের সম্পর্ক বিচার করে তা রায় দেয় না। সুতরাং মূল্য বিচারের কোনো সংখ্যানুপাতিক হিসেবে নেই, যাকে গণিত বা পরিসংখ্যানে ছকা যায়। মূল্য বিচার সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার। নৈয়ায়িকরা বলেন মূল্য বিচার সত্য-মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ এই বিচারে কোনো বক্তব্য উপস্থিত করা হয় না, নিজের মনোভাবটি প্রকাশ করা হয় মাত্র। যেমন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' বললে যদিও তথ্যবিচারের মতো মনে হয় কিন্তু কার্যত কবিত্বের শ্রেষ্ঠ মাপ গ্রহণ করবার কোনো মানদণ্ড বাইরের জগতে নির্দিষ্ট নেই। মাপটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণই প্রায় বক্তার বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

এ কারণেই মূল্য বিচারে 'অস্তি' নেই আছে **ঔচিত্য। বর্ণনা নেই আছে বোধ।** অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ভাষায় 'It is not merely a judgment **about,** but a judgment **upon'**। বস্তু বা বিষয়ের অবস্থান, সম্পর্ক ও তারতম্যভেদ বিষয়ে কিছু মন্তব্য না-করে আমরা বস্তু বা বিষয়ের নিজস্ব অন্তরস্থ চরিত্র বিষয়ে মতামত দিই।

বর্তমান আলোচনা থেকে নৈতিক বিচারের চরিত্র নির্ধারণ করা যায়। **নৈতিক বিচার সর্বদাই মূল্যের বিচার।** সুতরাং নৈতিক বিচারের **প্রশ্ন দুটি : (ক) কার ওপর বিচারের রায় দেওয়া হয় অর্থাৎ বিচারের বিষয়**

কি? ও (খ) **কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রায় দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মানদণ্ডটি কি?**

মূল্য বিচারের অন্তর্ভুক্ত নৈতিক বিচারের ভাষায় আমরা সর্বদাই পাই 'ভালো-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়' ইত্যাদি শব্দাবলী। অধ্যাপক লিলি নৈতিক ধারণাবলীতে চারটি তাৎপর্য আরোপ করেছেন। ওঁর মতে চারটি তাৎপর্যের যে কোনো একটি মনে রেখেই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। (ক) মূল্য, (খ) আনুগত্য বোধ, (গ) নৈতিক যোগ্যতা, (ঘ) বাস্তব বৈধতা।

(ক) **মূল্য** (value)—আমরা যখন বলি 'কাজটা ভালো' তখন বোঝাতে চাই যে কাজটা এ-কারণেই করা উচিত যে তাতে লাভ আছে। অর্থাৎ মূল্য বিচারে সমস্ত সময়েই একটা অংশ প্রয়োজনের এবং প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতার।

(খ) **আনুগত্য বোধ** (obligation)—নৈতিক নিয়মের সঙ্গে আনুগত্যের বোধ থাকে। কারণ আমি যখন কাজটিকে ভালো বলি তখন শুধু যে অন্যদের করতে বলি তা-নয়, নিজেও করণীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করি। কর্তব্য শুধু অন্যের কাছেই তাৎপর্যযুক্ত নয়, বক্তার কাছেও। যেমন বললাম 'সত্য কথা বলতে হয়'। সত্যের তাৎপর্য আমার ওপরেও একই রকমে বর্তায় অর্থাৎ আমার আনুগত্য দাবি করে।

(গ) **নৈতিক যোগ্যতা** (Moral Fittingness)—নৈতিক বিচারে পরিবেশের দিকে নজর রাখা হয়। যেমন বলা হলো 'মাকে ওর মৃত্যু সংবাদটি দেওয়া উচিত হবে না'। এখানে সত্যের খাতিরে, ঔচিত্যের খাতিরে মাকে সংবাদটি জানানো উচিত কিন্তু বিশেষ অবস্থার কারণে সত্যটির ঔচিত্য বিচার করে অন্য রায় দেওয়া হচ্ছে।

(ঘ) **বাস্তব বধতা** (Objective Validity)—নৈতিক বিচারে নিজের মনোভাব ও ঔচিত্যবোধ প্রকাশ হয়। কিন্তু মানুষের চরিত্রের কারণেই যে-কোনো ঘোষণায় এমন একটা ঝোঁক থাকে যে প্রতিটি নৈতিক বিচারই সামান্য ও সর্বজনীন। নৈতিক বিচারটি কেবল মাত্র আমার ওপরেই প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য সবার ওপর।

নৈতিক বিচারের প্রশ্ন দুটিকে ভাগ করে দেখিয়েছি যে তা বিচারের বিষয় ও বিচারের মানদণ্ডে বিভক্ত। এই প্রশ্ন দুটিকে আরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নৈতিক বিচারের অংশ চারটি। (১) বিচারের কর্তা (agent), (২) বিচারের

বিষয় (object or subject of judgment), (৩) বিচারের মানদণ্ড (standard) ও (৪) বিচারের নৈতিক বৃত্তি (moral faculty)।

২। নৈতিক বিচারের বিষয় (The object of moral judgment)

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী আত্মসচেতন কর্মই নৈতিক বিচারের বিষয়। দার্শনিক ব্র্যাডলীর বক্তব্য মতো ইতিপূর্বেই আমরা আত্মসচেতনতার নজীরে দেখেছি যে একমাত্র স্বাধীনতার বোধেই মানুষের নৈতিকতার প্রকাশ। তিনি চমৎকার লিখেছেন যে মানুষের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অর্থাৎ মানুষের যা-খুশি হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই তার কর্মের ঔচিত্য বা নৈতিকতার প্রশ্ন উঠেছে। তিনি লিখেছেন "You are 'accountable', in short, because you are wholly 'unaccountable' creature"।

আত্মসচেতন স্বাধীন কর্মের জন্য সঙ্কল্পের যথোচিত নির্দিষ্ট পরিচালনা দরকার। সুতরাং সঙ্কল্পিত কর্ম ব্যতীত কখনোই নৈতিক বিচার সম্ভব নয়। ব্যক্তি নিজে যা স্থির করেনি, করবার বাসনা তাকে সঙ্কল্পে ঠেলেনি এবং সঙ্কল্প থেকে নির্ধারিত কর্ম আসেনি—সেই কর্মকে নৈতিক কর্ম বলা হবে না। কালবৈশাখী ঝড়ে একটা গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় এক ব্যক্তি আর এক জনকে খুন করলো—এ সমস্ত ঘটনা নৈতিক বিচারের বিষয় নয় কারণ এই সব কর্মে মানুষের সচেতন স্বাধীনতা প্রকাশ পায় নি। সুতরাং নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হলো সচেতন কর্ম বা আচরণ (conduct)।

নৈতিক বিচারের বিষয় নিয়ে দার্শনিকরা যথেষ্ট চিন্তিত হয়েছিলেন। জর্মান দার্শনিক কাণ্ট মনে করেছেন বিচারের একমাত্র বিষয় 'শুভ সঙ্কল্প'। তিনি লিখেছেন 'there is nothing in the world, or even out of it, that can be called good without qualification, except a good will'। কর্মের ফল ও সুখ, কাণ্টের মতে, তখনই শুভ ধরতে হবে যখন তাদের ন্যায়ত ব্যবহার করা হয়েছে।

কাণ্টের মতে এমন কি প্রতিভা ইত্যাদিরও কোনো মূল্য নেই যদি-না প্রতিভার সামনে কোনো উঁচু আদর্শ থাকে। নইলে তারা কেবল মাত্র সর্তাধীনভাবে ভালো। একমাত্র 'শুভ সঙ্কল্পই' নিজে থেকে আত্যন্তিকভাবে (inherently) ভালো। শুভ সঙ্কল্প নিজের দীপ্তিতেই প্রকাশ পায়।

কাণ্টের আলোচনা থেকে আমাদের মন স্থির করতে হয় যে আমরা সঙ্কল্প,

ইচ্ছা ও কর্মকে পৃথক করবো। কারণ যে-কোনো ইচ্ছাই যেমন সঙ্কল্প নয়, তেমনি যে-কোনো সঙ্কল্পই কর্মে প্রভাবিত সিদ্ধি আনে না। কর্ম ও কল্পনা, অর্থাৎ সঙ্কল্প ও কর্মে পরিবেশের প্রতিকূলতায় নানা বাধা উপস্থিত হতে পারে এবং কর্মকালে ফলটি মোটেই আশানুরূপ না-ও হতে পারে। তাছাড়া আমাদের ধরে নেবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে শুভ সঙ্কল্প থেকেই শুভকর্ম প্রস্তুত হয় এবং শুভ সঙ্কল্প ছাড়া কোনো শুভ কর্মই থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা বলেছি শুভ কর্মের ফল ভালো না-ও হতে পারে বা খারাপ কর্মের ফল যথেষ্ট ভালো হতে পারে।

বিখ্যাত সমালোচক ডক্টর জনসন লিখেছেন 'The morality of an action depends on the motive from which we act'। লক্ষ্যের চরিত্র থেকেই কর্মের চরিত্র বোঝা যাবে। লক্ষ্য মানসিক ব্যাপার সুতরাং কর্মের রায় নির্ভর করবে কর্তা মনে মনে কি ভেবেছেন ও কি ভেবে কী কাজ করেছেন তার ওপর। জনসনের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে ভিখিরীকে একটা পয়সা এমন ভাবে ছুঁড়ে দিলুম যেনো তার মাথাটা ফেটে যায়। মাথা অবশ্য ভাগ্যক্রমে ফাটলো না এবং সে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে সেলাম করলো। এ-ক্ষেত্রে জনসন বলবেন শুধুমাত্র ফল দিয়ে বিচার করলে ভিখিরীর নিশ্চয়ই লাভ হয়েছে সুতরাং কর্মটি ভালো। কিন্তু গ্রহীতাকে ছেড়ে দাতার দিক থেকে বিচার করলে জানি যে দিতে চাইনি বরং মাথাটা ফাটাতে চেয়েছিলাম। কাজেই কর্মের লক্ষ্যটি ছিলো অশুভ। আমরা সাধারণভাবেই অনেক সময় জানি যে পেটরোগা ছেলে খাবার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করলে মা রেগে অনেক সময় একগাদা খাবারের সামনে তাকে বসিয়ে বলেন 'নাও গেলো'। তাতে ছেলেটির মজা হতে পারে, সে যা চেয়েছে তাই পাচ্ছে কিন্তু কার্যত মা নিশ্চয়ই তাকে ওসব খাওয়াতে চাননি।

জনসন বলেন মোটিভ কর্মের উৎস

জনসন তেমনি অন্য একটি উদাহরণও দিয়েছেন শেক্‌সপীঅরের টেমপেষ্ট নাটক থেকে যে শুভ সঙ্কল্পের ফল কেমন অশুভ হতে পারে। ক্যালিবান বলছে প্রসপেরোকে 'You taught me language and my profit on't is, I know how to curse'। অর্থাৎ সাধু উদ্দেশ্যে ভাষা শেখানো হলো কিন্তু শিক্ষার্থী জানলো শুধু গালিগালাজটুকু!

ডক্টর জনসনের উদাহরণ থেকে দর্শনে সুখবাদী ও বিচারবাদী দার্শনিকদের বিতর্কের স্বরূপ বোঝা যায়। সুখবাদীরা কেবলমাত্র ফলের ওপর কর্মের

নৈতিক বিচার

নৈতিকতা দাঁড় করাচ্ছেন আর বিচারবাদীরা দাঁড় করাচ্ছেন লক্ষ্য বা অভিপ্রায়ের ওপর। বর্তমান আলোচনায় আমরা লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের দিকে ঝুঁকে সিদ্ধান্ত করেছি যে শুভ কর্মের উৎস শুভ সঙ্কল্প কিন্তু শুভ কর্মমাত্রেরই ফল শুভ নয়। সুতরাং শুধু মাত্র ফলের বিচারে সত্যে পৌঁছানো যাবে না।

তবে ফলের ক্ষেত্রে অনেক দার্শনিকের মত এই যে শেষ পর্যন্ত কোনো কর্মের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ইত্যাদি সর্ববিধ ফলাফল বিচার করলে দেখা যাবে অভিপ্রায়ের শুভবোধের মাত্রার সঙ্গে ফলাফলের মঙ্গলের মাত্রা প্রায় সমান সমান। দার্শনিক গ্রীণ লিখেছেন 'there is no real reason to doubt that the good or evil in the motive of an action is exactly measured by the good or evil in its consequences.'

কর্মের নৈতিকতা বিচারে দুটো সমস্যা থাকে। (ক) ব্যক্তির কর্মের বিচার হচ্ছে না তার চরিত্রের ? ও (খ) বিচার লক্ষ্য না অভিপ্রায়ের ?

(ক) ব্যক্তির কর্ম না চরিত্র ?—নৈতিক বিচারে আমরা কর্তাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তার কর্মটিকে দেখতে পারি আবার কর্মকে ব্যক্তির সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়েও বিচার করতে পারি। কার্যত দৈনন্দিন জীবনে আমরা সর্বদাই এই দুটি বিচারের কেন্দ্রেই ঘুরে বেড়াই। কখনো রায় দিই ব্যক্তির কর্মে, কখনো ব্যক্তির চরিত্রে। বহু ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ন্যায় কাজ করলেও আমরা তাকে ভালো লোক বলতে চাই না, আবার ভালো লোক অন্যায় কাজ করলে তার অন্যায়কে চোখ ঠেরে অস্বীকার করতে চাই।

চরিত্রের ওপর রায় দিতে বিশেষ অসুবিধে নেই। ব্যক্তির চরিত্রকে আমরা বিচার করি নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সিদ্ধির মাত্রা মিলিয়ে। অর্থাৎ আদর্শ অনুযায়ী কতোটুকু সে করতে পারছে দেখলেই রায় দেওয়া যায়। কিন্তু শুধু মাত্র কর্মের বিচারের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধে। কারণ একটু আগেই আমরা দেখেছি যে ফলাফল দিয়ে কর্মের বিচার করবো না, করবো কর্তার মনের দিক থেকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমস্যা থাকে। আমরা পুরো অভিপ্রায় দিয়ে বিচার করবো না শুধু লক্ষ্য দিয়ে বিচার করবো ? এ-বিষয়ে দার্শনিকদের কোনো সর্বজনস্বীকৃত মতামত নেই। এমন কি লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের সংজ্ঞা বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে।

(খ) লক্ষ্য না অভিপ্রায় ?—এই তর্কের প্রধান দুই তরফ হল উপযোগিতাবাদী ও বোধিবাদীরা। বোধিবাদী (Intuitionist)-দের মতে

নৈতিক বিষয় লক্ষ্যের দ্বারা নির্দিষ্ট। প্রকৃত কার্যের ক্ষেত্রে কর্তার সত্যকারের লক্ষ্য বিচার করেই কর্মের শুভ অশুভ বিষয়ে রায় দিতে হবে। অধ্যাপক মার্টিন্যু বর্তমানকালের সবচেয়ে বিখ্যাত বোধিবাদী। তিনি তাঁর তত্ত্বকে প্রমাণ করবার জন্য লক্ষ্যের একটা বিরাট তালিকা তৈরি করেছেন এবং তাদের মূল্যের তারতম্য অনুসারে সাজিয়েছেন। শ্রদ্ধাকে তিনি সর্বোচ্চস্থান দিয়েছেন ও সর্বনিম্নে আছে সন্দেহ ইত্যাদি।

মার্টিন্যুর সমর্থনে আমরা কাণ্ট ও বাটলারকে পাই। কাণ্ট লিখেছেন 'the effect of our action cannot give them moral worth' আর বাটলার লিখেছেন 'the rightness or wrongness of an act depends very much upon the motive for which it is done.'

বোধিবাদীদের বক্তব্যবিষয়ে হেনরী সিজউইক বিস্তৃত প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা দুটো প্রধান আপত্তি এখানে আলোচনা করবো। লক্ষ্যের তালিকা, যাকে বোধিবাদীরা বলতেন কর্মের উৎস ('springs of acting'), ভুল-মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাটলার যেমন তিনটি স্তরে মনকে ভাগ করেছিলেন। বাটলার শ্যাফ্‌টসবেরীর মতো মানুষের চরিত্রকে কেবলমাত্র একটা আবেগের বিন্যাস (system of impulses) মনে করেননি। তাঁর মতে মানুষের চরিত্র হচ্ছে 'a system in which some springs of action are naturally governing and regulative, while others are naturally submissive to regulation'। বাটলার মনের কিছু কর্মের উৎসকে নিয়ন্ত্রক বলছেন। সবগুলোকেই তিনি সমান মূল্য দেননি। নিয়ন্ত্রক তিনটি বাটলারের মতে আত্ম-প্রেম, দয়া ও বিবেক। প্রথম দুটি নিয়ন্ত্রণ করে সেই সব আবেগকে যা থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল তৈরি হয়। আর বিবেক সমস্ত কর্মকেই নিয়ন্ত্রণ করে। বাটলার লিখেছেন 'Reasonable self-love and conscience are the chief or superior principles in the nature of man; because an action may be suitable to this nature, though all other principles be violated; but becomes unsuitable if either of those are.' মনস্তত্ত্বে মনকে আমরা একটি পরিপূর্ণ ঐক্য হিসেবে বিচার করি, মনকে থাপে থাপে বিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক

বাটলার মনের কর্মের উৎসকে নিয়ন্ত্রক বলেন

ভিত্তি নেই। মার্টিন্যুর বিরুদ্ধে বলা যে তিনি যে সব লক্ষ্যের কথা তুলেছেন তারা মোটেই সরল নয়, সবই মিশ্র অবস্থা। কোনো বিশেষ অবস্থায় কার কি মূল্য তার বিচার হয় কেমন ভাবে তারা সংগঠিত হয়েছে তার ওপর। মার্টিন্যুর তালিকা মোটেই লক্ষ্যের তালিকা নয়, ওটা আবেগের তালিকা মাত্র। কারণ শুধু মাত্র ভয় বা করুণা কর্মের উৎস হতে পারে না। আমাদের প্রতিটি কর্মের পেছনে কিছু-না-কিছু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে বাধ্য।

বাটলারের বিষয়ে সিজ্‌উইক লিখেছেন যে বাটলার আত্মপ্রেমের যুক্তি বিষয়ে কিছুই বলেন না। বাটলারের আলোচনা প্রধানতই মনস্তাত্ত্বিক কারণ তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিচারে বিবেকের নির্দেশ মানতে চাচ্ছেন কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক সূত্র স্থির করেন নি। তিনি বার বার বলেছেন যে 'moral duties arise out of the nature of the case' বা 'moral precepts are precepts of which we are the reason' কিন্তু তাদের বিষয়ে কিছু জানান না।

বোধিবাদীদের বিরুদ্ধে উপযোগিতাবাদীরা জানেন যে 'the morality of an action depends entirely upon the intention, that is, upon what the agent **wills to do** But the motive, that is the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality; though it makes a great difference in our moral estimation of the agent, specially if it indicates a good or a bad habitual **disposition.**'

মিল কর্তার মনোভাব বিষয়ে লক্ষ্যের মূল্য দিচ্ছেন তার ঝোঁক (disposition) বুঝবার জন্য কিন্তু কর্মের নৈতিকতায় তাকে আনতে চাচ্ছে না। তাই আবার বলছেন 'the motive of an action has nothing to do with the action, though much with the worth of the agent.' অর্থাৎ মিলের কাছে প্রশ্নটি কেবলমাত্র কর্মের ভালো বা মন্দ। তিনি বলেছেন ধরা যাক দুরকম চরিত্রের লোক একই কাজ করলো, ফলটি উভয়তই ভালো বা মন্দ হলো। এবার কর্মের বিষয়ে আমরা কী রায় দেবো? একটি লোক মানুষ হিসেবে ভালো হতে পারে এবং অন্য জন

খারাপ, তাতে কি কর্মটির চরিত্রের কিছু এসে যাচ্ছে? মিলের মতে নিশ্চয়ই নয়। একমাত্র তাদের আবেগ বা লক্ষ্যের জন্য কর্মের চরিত্র বদলালে তাকে মূল্য দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও দেখা যাবে, মিল ব্যাখ্যা করেন যে, লক্ষ্য অনুযায়ী নিশ্চয়ই কর্মেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ শেষপর্যন্ত কর্মটিই বিবেচনার, চরিত্র বা লক্ষ্য নয়।

মিলের এই বক্তব্যটির যৌক্তিকতা সত্ত্বেও তাকে পুরো সমর্থন করা যায় না। আবেগকে শুধুমাত্র কর্মের সহযোগী মনে করলে নিশ্চয়ই মিল ন্যায্য কথা বলেন যে, আবেগ ও লক্ষ্যকে কর্মের বিচারে আনা উচিত নয়। কিন্তু এমন যদি হয় যে লক্ষ্যের অর্থ বিশেষ ভাবে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ বা অনুপ্রেরিত হওয়া, তবে নিশ্চয়ই কর্মের বিচারে লক্ষ্যের গুরুত্ব অসাধারণ। মিলের ভুলের প্রধান কারণটি হলো তিনি কর্মকে সম্পূর্ণভাবে কর্তার চরিত্র থেকে তফাৎ করে দেখছেন। ওঁর কাছে ফলটিই প্রধান, ফলের প্রক্রিয়া নয়। প্রকৃতিতে হয়তো ফল ও ফলের প্রক্রিয়াতে মৌল ভেদ আছে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমন ভেদ কল্পনা করা যায় না। বিশেষত নৈতিক বিচারে শুধুমাত্র সমাপিত কর্মের ওপর রায় দেওয়া হয় না, রায় দেওয়া হয় কর্মরত ব্যক্তিটির ওপর। নইলে প্রথমত আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীর সাহজিক বৃত্তি-মূলক আচরণকেও নৈতিক বিবেচনার বিষয় ধরে নিতাম ও পরাধীন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির কর্মকেও মূল্য দেওয়া হতো। অথচ আমরা স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীন আচরণকেই আলোচনায় গ্রহণ করেছি; আচরণের অর্থ কেবলমাত্র ব্যক্ত কর্ম নয়, কর্তার সুপ্তবোধ ও অজ্ঞাত প্রেরণার লক্ষ্য।

কর্মে লক্ষ্যের গুরুত্ব বেশি

এমনকি মিল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে লক্ষ্য কর্তার বিষয়ে আমাদের মনোভাবকে প্রভাবিত করে। অবশ্য বহুক্ষেত্রেই আমরা বিচ্ছিন্ন একটি কর্মের ওপর রায় দিই (কেউ যেমন কাউকে ঠকালে, মিথ্যে কথা বললে, মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করলে) কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা শুধু বাইরে থেকেই মতামত দিয়ে খালাস হচ্ছি। মানুষটিকেও দেখতে হয়, নইলে বহুক্ষেত্রেই বিচারে একটিমাত্র ঘটনায় নির্ভর করলে আমরা সমগ্র লোকটিকে ও তার বিভিন্ন-কর্মকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝবো।

আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আর একটি প্রশ্ন ওঠে। পৃথিবীতে দেখা গেছে বহুলোক ভালো ভেবেই অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। তবে কি তার

কর্মকেও সমর্থন করতে হবে? প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে ওই ব্যক্তিদের কাজকে আমরা কখনোই নৈতিক বলছি না। তেমনি হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে একটি গ্রামের ধ্বংসও নৈতিক নয়। অর্থাৎ উভয়তই আমাদের বিচারটি নৈতিক বিচার নয়। কিন্তু প্রশ্নটির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, সেই ব্যক্তিরা ন্যায় কাজ করেছে কিনা তবে প্রশ্নটির আংশিক জবাব হবে, যদি ওই ব্যক্তিরা সত্যিসত্যিই লক্ষ্যটিকে শ্রেয় হিসেবে সঠিক ভেবেছিলেন এবং লক্ষ্য-নির্দিষ্ট পথে চলেছিলেন তার কর্ম নৈতিক হয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে এই ব্যক্তিদের লক্ষ্যেই গোলোযোগ আছে, তাদের লক্ষ্যটিই নৈতিক নয়।

৩। নৈতিক বিচার চরিত্রের (**Character is the real object of judgment**)

উপযোগিতাবাদীদের বিরুদ্ধে আমরা স্থির করেছি কর্মের বিচারে অভিপ্রায় ও লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে লক্ষ্য ও অভিপ্রায়কে বুঝতে হয় কর্তার সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে। এই চরিত্রের বিচার বিষয়ক প্রস্তাবটি কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। একবার রায় দিয়ে দিলাম আর চিরকালের মতো তা জানা হয়ে গেলো, এমন নয়। চরিত্র হয়ে ওঠার জিনিস, ব্যক্তি দিনে দিনে ব্যক্ত হয় সুতরাং প্রতিটি কর্মের বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রেই সেই উদ্‌ভিন্ন ও ক্রমবিবর্তিত চরিত্রের স্বরূপকে বোঝা যায়। কর্মে নানাভাবে ব্যক্তির অন্তঃস্থ সত্তার ছাপ পড়ে।

এ-কারণেই আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে জীবনে আকস্মিক ভাবে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে কিন্তু তাকেই চিরকালীন জেনে আমরা চূড়ান্ত রায় দিই না। অসৎ ব্যক্তির আকস্মিক সৎ কর্ম বা সৎ ব্যক্তির কচিৎ অন্যায় কর্মকে আমরা তাদের সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়েই বুঝতে চাই।

৪। নৈতিক বিচারের বিষয়ী বা কর্তা কে? (**The Subject of Moral Judgment**)

নৈতিক বিচারের কর্তা বা বিষয়ী বলতে বুঝতে হবে যে মানদণ্ডে কর্মের বিচার করা হবে। প্রতিটি লোকই যখন কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তার মনে নিজের কর্ম বিষয়ে নিশ্চিতি থাকে। তার ধারণায় তার কর্মটি সর্বদাই ন্যায্য ও সর্বদাই সৎ। তার যদি এই বিশ্বাস না থাকতো তবে সে সচেতন ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারত না। নিজের লক্ষ্য বিষয়ে

নিশ্চিতিই তার সচেতন কর্মের উৎস। তবু অন্যেরা তার কর্ম বিষয়ে ভালো বা মন্দের রায় দিতে দ্বিধা করে না বা এমনকি, সেই ব্যক্তিই পরে নিজের কর্মের বিচার নিজেই করতে পারেন যে, কাজটা যথোচিত হয়েছে বা হয়নি। অর্থাৎ, কাজের মুহূর্ত ও পরবর্তী অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট মান কাজ করছে না। করার মুহূর্তে যখন ভালো মনে হয়েছে তখন একভাবে সে বিচার করেছে, আবার পরে যখন মনে হয়েছে কাজটি ভুল হয়েছে তখন সে অন্য মান ব্যবহার করছে।

বিভিন্ন মান ব্যবহার করে বিভিন্ন রায় দেবার ফলে প্রশ্ন ওঠে যে নৈতিক বিচারে যদি বিভিন্ন মানই থাকে তবে কোনো একটিকে সমর্থন করবো কেনো? বা, একটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানবো কেনো?

এই প্রশ্নটির জবাব বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। ইংরেজ বোধিবাদীদের অগ্রগণ্য দার্শনিক শ্যাফট্‌সবেরী একটা জবাব দিয়েছেন। ওঁর বক্তব্যের প্রধান কথাই হচ্ছে নৈতিক বিশেষজ্ঞের উক্তি। আর একটি জবাব দিয়েছেন এডাম স্মিথ।

(ক) বিশেষজ্ঞের উক্তি (Moral Connoisseur)—এই বক্তব্যটি বুঝবার জন্যে একটি সদৃশ-উপমা (analogy) গ্রহণ করা যায়। উপমাটি মেলে শিল্প সাহিত্যের ইতিহাস থেকে। একটি কবিতা বা একটি ছবিকে আমরা ভালো বলি কেনো? পাঠক বা দর্শক রায় দেন তাঁর অর্জিত বিদ্যা ও অর্জিত সংস্কার থেকে। তাঁর এই বিদ্যা ও সংস্কারে একটি প্রচ্ছন্ন মান কাজ করে। মানটি প্রথমত হলো, শিল্পী যা করতে চেয়েছেন তা তাঁর কবিতা কি ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে কিনা। দ্বিতীয়ত, আরো অসংখ্য কবি ও শিল্পীর চিন্তা ও প্রকাশ থেকে একটি সামান্য সিদ্ধান্ত এই সামান্য সিদ্ধান্তটির সঙ্গে শিল্পীর লক্ষ্য মিলিয়ে আমরা রায় দেবার চেষ্টা করি। মানের প্রয়োগে নিশ্চয়ই প্রয়োগকর্তার অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধি মূল্যবান। কারণ তিনিই তাঁর যোগ্যতা ও অধিকার মতো ওই দুটিকে বোঝেন, ব্যাখ্যা করেন, কার্যকরী বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

একই রকমে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞের কথা তোলা যায়, যিনি অভিজ্ঞতায় সামান্য তত্ত্ব ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য মিলিয়ে কর্মের চরিত্র ব্যাখ্যা করেন ও তার তাৎপর্য বিষয়ে মতামত দেন। দার্শনিক শ্যাফট্‌সবেরী নৈতিক আচরণের চরিত্র ব্যাখ্যায় এমন বিশেষজ্ঞের ওপর দাঁড়াতে চান। কিন্তু

সদৃশোপমার একটি ত্রুটি থাকে। শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে নৈতিক কর্মের সূত্রটি পুরোপুরি মেলে না কারণ শিল্পে রায় দেওয়া হয় শিল্পকর্মের ওপর, শিল্পীর প্রক্রিয়ার ওপর নয়। অথচ নৈতিক বিচারে আমরা শুধু ব্যক্ত কর্মের চরিত্রই দেখি না, কর্মের সমস্ত প্রক্রিয়াটিই দেখি। **এই সমস্ত প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যোগ ব্যক্তির, তার সমগ্র চরিত্রের**। এই কর্মের ক্ষেত্রে তাই আমরা জানি যে কর্তা প্রাথমিকভাবে নিজেই বিচার করেছেন এবং বিশেষ ধরণে কর্মটি করবার পদ্ধতি স্থির করেছেন। সুতরাং তার কর্মের ত্রুটি শুধু বিশেষজ্ঞই বিচার করেন না, বিচার সে নিজেই করে মনের শান্তি ও বিবেচনা ফিরে এলে। কার্যত তাই **কার্যের সময় ও কার্যের পরে দুটি মানদণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে না**। বিচারের মানদণ্ড একটিই। লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কর্মের শুভাশুভের বিচার। কিন্তু কর্মের শুরুতে আবেগজনিত কারণে বা বিবেচনার অপরিণত অবস্থার জন্য সে হয়তো সঠিক ভাবে মানদণ্ডটি প্রয়োগ করতে পারেনি। কর্ম-সম্প্রদনের পর কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-যোগাযোগটি কমায় স্থিরভাবে বিচার করতে পারে, বিবেচনা আয়ত্ত থাকে, মন চঞ্চল হয় না।

(ক) **নিরপেক্ষ দর্শক (Impartial Spectator)**—দ্বিতীয় মতটি উপস্থিত করেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ-দার্শনিক এডাম স্মিথ। ওঁর তত্ত্বটি নির্ভর করে সমবেদনার ধারণার ওপর। ওঁর বক্তব্যের প্রধান কথাই হলো, বিষয়ী বা কর্তার মনে আমাদের কতোটুকু অনুপ্রবেশ তার ওপর ন্যায় অন্যায়ের মতামত নির্ভর করে। কর্তার মনের সঙ্গে আমাদের যোগ সহানুভূতিতে। সহানুভূতির ব্যাপ্তির ওপর সমর্থন-অসমর্থন নির্ভর করে। সহানুভূতি থাকলে আমরা কোনো কাজকে সমর্থন করি, সহানুভূতির অভাব থাকলে কাজের সমর্থন করি না। এডাম স্মিথ লিখেছেন 'We run not only to cougratulate the successful, but to condole with the afflicted ; and the pleasare which we find in the conversation of one whom in all the passions of his heart we can entirely sympathize with, seems to do more than compensate the pain of that sorrow with which the view of his situation affects us.'

আরো লিখেছেন 'If we hear a person loudly commenting his misfortunes, which, however, upon bringing, the

case home to ourselves, we feel can produce no such violent effect upon us, we are shocked at his grief ; and, because we cannot enter into it, call it pusillanimity and weakness. It gives us the spleen, on the other hand, to see another too happy, or too much elevated as we call it, with any little piece of good fortune. We are disobliged even with his joy ; and, because we cannot go along with it, call it, levity and folly. We are even put out of humour if our companions leugh louder or longer at a joke than we think it deserves ; that is, than we feel that we ourselves could laugh at it.'

এডাম স্মিথের মতে তাই অন্যের সঙ্গে আমাদের মানসিক যোগাযোগেই নৈতিকতার ভালো মন্দ নির্ভর করে। আমরা তার বেশি দাবি করি না, করবারও কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি এই সূত্রেই আরো বলেন যে, আমাদের প্রাথমিক বিচার নিজেদের সম্বন্ধে নয়, অন্যদের বিষয়ে। ওঁর মতে 'Our first ideas of personal beauty and deformity, are drawn from rhe shape and appearance of others, not from our own. We soon become sensible, however, that others exercise the same criticism upon us.' এডাম স্মিথ এই বক্তব্যটি অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন যে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা গোড়ায় তাকাই অন্যদের দিকে, নিজেদের দিকে নয়। নিজেদের দিকে তাকাতে মন নারাজ হয়। ঈশপ যেমন গল্পে জানিয়েছিলেন, নিজেদের অন্যায়ের, ত্রুটির, নোংরামির থলেটি থাকে পিছন দিকে। ফলে অন্যের থলেটি নজরে পড়ে আগে। কিন্তু আমি যেমন অন্যের ক্ষেত্রে দর্শক, তেমনি আমিও অন্যের দ্রষ্টব্য। সুতরাং কালক্রমে আমাদের ত্রুটিও অন্যের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। অন্যের কর্ম বিষয়ে একই রকমে রায় দিতে দিতে আমরা নিজেদের কর্ম বিষয়ে সচেতন হই এবং আমাদের কর্ম অন্যের চোখে কেমন প্রতিভাত হবে এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি। তখন প্রথম চেষ্টাই হয় কেমন করে নিজে দর্শক সেজে, অন্যের চোখে নিজের কর্মকে যাচাই করা যায়। ওঁর ভাষায় ঘটনাটা

এডাম স্মিথ ও মানসিক বিচার

তখন এই যে আমরা বুঝতে চাচ্ছি by considering how they could appear to us if in their situation.'

অর্থাৎ অনেকটা আয়নার মতো। নিজের মনের আয়নায় নিজেই তাকাই অন্যের চোখে। যদি তখন সমস্ত কর্মই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, যদি তাতে কোনো ত্রুটিই ধরা না পড়ে তবে মনে প্রশান্তি আসে। জগতের কথায় তখন কর্ণপাত না করলেও চলে, এডাম স্মিথ বলছেন এমন দর্শক সেজে যখন কর্মের বিষয়ে বিচার করছি তখন আমি যেনো দুটি ব্যক্তি : যে আমি বিচার করছি ও যে আমি বিচার্য বিষয় হয়েছি। বিচারক আমি অন্যের চোখে, অন্যের সম্ভাব্য মানদণ্ডের প্রয়োগে সমস্ত কর্মকে বুঝতে চাচ্ছি আর বিচার্য আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সমস্ত কর্মের তালিকা হাতে। এডাম স্মিথের এই দুই আমি যেনো অনেকটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'পাকা আমি' ও 'কাঁচা আমি'র মতো। পাকা আমি জ্ঞানী, যে বিচার করে। আর কাঁচা আমি মোহগ্রস্থ পুরুষ, যে ন্যায় অন্যায়ের কর্মে রত।

এডাম স্মিথের একটা সমস্যা অবশ্য থাকে। বিচারক ও অভিযুক্ত শেষ পর্যন্ত একই ব্যক্তি। সুতরাং তাদের তফাৎ করা প্রয়োজন। কীভাবে তফাৎ করা হবে? তিনি বলেন 'একটি লোক অন্তরের' আর 'একজন বাইরের' এবং এই অন্তরের লোকটি হলো 'বিবেক'।

এডাম স্মিথের বিবেক ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'পাকা আমি'র প্রসঙ্গে বোঝা যাচ্ছে যে কর্মরত ব্যক্তিটির বিবেচনার চাইতে আরো বড়ো একটি বিচারক আছে। অর্থাৎ মানদণ্ডটি সবসময়েই বড়ো কিছু হতে হয়, যতোটুকু আমার প্রয়োজন ততোটুকু হলেই চলে না। শেষ পর্যন্ত আমাদের বিচারের মানদণ্ড জোগায় ব্যক্তিবিশেষ নয়, যদিও মানদণ্ডটি ব্যাখ্যার ভার ব্যক্তিবিশেষের। যেমন আমরা আগেই শিল্পের ক্ষেত্রে বলেছি। নৈতিক বিচারের মানদণ্ড তৈরি হয় সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতির সঙ্গেই ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায়ের বোধ জড়িত। সংস্কৃতির মূল কথাই যেহেতু আত্মোপলব্ধি, নৈতিক কর্মকে সেই লক্ষ্যেই বাঁধতে হয়। যে যার নিজের নিজের অভিজ্ঞতার 'পাকা আমি'র সঙ্গে মিলিয়ে সংস্কৃতি ও জীবনের কর্তব্যকে ব্যাখ্যা করবে। জীবনের পরিপূর্ণতা তখন একমাত্র নৈতিক কর্মেই প্রকাশিত হবে।

অনুশীলনী

১। What is exactly the object of moral judgment – motive, intention or consequences of action ?

২। What exactly is the object of moral judgments ?

৩। What is the distinctive character of moral judgment ?

৪। Is character the central focus of all moral judgment ? How will you realise motive and intention all by themselves ?

৫। 'The motive of an action has nothing to do with the morality of the action, though much with the worth of the agent"—Draw out the significance of the statement in the light of Mill's exposition of utilitarian conduct.

৬। Can yon reconcile the significance of the worth of the agent with that of the actions of the agent ? If so, how ?

৭। Why should you pass a moral verdict on the character of the agent ? What is the necessary relation between his actions and character ?

৮। A hits a man consciously without any grudge and ill-feeling. How will you account for the morality of this action ?

৯। Is a standard or a definite point of view so necessary in moral valuation ? Explain the why of it.

১০। What is the exact moral relation between the subject and the object of moral judgment ? Discuss.

১১। What is a standard of moral judgment ?

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক মান ঃ সুখ

১। নৈতিক মান হিসেবে সুখ (Standard as Happiness)

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন কর্মের বিচারে বিভিন্ন মানের প্রশ্ন ওঠে। শ্যাফ্‌টসবেরী তাতে বিশেষজ্ঞকে বিচারের ভার দিয়েছেন আর এডাম স্মিথ নির্ভর করেছেন বিবেকের ওপর। ওঁদের দুজনার আলোচনাতেই একটি শ্রেষ্ঠ আত্মবোধের কথা এসেছে। শ্যাফ্‌টসবেরী ধরে নিয়েছিলেন যে ব্যক্তির কর্মে ও সমাজের লক্ষ্যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। সাধারণতই তার তাল কাটে না। আর এডাম স্মিথ বলছেন কর্মের বিচারে শ্রেষ্ঠ বিচারক বিবেক সর্বদাই ন্যায্য কথা বলে।

এই সমাধানের চেষ্টাতেও কিন্তু সমস্যা পুরো মীমাংসিত হয় না। কারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেই আমরা জানি কোনো কোনো সঙ্কল্প অন্য সঙ্কল্পের চাইতে তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কাজেই আকাঙ্ক্ষায় কিছু বর্জনীয়, কিছু গ্রহণীয়। কিন্তু আমরা কে কাকে বর্জন করবে ও কাকে গ্রহণ করবো? শুধু মাত্র নিজেরে সুখ চাইলে লোকেরা বলে স্বার্থপর, দেশের ও দশের কথা ভাবলে বলে আত্মত্যাগী মহাপুরুষ। নিজের জগতে আমি আত্মনিষ্ঠ থাকতে পারি, অন্যের সম্পর্কে সমস্ত বিবেচনা বাতিল করে কর্মের কথা ভাবতে পারি। তখন নিশ্চয়ই লোকেরা বলবে যে আমার চিন্তার জগতটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বিবেচনায় আরো বৃহত্তর জগতকে স্থান দিতে হয়। ব্যক্তির পেছনে আরো ব্যক্তি আছে, সমাজটাকে অস্বীকার করা যায় না। কোনো ব্যক্তির একক কর্ম বলতে কিছু নেই, শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কিত (self regarding) কর্ম বলতেও কিছু নেই। কার্যত সবার কর্মই কমবেশি অন্যের কর্মের ওপর ছায়া ফেলে, একটি কর্ম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আরো অনেক কর্মের সূত্রপাত করে। কর্মের শৃঙ্খলে তখন অসংখ্য ব্যক্তির জগত পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। কাজেই নিছক নিজস্ব কামনার জগত বলতে কিছু থাকে না এবং বৃহত্তর কামনার জগত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বৃহত্তর জগতের সচেতনতা ও বোধকে আমরা বিচারের মান হিসেবে গ্রহণ করতে থাকি।

সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠতা বিচার করা যায়

অথচ আমার নিজস্ব কর্মের গুরুত্ব আছে। তাকে সর্বদাই অন্যের কর্মের সূত্রে ভাবা চলে না। বহু কর্ম কেবলমাত্র আমার নিজের প্রতি নিজের কর্ম থেকেই তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে বিচারের মানদণ্ড কি হবে? আমি বহুক্ষেত্রে নিজে বাছাই করি। নিজের কর্মের ভালোমন্দের ধারণার পেছনে এই বাছাইটি কাজ করে। সুতরাং আমি নিজেই কাজে বাছাইয়ের ভিত্তিটি জানতে চাই।

আমার কামনায় আমার কর্মের জন্ম। কর্মে কামনাটি সিদ্ধ হলে মনে সুখানুভূতি জাগে, পরিতৃপ্তির স্বাদ পাই জীবনে। ছোটো থেকে বড় সর্ববিধ কাজেই কমবেশি এই সুখানুভূতি বা পরিতৃপ্তির মানসিকতা বিদ্যমান। একই রকমে কামনা চরিতার্থ না হলে বেদনা বোধ করি, মনে অতৃপ্তি, ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলত তখন পরিতৃপ্তি থেকে যেমন নূতন কর্মের উৎসাহ তৈরি হয়, তেমনি অতৃপ্তি থেকে কর্মবিরতির দিকে আমরা ঝুঁকি। সুতরাং সহজেই যেহেতু পরিতৃপ্তির বোধ থেকে নতুন কর্মপ্রবৃত্তির জন্ম হচ্ছে, বৃহত্তর বা সর্বাধিক পরিতৃপ্তিতে জীবনে সর্বাধিক আনন্দ ও অতৃপ্তি থেকে জীবনে চূড়ান্ত বেদনার সূত্রপাত। কাজেই সচেতনভাবে কর্মে আমরা পরিতৃপ্তির খোঁজ করবো এবং অতৃপ্তিকে যতোদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখবো।

এই বক্তব্য থেকেই উচ্চতর কামনার জগত ও নিম্নতম কামনার জগতের ধারণা তৈরি হচ্ছে। উচ্চতর কামনার জগতের অর্থ সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা সুখ আর নিম্নতম কামনার জগতের অর্থ প্রভূত অতৃপ্তি ও দুঃখ। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কর্মবিচারের একটি সামান্য মানদণ্ডও পাচ্ছি যে সেই কর্মই বিচারবুদ্ধিজাত যা উচ্চতর জগতে নিয়ে যাচ্ছে এবং নিম্নতর জগতের সম্ভাবনাকে দূরে রাখছে। দর্শনে এই মানদণ্ডটির নাম সুখবাদ (Hedonism)।

২। সুখবাদের বিভাগ (Varieties of Hedonism)

যে তত্ত্বে সুখ বা পরিতৃপ্তিই জীবনের লক্ষ্য তাকে সুখবাদ বলা হয়। সুখ কামনার বিষয়ে একদল দার্শনিক জানাচ্ছেন যে মানুষের চরিত্রই এমনভাবে সংগঠিত হয় যে তারা সুখ চাইবেই চাইবে। তাদের জীবনের চরম সুখের দিকে তারা মানসিকভাবে চিরকাল আকর্ষিত। আর একদল দার্শনিকের মতে এমন ঝোঁকের কোনো মানসিক বাধ্যবাধকতা নেই। তাদের বক্তব্য এই যে সুখ চাওয়াই মানুষের উচিত। প্রথম বক্তব্যটিকে হেনরী সিজউইক নাম দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ (Psychological Hedonism) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নৈতিক সুখবাদ (Ethical Hedonism)।

আবার আর একদলের মতে সুখ মানুষের নিয়ত আকর্ষণ হোক বা সুখ চাওয়াই তার কর্তব্য হোক, সুখটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। অন্যদের মতে সুখটা সবার জন্যে। প্রথমটাকে সিজউইক নাম দিয়েছেন আত্মসুখবাদী (Egoistie Hedonism), ও দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে সর্বসুখবাদী (Altruistic Hedonism)। এই সর্বসুখবাদকে কেউ কেউ উপযোগিতাবাদও (Utilitarianism) বলেন। আত্মসুখবাদকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ইন্দ্রিয়জ (Sensualistic) ও (খ) যৌক্তিক (Rationalistic)।

শ্রেণীবিভাগের কাঠামোটি হলো এই :
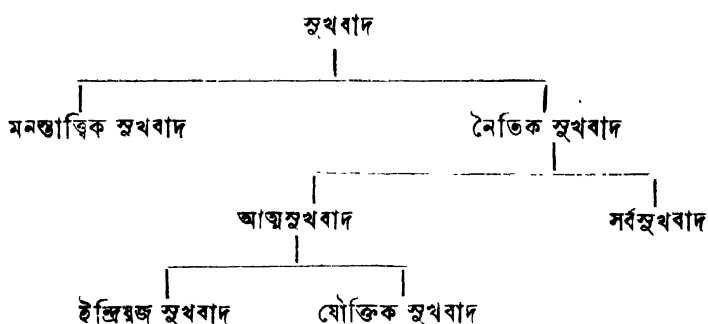
৩। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ (**Psychological Hedonism**)

মানুষ, মনস্তত্ত্ব ঘোষণা করছে, স্বাভাবিক কারণেই সুখ চায়। সুখই তার জীবনের লক্ষ্য এবং সুখ চাইতে সে প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। বস্তু থেকে সর্বদাই মানুষ পরিতৃপ্তির উপকরণ সুখটি আদায় করে নিচ্ছে। কোনো বস্তু তার নিজের মূল্যে মানুষের কাছে স্বীকৃত নয়; কতোটুকু সুখ দিতে পারবে তার ওপরেই মূল্য নির্ভর করে। দার্শনিক হব্‌স, বেণ্টাম ও মিল এই মতবাদের সমর্থক।

বেণ্টাম লিখেছেন 'Nature has placed man under the empire of pleasure and pain'। বেণ্টাম বলেছেন প্রকৃতি মানুষকে সুখ-দুঃখের দ্বৈত রাজত্বে উপস্থিত করেছে। সুখ না পেলেই দুঃখ এবং দুঃখকে হঠাতে পারলেই সুখ। সুখ ছাড়া মানুষের গতি নেই। প্রশ্ন উঠবে তবে স্বাধীন কর্মের নৈতিকতা কোথায়? বেণ্টাম বলবেন ততোটুকুই স্বাধীনতা যতোটুকু মানুষ বেছে নিতে পারে তার কর্মে সে সুখের সন্ধান করবে না দুঃখের দুয়ারে যাবে। বেণ্টামের মতে তার লক্ষ্যই হওয়া উচিত দুঃখকে বর্জন করা।

ওঁর ভাষায় আরো জানা যাচ্ছে যে 'It is for them (সুখ ও দুঃখ) to point out what we ought to do as well as what we shall do'. । অর্থাৎ সুখ দুঃখের নিয়ত আকর্ষণ বিকর্ষণে আমরা কর্তব্য স্থির করি বা স্থির করতে বাধ্য। আমরা না চাইলেও রেহাই নেই যেহেতু আমাদের কর্মহীন অবস্থা বলতে জীবনে কিছু নেই।

মিল লিখেছেন 'Desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful, are phenomena entirely inseparable, rather two parts of the same phenomenon ; to think of an object as desirable, and to think of it as pleasant, are one and the same thing ; to desire anything, except in proportion as the idea of it is pleasant, is a physical and metaphysical impossiblity.'। মিল ঘোষণা করেছেন কোনো বস্তু কামনা করছি অথচ তা সুখানুভূতির নয় এমন ঘটনা জাগতিকভাবে ও দার্শনিকভাবে অবাস্তর। ও'র মতে কামনার অর্থ হলো কোনো একটা লক্ষ্যের জন্য কামনা করা এবং লক্ষ্য ও কামনা সুখের বন্ধনে বাঁধা। মিল এমনকি সংখ্যানুপাতের কথাও বলেন যে কামনা ও সুখের পরিমাণেও সংযোগ রয়েছে।

বস্তুর কামনা সুখের জন্যই

মিল অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদের মনস্তত্ত্ব (যার জনক জন লক) বলে মন সক্রিয়ভাবে কিছু করে না। অনুষঙ্গের নিয়মে মনে ধারণা জন্মায়। ইন্দ্রিয়গুলো কেবলমাত্র মনে সংবেদন এনে জমা করে। সংবেদনের পর সংবেদনের প্রবাহ আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। মন যদিও নিষ্ক্রিয়, অভিজ্ঞতাবাদীরা মনকে একটি ইন্দ্রিয় হিসেবেই ব্যাখ্যা করেন। কাজেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমেই মানুষের কর্মকে ব্যাখ্যা করতে হয়। আত্মা বা চরিত্রের সূত্রে সংবেদনকে ঐক্যবদ্ধ করবার যেমন কথা নেই তেমনি কর্মেরও কোনো নৈতিক সামগ্রিক বন্ধনের প্রয়োজন নেই।

সমালোচনা - (ক) মিলদের অনুষঙ্গবাদী মনস্তত্ত্বটি সঠিক নয়। প্রথমত মন কেবলমাত্র একটি নিষ্ক্রিয় অন্তরেন্দ্রিয় মাত্র নয়। দ্বিতীয়ত গেসটল্ট মনস্তত্ত্বের কাছ থেকে আমরা জেনেছি মন টুকরো টুকরো ভাবে দেখে না,

দেখে পুরোভাবে এক একটি গেস্‌টলটনে অর্থাৎ পরিপূর্ণ বোধে। তৃতীয়ত, কেউ প্রমাণ করেনি যে মন স্বাভাবিক সুখ সন্ধানেই ব্যাপৃত। চতুর্থত, মন সুখ চায় না, প্রয়োজনে বস্তু বা দ্রব্যকে চায়। বস্তু থেকে পরে সুখানুভূতি আসা সম্ভব। যখন ক্ষিধে পায় তখন আমরা খাদ্যদ্রব্যই চাই, তার বিনিময়ে কতোটুকু পরিতৃপ্তি পাব ভাবি না। আমাদের কর্মের সঙ্গে বস্তুর আশা জড়িত। সুখ বাড়তি ফল মাত্র। অধ্যাপক স্টিফেন সঠিক বলেছেন 'We do not seek **pleasure** as such, we seek **Object** which gives us pleasure.'।

মন সুখ চায় না, বস্তু চায়

(খ) হেনরী সিজউইক সুখবাদের আপাত বিরোধ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সুখের জন্যই সুখ ত্যাগ করতে হয়। কর্মের সঙ্গে সুখের এই সম্পর্কটি খুব কৌতূহলপ্রদ। মিল প্রমুখদের মতে একমাত্র সুখই যদি কাম্য হবে তবে সুখটাই আমরা চাইবো, কর্মের সঙ্গে জড়িত বস্তুর কোনো তাৎপর্যই থাকবে না। ধরা যাক, জাতীয় আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী পর্যায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজবন্দীদের কথা। তাঁদের মধ্যে অনেকের ফাঁসী হয়েছে। এমন দেখা গেছে যে ফাঁসীর হুকুমের পর দুঃখ তো দূরের কথা, তাদের দৈহিক ওজন বেড়ে গেছে। মিলদের হিসেব মতো জল্লাদের হাতে মৃত্যু নিশ্চয়ই সুখকর ঘটনা নয়, তবু এঁদের ওজন বেড়ে যাওয়া নামক এতো আনন্দ আসছে কোথা থেকে ?

(গ) ডীন র‍্যাসডাল আরো একটি ভ্রান্তির কথা আশ্চর্যভাবে বলেন। ওঁর মতে কর্মে প্রবৃত্ত হবার আগে থেকেই যদি সুখ সুখ ভাবতে থাকি তবে নিশ্চয়ই তা আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে **কামনা ও কল্পনা থেকেই কল্পিত সুখটি** এসেছে কারণ ধরে কদিন সুখ পাবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করা হয়েছে। অথচ কামনাটি কিন্তু কল্পিত সুখের জন্য তৈরি হয়নি। আমার অভাব বোধ থেকে কামনাটির উদ্ভবের ফলেই সুখের সম্ভাবনার কথা উঠেছে। ওঁর ভাষায় পাচ্ছি "The fact that a thing is desired no doubt implies that the satisfaction of the desire will necessarily bring pleasure. There is undoubtedly pleasure in the satisfaction of all desire. But that is a very different

সুখের কামনা থেকেই সুখ আসে

thing from asserting that the object is derived because it is thought of as pleasant and in proportion as it is thought of as pleasant. The hedonistic psychology involves a **hysteron proteron ;** it puts the cart before the horse. In reality the imagined plesantness is created by the desire, and not the desire by the imagined pleasantness.' অর্থাৎ সুখবাদীরা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ছেন। আগে বস্তু তারপর সুখ।

(গ) সুখ শব্দটি অনেকার্থবোধক। সুখ শব্দটি একই সঙ্গে তৃপ্তির বোধ ও তৃপ্তির বিষয় উভয়কেই বোঝায়। আমরা যেমন সাধারণত কারো ধনজনসম্পদ দেখলে বলি 'ওর কত সুখ'। এই বাক্যে সুখ সম্বন্ধে বোঝাতে চাচ্ছি তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসম্ভার। আবার বৈষ্ণব কবি যখন লেখেন 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল', তখন তিনি বস্তু সম্ভারকে বোঝাচ্ছেন না, বোঝাচ্ছেন অনুভূতির কথা। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদীরা সুখের অর্থটি সঠিকভাবে বলেন না। ফলে তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।

(ঘ) সহজেই বলা যায় যে সুখ একটা অবস্থা যা আমরা মানসিকভাবে চাইতে বাধ্য। এটা প্রকৃতির সত্য সুতরাং তার অস্তিত্ব স্বীকৃত অর্থাৎ যাকে আমরা 'তথ্য' (fact) বলে ধরে নেবো। মূর দেখিয়েছেন কোনো যুক্তিতেই 'তথ্য' থেকে ঔচিত্য আসে না। 'অস্তি' ও 'ঔচিত্যে' প্রচুর বিরোধ। তাছাড়া যদি মানসিকভাবেই আমরা সুখ চাইতেই বিধিনির্দিষ্ট থাকি তবে কর্মে নৈতিকতার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। ব্র্যাডলীর বক্তব্য মতো 'unaccountable' না হলে মানুষের নৈতিক সঙ্কল্পের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়।

৪। নৈতিক সুখবাদ (Ethical Hedonism)

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের ভ্রান্তি অন্যান্য কারণে যাই হোক, আমরা বলছি যে প্রাকৃতিকভাবে নির্দিষ্ট কর্মের যেহেতু স্বাধীনতা নেই তার নৈতিকতাও নেই। নৈতিক সুখবাদের ভিত্তি মনস্তত্ত্বে নেই, কাজেই উপরোক্ত আপত্তিগুলো তার বিরুদ্ধে খাটে না। হেনরী সিজউইক আরো জোরালো ভাষায় জানান যে নৈতিক সুখবাদের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক হেতুবাদের কোনো সম্পর্কই নেই। তবু নানাভাবে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ ও নৈতিক সুখবাদ যে জড়িয়ে গিয়েছিল তার কারণ 'কাম্য'

(desirable) শব্দটিকে নানাভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল এই অপব্যাখ্যার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি লিখেছেন 'The only proof capable of being given that an object is visible, is that people actually see it. The only proof that a sound is audible, is that people hear it. ....In like manner, I apprehend, the sole evidence it is possible to produce that anything is desirable, is that people do actually desire it.'

মিলের এই বক্তব্যে জানা যাচ্ছে 'কাম্য' শব্দটির অর্থ 'শ্রাব্য' ইত্যাদির মতো। অর্থাৎ যা শ্রবণ করা যাচ্ছে, যা দর্শন করা যাচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু 'কাম্য' শব্দটির অর্থ কখনোই এমন নয় যে আমরা বলতে পারবো 'যা কামনা করা যাচ্ছে'। কারণ পৃথিবীতে সব কিছুই কম বেশি কামনা করা হয়। কিন্তু আমরা আলোচনায় বলতে চাচ্ছি কাম্য শুধু কামনা করা যাচ্ছে তাই নয়, তার পেছনে একটা যোগ্যতার কথা থাকছে অর্থাৎ যা বিবেচনায় কাম্য অর্থাৎ যা কামনা করা উচিত। সুতরাং সুখবাদী যখন বলেন সুখই একমাত্র কাম্য, তিনি বলতে চান একমাত্র কামনা করা উচিত। কিন্তু 'কাম্য' শব্দটির অর্থ বিভ্রাটে অনেকে মনে করেছেন যে যেহেতু বস্তুর অর্থ শুধুই কাম্যতা নামক গুণটি, সুতরাং কামনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

'কাম্য' শব্দের অর্থ-বিভ্রাট। নীতিশাস্ত্রে কাম্য —উচিত অর্থে

নৈতিক সুখবাদের বক্তব্য কিন্তু শুধু এইটুকু নয় যে আমাদের সুখ চাওয়াটা উচিত। এই মতে আমাদের সর্বাধিক সুখ চাওয়াটা উচিত। এই মতে আমাদের সর্বাধিক সুখ চাওয়াই কর্তব্য। নইলে ভালোমন্দ বিচারের কোনো মান পাওয়া যায় না। নানাভাবেই সুখ আহরণ করা যায় কিন্তু সর্বাধিক সুখের কথায় সম্ভবত একটি নীতির প্রচ্ছন্ন নির্দেশ থাকে। সুখের পরিমাপে বলা হয় দুটো সর্ত আছে। একটা হলো স্থায়িত্ব (duration) এবং অন্যটি চাপ (intensity)। কোনো ক্ষেত্রে বাছাই করি স্থায়িত্ব দেখে, সঙ্গে বেদনার কথাও ধরতে হয়। সমস্তটাই হিসেব করে জানার ব্যাপার, কী হলে সবচেয়ে বেশি সুখ। গণিতের উদাহরণে জানা যায় আমার তিনটে সুখের মান, ২, ৩ ৪ হলে ৪ কে সব সময়েই ২ ও ৩ থেকে পছন্দ করবো বেশি। আবার ৪ থেকে ২+৩ কে বেশি, তেমনি ৪+৩ কে সবচেয়ে বেশি ইত্যাদি। তেমনি ৪—৩

থেকে ৪—২ কে বেশি বাছবো। কিন্তু ৪—৩ ও ৩—২ এর মধ্যে বাছবার কিছুই থাকে না। তারা সমান সমান।

ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি সুখবাদ দুই জাতের : আত্মসুখবাদ ও সর্বসুখবাদ। আত্মসুখবাদে 'আত্মার' কথা অর্থাৎ নিজের কথাই প্রধান আর সর্বসুখবাদে 'সবার' কথা।

৫। **আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism)**—এই মতে নিজের জন্যেই সর্বাধিক সুখ চাইতে হয় কারণ চাওয়াটাই উচিত বা কর্তব্য। সমস্ত কর্মের পেছনে তাই একটা উদ্দেশ্যই কেবল থাকবে, কেমন করে নিজের জন্য সর্বাধিক সুখ আহরণ করা যায়। নিজের জন্য সুখের ঔচিত্যই সমর্থন করে হেনরী সিজউইক লিখেছেন 'When we sit down in a cool hour and ask ourselves what it is that is good or valuable in itself we find that it must be a pleausurable state of consciousness'। যে-কোনো নৈতিক সুখবাদ সুখের সঙ্গে মল্যকে মেলাবেই মেলাবে। আত্মসুখবাদ তো বটেই। মূল্যের অর্থ প্রয়োজন।

কেবলমাত্র নিজের সুখকেই জীবনের প্রধান মল্য হিসেবে স্বীকার করলে, তাকেই একমাত্র কর্তব্যের সম্মান দিলে কয়েকটি মূল প্রশ্ন ওঠে। মানুষ সমাজে বাস করে, সামাজিক কর্মেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই আত্মপ্রকাশের কর্মে অসংখ্য সম্পর্ক থাকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির। আত্মসুখরত ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের সুখ চাইলে তার স্বার্থ বহুক্ষেত্রে অন্য সবার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে অথবা অন্যদের স্বার্থ তার সুখের পরিপন্থী হবে। তখন সে সমাজকে মঙ্গলময় পরিবেশ মনে না করে, শত্রু মনে করবে। আত্মসুখের তাড়নায় একজন ব্যক্তিই নয়, সবাই একভাবে যেহেতু চলবে, সমাজ বন্ধন নষ্ট হবে, সমাজের ভিত্তি টলে যাবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ মোটেই ধ্বসে পড়েনি, পারস্পরিক আত্মদান ও আত্মোৎসর্গ কিছু কমেনি। কেমন করে তা সম্ভব হচ্ছে?

আত্মসুখবাদের নজীরে হব্স এই প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশ্নটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) মানুষ সমাজের বা প্রকৃতির আইন মানবে কেনো? (খ) মানুষের বিবেচক ও সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে এই আইনের সংযোগ কি? ও (গ) কতোটা এবং কী অর্থে মানুষের স্বভাব সামাজিক? হব্সের জবাবের প্রধান ভিত্তি মনস্তত্ত্ব। সুখকে তিনি প্রায় একটা বেগ মনে করেন যা 'প্রাণদাত্রী কর্ম'কে ('Vital action') সাহায্য করে। আর দুঃখ তাকে বাধা ('hinder-

ing it') দেয়। হব্‌সের মতে, সিজউইক লেখেন, 'each man's appetites or desires are naturally directed either to the preservation of his life, or to that hightening of it which he feels as pleasure.'। হব্‌স অবশ্য সাহজিক সুখ-প্রয়াস ও ইচ্ছাকৃত সুখের মধ্যে তফাৎ করেন না এবং সম্পূর্ণ স্বার্থহীন আবেগকেও আত্ম-সম্পর্কিত কর্মের অঙ্গ মনে করেন।

হব্‌সের মতো ফরাসী দার্শনিক গেসেনডি এই মতকে সমর্থন করেন। ভারতীয় চার্বাকপন্থীদের সম্পর্কেও বলা হয় যে তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের সুখের কথা ভাবতেন। বর্তমান কালের বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক সিজউইক এই মতের সমর্থনে জানান যে পরিপূর্ণ নীতিশাস্ত্রের জন্য আত্মসুখবাদের প্রয়োজন। সিজউইকের মতে আমাদের লক্ষ্য যদি সুখ না দেয় তবে লক্ষ্যের কোনো অর্থই থাকে না। কেনো একটি কাজ করবো বা করবো না এই বিষয়ে মন স্থির করতে হলেই জানা দরকার যে, কাজটি আমার চরিত্রের কোনো দাবিকে পূর্ণ করছে কিনা। কারণ, স্বভাবের নির্ভরতাই তৈরি হয় কোনো-না-কোনো আশা থেকে। **এই আশাই সুখ** এবং সুখই একমাত্র আমার চরিত্রের প্রধান ঝোঁককে চরিতার্থ করতে পারে। কেউ যদি বলে যে, কোনো কাজ করবার বাহ্য কারণ আছে, তবে আমরা জানতে চাইবো কী সেই বাহ্য কারণ। জবাবে যদি বলি কোনো মান্যব্যক্তি বা কর্তৃত্বের নির্দেশ আছে তবে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয় যে শেষ পর্যন্ত কাজটি আমি করবো কেনো? আমি কাজটি নাও তো করতে পারতাম। জীবনে এমন বহু ক্ষেত্র আছে যখন আমরা কর্তৃত্বের নির্দেশ অমান্য করি। প্রশ্নটির একটাই সঙ্গত জবাব হয়। জবাবটি এই যে, এই কাজ করলে আমার স্বভাবের প্রয়োজন মেটে। কাজটি করবার বাসনা আমার মনেই নিহিত আছে। সেজন্যেই একমাত্র আমি করছি বা করতে সম্মত হয়েছি। আর এই বাসনা হলো আমার কর্মের ফল হিসেবে 'সুখ' পাবার আশা।

কাজের সঙ্গে সম্ভাব্য সুখ জড়িত

অধ্যাপক সিজউইকের মতে তাই সুখই যদি কর্মের ভিত্তি হয় তবে, সবচেয়ে সুখকর কর্মই সবচেয়ে বেশি কাম্য। সুতরাং বেশি বা কম সুখের মধ্যে তারতম্য বিচার করে আমি কাজ বাছাই করি। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবতে থাকি কোন্ সুখটি সবচেয়ে বেশি স্থায়ী হবে এবং কোনটা সবচেয়ে কম। সিজউইক

আরো জানান যে সুখের হিসেবে অতীত ও বর্তমান তুল্যমূল্য। সময়ের পরিবর্তনে আমাদের সুখের মূল্য বদলায় না। অতীতের সুখও সুখ, বর্তমানেরও তাই।

আত্মসুখবাদ দু-জাতের হয়। (ক) অসংযত (Gross) ও (খ) সংযত (refined)।

(ক) **অসংযত আত্মসুখবাদ** (Gross Egoistic Hedonism)—অসংযত সুখবাদের প্রধান কথাই হলো সুখ, যেমন ভাবেই হোক-না-কেনো সুখ পাওয়াটাই লক্ষ্য। অসংযত সুখবাদীরা সুখের প্রকারভেদ ও পদ্ধতিভেদ করেন না। কারণ, মাত্রাভেদে সুখের চরিত্র নষ্ট হয় বা বলা চলে বিচারে আমরা সুখের চরিত্রের কথা বিস্মৃত হই। তখন অন্য কথা মনে স্থান পেতে থাকে। সুখটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যেহেতু সুখ একটি মানসিক অবস্থা এবং মানসিক অবস্থার তারতম্যভেদে সুখ বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে না।

অসংযত সুখবাদীরা **যে-কোনো সুখ** এবং **যেমন তেমন করেই সুখ** কথাটির ওপর জোর দেন। তার কারণ তাঁরা জানেন সুখের প্রকৃতি বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে দিলেই লোকেরা বিভিন্ন সুখের মধ্যে পার্থক্যের কথা ভাববে।

সুখের প্রকৃতি জানতে চাইলেই সুখের মূল্য কমে, বিচার শুরু হয়

যেমন কেউ বলতে পারে যে, রসগোল্লা খেয়ে যেমন সুখ ঠিক তেমনটি চাই, আবার কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার সুখের মতো সুখ চাইবে। সেক্ষেত্রে এদের তুলনামূলক বিচারে সুখের সত্তার ওপর বাড়তি মানদণ্ড প্রয়োগ করবার ঝোঁক হবে। তাই গ্রীক দার্শনিক এরিস্টাপ্পস বলেন যে, সুখের আবার রকমভেদ কি? সব সুখই সুখ; দৈহিক কি মানসিক এই বিচারটি অবান্তর। যে পদ্ধতিতেই *সুখ* তৈরি হোক না কেনো, আমার সুখ নামক শারীরিক-মানসিক অবস্থাটাই কাম্য। গুণগত ভাবে সুখের হিসেব না করুন, এরিস্টাপ্পস পরিমাণের ভেদ করেন। বহু সুখের সম্ভাবনার মধ্যে আমাদের বাছাই করতে হলে পরিমাণবর্ধক সুখটিকেই চাওয়া উচিত। যেহেতু তা স্থায়িত্বে কিম্বা তীব্রতায় অনেক বেশি আমাদের আকৃষ্ট করবে।

এরিস্টাপ্পস অবশ্য দৈহিক ও মানসিক সুখের তফাৎ জানেন। তিনি দৈহিক সুখকে ইন্দ্রিয়নির্ভর বলে স্বীকার করেন। যেমন, আমাদের রসগোল্লা খাবার আনন্দ। কবিতা পড়বার সুখ মানসিক। আমরা অনেকে অবশ্য প্রচ্ছন্ন কোন অহমিকার জন্য কবিতা পাঠকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারি কিন্তু এরিস্টাপ্পস

বলেন ইন্দ্রিয় সুখ তীব্র, গভীর ও উত্তেজক। তার বেগ অনেক বেশি মর্মমূলকে নাড়া দেয়। তুলনায় কবিতাপাঠের সুখ অনেক নিম্ন স্তরের কারণ তার জ্বালা নেই, উত্তেজনা নেই। কবিতাপাঠের ফলশ্রুতিতে সুখের চরিত্র নির্জীব, ম্লান ও স্থির। সুতরাং জীবনে যদি সুখই চাইবো তবে তীব্রতা ও বেগকেই কামনা করা উচিত। ইন্দ্রিয় সুখের জন্যই আমাদের তাই চেষ্টিত হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয় সম্ভোগকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে এরিস্টাপ্পস সর্বকালের অসংযত সুখবাদীদের গুরু হয়ে রইলেন।

অধিক সুখ জীবনের কাম্য, আত্মসুখ সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মসুখ ইন্দ্রিয় সম্ভোগে, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের চর্চাই স্বাধীন কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরিস্টাপ্পসের এই মত চূড়ান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক কারণ তিনি ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নৈতিকভাবে তখন সব-কিছু করতে প্রস্তুত। ভারতীয় চার্বাকপন্থীরা তাই বলতেন বনের দশটা পাখির চাইতে হাতের একটা পাখিও অনেক বেশি মূল্যবান। অর্থাৎ যখন যেমন যে-সুখ হাতের মুঠোয় আসছে তাকেই গ্রহণ করা উচিত। সুখকে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখলে আর তার স্বাদ জীবনে মেলে না। কাজেই সুখকে শুধু লুফে নিতে হয়। সিজউইকের ভাষায় এরিস্টাপ্পসের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিলো, যেনো আইনের ঝামেলায় না পড়েন এবং যতোক্ষণ পড়বেন না ততোক্ষণ সুখের সন্ধান করে যাবেন। 'Among the prejudices from which the wise man was free he included all regard to customary morality beyond what was due to the actual penalties attched to its violation'। ওঁর মতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ হলো তিনি প্রচলিত নীতির কিছুই মানেন না।

এপিকিউরস স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে সুখই একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য, দুঃখের সম্ভাবনা থাকলেই একমাত্র সুখকে পরিত্যাগ করা যায় ; কোনো দুঃখকে বরণ করা উচিত নয়, যদি না তা থেকে বৃহত্তর সুখের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সমস্ত নৈতিক কর্মই অর্থহীন ও শূন্য, একমাত্র বিষয়ীর জীবনে সুখ সম্পাদন ছাড়া। সিজউইক ব্যাখ্যা করে দেখান যে এপিকিউরস 'means by pleasure what plain men mean by it ; and that if the gratifications of appetite and sense are discarded, the notion is emptied of its content.' অর্থাৎ এপিকিউরস দেহকে অস্বীকার করছেন না। ইন্দ্রিয় সম্ভোগকে যথেষ্ট মূল্য দিচ্ছেন।

তবে অসংযত সুখবাদীদের সঙ্গে তাঁর তফাতটা এই যে, তিনি অভাব মেটাকে স্বাভাবিক জীবনের ভিত্তি মনে করেন অর্থাৎ ওঁর মতে অভাববোধ দূর হলে মনের প্রশান্তি ফেরে। দ্বিতীয়ত, যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, দেহই হচ্ছে মৌলিক ও সমস্ত সুখের উৎস, তবুও মানসিক সুখকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন কারণ, 'Owing to the accumulation of feeling caused by memory and anticipa tion.' এপিকিউরস মানতেন যে কখনো কখনো দুঃখ দৈহিক ভাবে সুখের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু তার স্থায়িত্ব দূরপ্রসারী নয়। কিন্তু মনের ক্ষেত্রে সব সময়েই মনের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, একমাত্র যদি মনকে ভবিষ্যতের ভয় থেকে মুক্ত রাখা যায়। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে। এই প্রসঙ্গেই তিনি স্বীকার করেন 'The blessed and incorruptible has no troubles of his own, and causes none to others ; it is no subject to either anger or favour.' এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে যে, এপিকিউরস যতোই আত্মসুখবাদের কথা বলে থাকুন, মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি আশাই দর্শনের প্রাণ এবং ওঁর সাধু ও সংযক্ত ব্যক্তিটি শুদ্ধ চরিত্রের লোক হতে পারেন। তিনি নিজে প্রশান্ত থাকায় অন্যের অসুবিধের কারণ হন না।

সমালোচনা—(ক) আত্মসুখবাদের মনস্তাত্বিক ভিত্তিট ভ্রান্ত। কোনো মনস্তত্বই এমন কথা প্রমাণ করেনি যে মানুষ কেবল মাত্র নিজের সুখ চাইবেই চাইবে। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় আমরা অন্য উদাহরণের অভিজ্ঞতা সর্বদাই পাই। যেমন মা সন্তানের জন্য নিজের সুখ বর্জন করেন। আত্মসুখবাদীরা অবশ্য বলতে পারেন যে, আশু সুখটি ছেড়ে মা আরো বেশি সুখকে খুঁজছেন সন্তানের আনন্দের মধ্যে। কিন্তু এই বক্তব্যে দুটি ভুল থাকে। প্রথমত, মা সচেতনভাবে ভবিষ্যতের আনন্দের কথা ভেবে কাজটি করেন না, তিনি স্বভাবতই সন্তানকে সুখ ছেড়ে দেন নিজে দুঃখ নিয়ে। যদি তিনি সচেতন ভাবে নিজের তৃপ্তির কথা নাও ভাবেন, তবু কাজটি বিনা দ্বিধায় করেন। দ্বিতীয়ত, মা সন্তানের জন্য যখন কিছু ত্যাগ করেন তখন ত্যাগ করেন বস্তুটি, সুখ নয়। ওই বস্তু থেকে ভবিষ্যতে সুখ আসতে পারে, কিন্তু বর্তমানে বস্তুটিই প্রধান লক্ষ্য। সুখবাদের স্ববিরোধটাই (paradox of hedonism) এই যে, সুখের জন্য সুখকে ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং মনস্তাত্বিক ভাবে সবাই সুখ খুঁজতে বাধ্য, এমন কথা নিতান্ত অর্থহীন।

(খ) ওপরের বক্তব্যের সূত্রেই আমরা বলতে পারি যে, আত্মসুখবাদীরা 'সুখ' ও 'সুখাদি' অর্থাৎ বস্তুনিচয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন। আমরা আমাদের কর্মের ফল হিসেবে সুখ পেলে খুশি হই, সিজউইকের বক্তব্য মতো কর্মের পেছনে সুখের আশা একটা মস্তোবড়ো প্রেরণা—কিন্তু কার্যকালে আমরা লক্ষ্য করি কর্মকে, উদ্দেশ্যকে। উদ্দেশ্য পূর্তির পর সম্ভাব্য মানসিক অবস্থা কেমন হবে এ-কথা তখন অনুপস্থিত থাকে। যেমন একটি চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে ভাবি না আমি কতোটুকু সুখ বা দুঃখ পাচ্ছি। তখন ছবি দেখাটাই লক্ষ্য। ছবি দেখতে যাবার আগেও ভেবে যাই না যে কী পরিমাণ সুখ বা দুঃখ সংগ্রহ করে আনবো। ছবি দেখার পর মনের ভাবকেই সুখ বা দুঃখ নাম দিতে পারি। সুতরাং আত্মসুখবাদী কর্মে এরিস্টাপ্পস বা এপিকিউরস কেউ বলতে পারেন না যে আমি পূর্বেই কর্মের চরিত্র জানি ও তা থেকে সম্ভাব্য ফলাফলটুকু নির্ধারণ করে বসে আছি।

(গ) আত্মসুখবাদ আমাদের কোনো নৈতিক মানদণ্ড দেয় না। প্রতিটি ব্যক্তিই স্বভাবত সুখ চাইছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের ফারাকে তাদের সুখ পারস্পরিক ভাবে সম্পর্কিত হয়, অর্থাৎ কে যে কোন্ বস্তু থেকে কী সুখ পাচ্ছে এবং কতোটুকু পাবে বা আদৌ পাবে কিনা তা জানবার উপায় থাকে না। সমস্ত কিছু বিচারের মানদণ্ড তৈরি করে ব্যক্তিবিশেষ। কাজেই যে সুখে কেবল মাত্র 'আত্মই' লক্ষ্য, তা থেকে সামান্য মান (যেখানে অন্যদের কথাও ভাবা হচ্ছে) তৈরি করা যায় না।

(ঘ) আত্মসুখবাদ সমাজের চরিত্র বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে। সমাজকে তারা মনে মনে সম্ভবত বহুব্যক্তির প্রাণহীন যান্ত্রিক সম্পর্ক মনে করে। ব্যক্তিরা কেবল যেনো যন্ত্রের নিয়মের মতোই সুখ খোঁজ করে চলবে। অন্যের কথা ভাববে না। অথচ আমরা জানি, সমাজ স্বাধীন ব্যক্তির মৌল প্রতিষ্ঠান, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্কটাই একমাত্র সত্য। পারস্পরিক সম্পর্কে দেওয়া-নেওয়া থাকে, আদান-প্রদান ও গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেই সমাজের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। ব্যক্তিদের শুধুমাত্র স্বার্থের এক-একটি কেন্দ্র বললে সমাজের ভিত্তি বা সংজ্ঞার স্বরূপ-সম্পর্কটিই নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া কার্যত ওঁরা যতোই আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি ও আত্মস্বার্থের কথা বলুন, সমাজ কখনোই শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত নয়। তাহলে আমরা হব্‌সের জগৎটি পেতাম—যেখানে সবাই স্বাধীন ও সবাই নিজের মতো চলে। সুতরাং হানাহানিই সেই প্রাকৃতিক অবস্থার একমাত্র সত্য। কেউ কারো কথা ভাবেনা। অথচ আমাদের সমাজটি তা নয়।

(ঙ) আত্মসুখবাদের নৈতিক চরিত্র নগণ্য। কারণ, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ও দেহকে এই মতবাদে এতোই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষের মনটি আড়ালে থাকছে। অথচ আমরা জানি, মানুষ পশু নয় এবং নয় বলেই মনের স্বাতন্ত্র্য মেনে, বুদ্ধি-বিবেচনার পথে চলে। কিন্তু শুধুই দৈহিক সুখ চাইলে মনের প্রাধান্য থাকে না। আর যে কর্মে মনের স্বাধীনতা, তাকে আমরা দৈহিক কর্ম বলে স্বীকার করতে চাইনি। এপিকিউরস অবশ্য মনের কথা বলেছেন ; কিন্তু তিনিও নৈতিক কর্মে দেহকে মৌলিক ও উৎসস্বরূপ বলেছেন।

সর্বসুখবাদ (Altruistic, Universalistic Hedonism বা Utilitarianism)

(ক) বেন্টাম, মিল ও সিজউইক সুখবাদকে গ্রীক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহত্তর দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা জানান যে সুখনিচয়ই কর্মের লক্ষ্য এবং সুখপরিপোষক কর্মেই চরিত্রের স্থিতি ; তবু সুখের সঙ্গে নিছক একটি মাত্র ব্যক্তির যোগ নেই, যোগ সবার। কারণ পৃথিবীতে মাত্র একটি লোকের বাস নয়, অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে অসংখ্য সম্পর্কে তাকে বাঁচতে হয়। সুতরাং আত্মসুখই আমাদের লক্ষ্য নয় ; আত্মসুখের সমগ্র পটটি আমাদের প্রয়োজন থাকে। বলা চলে তা হচ্ছে সর্বসুখ বা সর্বসাধারণের সুখ। পৃথিবীতে যতো বেশি সংখ্যক লোকের সুখবৃদ্ধি হবে ততোই আমাদের সবার লক্ষ্য সিদ্ধ হবে। সুতরাং নৈতিক কর্মের লক্ষ্যই হবে সর্বসুখবাদ। অনেকে সর্বসুখবাদকে উপযোগিতাবাদও বলেন। 'অলট্রুয়িস্টিক' শব্দটির অর্থ পরকেন্দ্রিক ও 'হেডোন' শব্দটির অর্থ সুখ। সুতরাং শব্দটির মোট অর্থ 'পরের জন্য সুখ'। যে-কর্মে অন্যের সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে (সঙ্গে সঙ্গে আমারও) তাকেই সর্বসুখবাদ ('বৃহত্তম সংখ্যার জন্য বৃহত্তম সুখ') বলা হয়।

(ক) **বেন্টাম**—ইংরেজী উপযোগিতাবাদের গুরু জেরেমি বেন্টাম ব্যক্তিগত নৈতিক কর্ম বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর সমস্ত চিন্তাই ছিলো সরকারী আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে কেমন করে সবার উপকার করা যাবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা থেকেই তিনি ব্যক্তিকে ছেড়ে জনতাকে ধরেন। গোড়াতেই তাই নৈতিকতার ব্যাখ্যা দেন 'Morality is the art of directing men's actions to the production of the greatest quantity of happiness, on the part of those whose interest is in view.' অর্থাৎ নৈতিকতা হলো একটি প্রয়োগকৌশল বা কলা—যার

দ্বারা সর্বাধিক সুখ আহরণ করা যাবে। নৈতিকতার নীতি বেণ্টামের মতে 'উপযোগিতা। বেণ্টাম উপযোগিতার ব্যাখ্যা দেন 'By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question.' কার্যত বেণ্টাম বলছেন কর্মের তাৎপর্য বিচার হবে ফলাফল দ্বারা।

বেণ্টামের কাছ থেকে আমরা জানতে পারছি ন্যায্য কর্মের একটি তন্নিষ্ঠ (objective) মান আছে। অর্থাৎ কে ন্যায্য ভাবছে বা ভাবছে না তাতে কিছু আসে-যায় না। কর্মের চরিত্র নির্ভর করে ফলাফলের ওপর। দ্বিতীয়ত, বেণ্টাম প্রত্যক্ষ ফলাফলের কথা বলেন, ফলাফলের ধারণার কথা তোলেন না।

ন্যায়ের প্রসঙ্গে বেণ্টাম বলছেন, প্রত্যেকের সুখ কামনা করাই উচিত এবং সবার সুখ ও একজনের সুখে কোনো বিরোধ নেই। বেণ্টাম কর্মের চরিত্র বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত সুখ-দুঃখের দ্বৈত নীতি বিষয়ে লেখেন 'Nature has placed men under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do··· We owe to them all our ideas, we refer to them all our judgments, and all the determinations of our life. He who pretends to withdraw himself from this subjection knows not what he says.'

বেণ্টাম এই সুখ বা উপযোগিতার ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক সুখে কোনো গুণগত তফাত করেন না। ওঁর কাছে চুলের কাঁটা ও কবিতা তুল্যমূল্য। অর্থাৎ তিনি সুখের বিচার করেন পরিমাণের দিক থেকে। ওঁর মতে পরিমাণের বিভিন্ন বিচার সম্ভব। তিনি বিচারের ৭ টি মান স্থির করেছেন। (১) তীব্রতা (intensity), (২) স্থিতিকাল (duration), (৩) সন্নিকর্ষ (proximity), (৪) নিশ্চিতি (certainty), (৫) শুদ্ধতা (purity—যন্ত্রণা বা দুঃখ থেকে মুক্তি), (৬) উর্বরতা (fecundity) ও (৭) বিস্তার (extent)।

তীব্রতা—সুখকে পরিমাণবাচক বলায় বেণ্টামকে পরিমাণের মাত্রা ভেদে তীব্রতার ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো একটি সুখ তার আকস্মিকতার

ধাক্কা ও বেগে, আনন্দের চাপে এমন তীব্র হতে পারে যে অন্যান্য সমস্ত কিছু মনোভাবকে চাপা দিতে পারে। যেমন ধরা যাক আমার মতো দরিদ্র লোক ৫ লক্ষ টাকার একটি লটারী জিতে গেলো। এই সংবাদটি নিশ্চয়ই রাস্তায় দু টাকা কুড়িয়ে পাবার মতো নয় বা মাইনেতে ৫ টাকা বাড়ার মতোও নয়। এসব সংবাদে আমার কোনো মানসিক পরিবর্তন ঘটে না কারণ আমি তাতে অভ্যস্ত। কিন্তু ৫ লক্ষ টাকা আমার জীবনে এমন একটা অসম্ভব ঘটনা যে তার ধাক্কা সামলানো মুশকিল। সুতরাং সুখের তীব্রতা-ভেদ আছে।

স্থিতিকাল—সুখের স্থিতিকাল এক হতে পারে না। যেমন আমাদের ওপরের উদাহরণে ৫ লক্ষ টাকার সুখ এক মুহূর্তে যেমন তীব্র তার স্থায়িত্ব দীর্ঘকালব্যাপী। কিন্তু কোনো একদিন কোনো বাড়ীর ভোজ আমার মনে সাময়িক সুখ তৈরি করে মাত্র। সুখের স্থিতিকাল শুধু দৈহিক আনন্দের সঙ্গেই জড়িত নয়, মানসিক ভাবেও তা সত্য।

সন্নিকর্ষ—বেণ্টাম এরিস্টাপ্পসের মতোই জানান যে, দূরের সুখ থেকে কাছের সুখ অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ দূরের সুখ শুধুমাত্র সম্ভাবনা। তা থেকে সুখ পাওয়া যেতে পারে, না-ও পারে। তাছাড়া নিকটবর্তী সুখের সন্নিকর্ষতায় মনের আবেগ উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমান তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ।

নিশ্চিতি—যে-সুখ যতো বেশি নিশ্চিত সে-সুখ ততো বেশি কাম্য। যেহেতু নিশ্চিতি থেকে আমার দুঃখের সম্ভাবনা দূর হয় আর অনিশ্চিত সুখের সন্ধানে দুঃখের সম্ভাব্যতা দূর করা যায় না।

শুদ্ধতা—বেণ্টামের কাছে শুদ্ধতার অর্থে গুণের প্রসঙ্গ নেই। সাধারণত আমরা শুদ্ধতা মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি এবং শুদ্ধতা প্রত্যয়টির সঙ্গে নানা মান জড়িয়ে থাকে। বেণ্টাম শুদ্ধতায় কোনো বড়ো অর্থ আরোপ করেননি। তিনি শুদ্ধতা বলতে অবিমিশ্র সুখ বুঝছেন, যাতে কোনো দুঃখের মিশ্রণ নেই। অর্থাৎ নির্জলা সুখই শুদ্ধতা। দুঃখের সামান্য খাদে সুখের শুদ্ধতা নষ্ট হয়। তখন মানসিক আবেগটি অখণ্ডভাবে মনে বিরাজ করে না। বেণ্টামের মতে তাই ন্যায্যত পূর্ণতাই শুদ্ধতা।

উর্বরতা—যে সুখ কেবলমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যে-সুখ নিজের সঙ্গে শাখা প্রশাখায় আরো অন্য সুখের সৃষ্টি করে, তাকেই বেণ্টাম উর্বরতা বলেন। সুতরাং সর্বদাই উর্বর সুখ মানুষের কাম্য হওয়া উচিত।

বিস্তার—বেণ্টাম বিস্তার কথাটিকেও বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। জড়ের ক্ষেত্রে বিস্তার বলতে বোঝায় স্থানব্যাপ্তি। অর্থাৎ বস্তু যতোটুকু স্থান জুড়ে থাকে তাকেই তার বিস্তার বলা হয়। কিন্তু সুখ জড়বস্তু নয় যে, স্থান জুড়ে থাকবে। সুতরাং বেণ্টামকে একটি ব্যাখ্যা দিতে হয়। সামাজিক ঘটনার স্থানব্যাপ্তি না-থাকায় বেণ্টাম বলেন যে, সুখের বিস্তার হলো 'যা অধিকাংশ লোকের মনে ছড়ানো থাকে'। একটি মাত্র ব্যক্তিতেই আবদ্ধ যে-সুখ তা একটি মাত্র কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ, তা থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে সুখটির কোনো প্রয়োগ নেই। এই অর্থে বেণ্টাম বিস্তার শব্দটি চমৎকার ব্যবহার করেন; কারণ ব্যক্তি বিশেষকে ধরলে স্থান ব্যাপ্তি তৈরি হতে পারে। বেণ্টামের মতে যে-সুখ ব্যাপ্ত, বহু ব্যক্তিতে বিস্তৃত, তাকেই আমাদের কামনা করা উচিত।

বেণ্টামের এই বক্তব্য থেকেই আত্মসুখবাদে পার্থক্য বোঝা যায়। আত্মসুখবাদের বিস্তার নেই, পরসুখবাদ ব্যাপ্ত হতে পারে। আত্মসুখবাদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সর্বসুখবাদ মানুষকে অনেকটা মুক্তি দেয়।

সুখের পরিমাণবাচক এই সাতটি মানকে '*সুখবাদের ধারাপাত*' (Hedonistic calculus) বলা হয়।

বেণ্টামের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের যোগ আছে। পূর্বেকার উদ্ধৃতিতে দেখা যাবে যে, বেণ্টাম বলছেন আমরা মনে মনে সুখ-দুঃখের অধীন। বেণ্টামের ভাষায় তারা 'স্বরাট' (sovereign)। তাদের নির্দেশ ও পরিচালনাতেই আমরা চলি। সুতরাং শুরু থেকেই সুখ দুঃখ যদি আমাদের কর্ণধারণ করে থাকে, তবে প্রশ্ন ওঠে তাদের উচিত বলবো কেনো? বেণ্টামের মতে **আমরা যেহেতু সুখ চাই,** সুতরাং আমাদের **সুখ কামনা করা উচিত।**

বেণ্টাম তাঁর 'সুখবাদী ধারাপাত'কে অত্যন্ত মূল্য দেন। কারণ ওঁর মতে উপযোগিতা অনুসন্ধান করাই জীবনের লক্ষ্য বা নৈতিকতা। উপযোগিতাই সুখ; বেণ্টাম তাই মনে করেন যে হিসেব করে জীবনকে পরিচালনা করতে হয়। দুঃখ থেকে সুখকে তফাত করে যতোদূর সম্ভব সুখকেই বরণ করতে হয়। তিনি লেখেন 'Weigh pleasures and weigh pains, and as the balance stands, will stand the question of right and wrong'। বেণ্টাম যদিও আত্মসুখবাদ থেকে তফাতে সরে এসে সর্বসুখবাদে দাঁড়িয়েছেন, তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি মানুষের 'আত্ম' বা 'অহং'কেই জীবনে কর্মের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ওঁর মতে 'To

obtain the greatest portion of happiness for himself is the object of every rational being. Every man is nearer to himself than he can be to any other man ; and no other man can weigh for him his pleasures and pains ··His interest must, to himself, be the primary interest'. বেণ্টামের মতে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে নিজের স্বার্থই প্রাথমিক লক্ষ্য। এই প্রাথমিক স্বার্থবোধের সঙ্গে জড়িয়েই তার কর্ম স্থিরীকৃত হয়। বেণ্টামের বক্তব্যে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যখন আমরা পড়ি যে, তিনি কেবল নিজের স্বার্থ নিজের কাছে বলেই থামেননি, তিনি লিখেছেন, স্বপ্নেও মনে কোরোনা কেউ তোমার জন্যে ক'রে আঙুলটি নাড়বে। 'Dream not that man will move their little finger to serve you, unless their own advantage in so doing be obvious to them. Men never did so and never will, while human nature is made of the present materials. But they will desire to serve you, when by so doing they can serve themselves'.

এবারে অবশ্য প্রশ্ন উঠবে যে, বেণ্টামে এই যে দ্বন্দ্ব, আত্মবাদ ও সর্ববাদে যে-ফারাক, তাকে তিনি কি কৌশলে মেটান? বেণ্টাম জবাব দেবার চেষ্টা করেন তাঁর 'নৈতিক মঞ্জুরীতত্ত্বে' (Moral sanctions)। বেণ্টাম কর্মের পেছনে চার রকমের সমর্থন ও মঞ্জুরী দেখেছেন। (ক) সামাজিক, (খ) রাষ্ট্রীয়, (গ) ধর্মীয় ও (ঘ) প্রাকৃতিক। বেণ্টামের মঞ্জুরীতত্ত্বের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা জড়িত। অর্থাৎ যিনি মঞ্জুর করেন তিনি কেড়েও নিতে পারেন। কোনো কর্মে তাঁর সমর্থন থাকলে, বিধিনিষেধও আছে। যেমন সামাজিক মঞ্জুরী বলতে বোঝায় সমাজ যা যা সমর্থন করে বা যে কর্ম করতে বাধা দেয় না। অথচ ব্যক্তি যদি তার মঞ্জুরীর সীমা লঙ্ঘন করে তবে সমাজ তাকে বাধা দেবে, দরকার হলে শাস্তিও দেবে। সুতরাং সামাজিক শাসনের ভয়ে ব্যক্তি সামাজিক মঞ্জুরীর সীমা পেরোয় না। একই রকমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও ব্যক্তি শাস্তির ভয়ে রাষ্ট্রীয় মঞ্জুরীর সীমা লঙ্ঘন করে না।

ধর্মের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি পাপ পুণ্যের। যেমন আমরা ভারতীয়রা ভাবি এ জন্মের সুকৃতিতে পরজন্মে ভালো ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং সেই মতো আমরা ভবিষ্যতের আশায় ধর্মের অনুশাসনের মধ্যেই কাজ করি। ধর্মের চাপে নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থেই সব সময় চালিত হই না, অন্য সবার কথাও ভাবি।

প্রাকৃতিক নিয়মকে নৈতিকতার প্রসঙ্গে তোলায় আপত্তি হতে পারে এই যে, স্বাধীন কর্ম ছাড়া যেহেতু কর্ম নৈতিক হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন কার্যাবলী নৈতিক নয়। বেণ্টাম প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বীকার করেন, কারণ তিনি সুখের পরিমাণ ও দেহ বিষয়ে চিন্তা করেছেন, কেবলমাত্র মনের জন্য মাথা ঘামান নি। কাজেই শরীরধর্মের সঙ্গে সুখের গভীর যোগ আছে। শরীরধর্ম আবার সম্পূর্ণই নির্ভর করে প্রকৃতির নিয়মের ওপর। ফলে, প্রকৃতির মঞ্জুরী নিছক আত্মপরায়ণতা থেকে পরার্থে আমাদের ঠেলে দিতে পারে। যেমন পঞ্চাশটা রসগোল্লা একা খাওয়া যদি আমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই জমা করতে পারি বা অন্যকে দিতে পারি। শারীরিক নিয়মে খেতে পারলে বা প্রাকৃতিক নিয়মে রসগোল্লাগুলো নষ্ট না হয়ে গেলে আমি নিশ্চয়ই কাউকে রসগোল্লার ভাগ দিতাম না। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হওয়ায় দিতে বাধ্য হলাম।

বেণ্টামের বক্তব্য অনুযায়ী এইসব বহিঃস্থিত মঞ্জুরী ও মঞ্জুরীর সঙ্গে জড়িত বিধিনিষেধগুলোই আত্মস্বার্থের মধ্যে সর্বসাধারণের কল্যাণ বিষয়ক চিন্তা এনে দিচ্ছে।

সমালোচনা—বেণ্টামের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সর্বপ্রধান দুটি আপত্তির প্রধানটি হলো এই যে, তিনি 'অস্তি' (is) ও 'ঔচিত্য' (ought)-কে গুলিয়ে ফেলেছেন। অস্তি হলো যা আছে এবং ঔচিত্য হলো যা থাক-বা-না থাক করা উচিত। ফরাসী পণ্ডিত হ্যালেভি চমৎকার লিখেছেন, 'That he had discovered in the principle of utility a practical commandment as well as a scientific law, a proposition which teaches us at one and the same time what is, and what ought to be'. কিন্তু ঘটনাটা কখনো তা নয়। কারণ, একজন যা ইচ্ছে করে তা-ই উচিত হতে পারে না। বেণ্টাম বলছেন যে, আমরা সুখ-দুঃখ নামক দুটি কর্তার অধীন এবং এটাই প্রকৃতির আদি নিয়ম যে, আমরা কেবল সুখ চাইবো। বেণ্টামের বক্তব্য সত্য হলে আমাদের স্বভাবের গঠন থেকেই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই। স্বভাবজাত কর্মের কিন্তু ভালোমন্দ নেই কারণ তা স্বাধীন বিবেচনাপ্রসূত কর্ম নয়, যা আমরা বাছাই করেছি বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে। আমাদের স্বভাব ওঁর মতে প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং স্বাধীন কর্মের প্রশ্ন ওঠেই না। এই নিয়মের অধীনে আমরা সুখ চাইছি, কারণ

আমরা চাইতে বাধ্য। কাজেই এই মনোভাবটি জীবনের ভিত্তি। যা জীবনের ভিত্তি তা আছে এবং সত্য হিসেবেই আছে। কাজেই তার উচিত-অনুচিত নেই। বেণ্টামের বক্তব্যের ফাঁক জেম্‌স মিলের কাছে ধরা পড়েছিলো। তাই তিনি 'যা আছে' ও 'যা হওয়া উচিত' কে মেলাবার জন্য লেখেন 'No reason can be given why the general happiness is desirable, except that each person, so far as he believes it to be attainable, desires his own happiness'. অর্থাৎ তিনি বেণ্টামের প্রাকৃতিক কার্যকারণ মানলেও বলছেন সবার সুখ কেনো যে চাওয়া উচিত তা তিনি জানেন না, তবে এটুকু জানেন যে সবাই তা চায়। জেম্‌স মিলের বক্তব্যেও অনেক ত্রুটি, তবু বেণ্টামের বক্তব্যের যুক্তিহীনতা শিষ্য জেম্‌স মিলের কাছে প্রকট।

(খ) বেণ্টাম প্রকৃতির নিয়ম মেনে মানুষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আত্মসুখবাদী করায় প্রায় হব্‌সের মতো কথা বলছেন। হব্‌স ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মপরায়ণতার কারণে আত্মসুখ চাইবেই চাইবে। বাটলার তাই চমৎকার দেখান যে আত্মবাদের প্রাথমিক ভুল হচ্ছে সুখের বস্তু ও সুখকে এক করে দেখা। অথচ আমাদের এমন অনেক আবেগ আছে যা হঠাৎ প্রকাশ পায় অথচ তাদের পেছনে সচেতন কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। আবার যদি সচেতন লক্ষ্য না থাকে তবে সুখই একমাত্র বিবেচ্য হয় না।

(গ) বেণ্টাম সুখের গুণ বিষয়ে চিন্তিত নন। তিনি কেবলমাত্র পরিমাণের কথা ভাবেন এবং সেজন্যেই হিসেবের যে ধারাপাতটি (calculus) তৈরি করেছেন তার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের কোনো যোগ নেই। বেণ্টাম যদিও মনস্তত্ত্বের ওপর দাঁড়ান তবু লক্ষ্য করেন না যে মানুষের মন শুধু পরিমাণেই সুখের পরিমাপ করে না, গুণের কথাও ভাবে। রসগোল্লা খাবার সুখ ও সারারাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় মার্গসঙ্গীত শুনবার সুখ একজাতের নয়। রসগোল্লা খাবার ক্ষেত্রে শারীরিক ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তির বোধ থাকে, কিন্তু গান শোনার ক্ষেত্রে সবটাই শারীরিক অসুবিধে। শীতের রাতে সমস্ত সময় দাঁড়িয়ে থাকা বা রাস্তায় বসে থাকা নিশ্চয়ই সুখকর নয়। অথচ সঙ্গীত-প্রেমিকরা থাকেন ও সুখ পান। এই সুখটি কখনোই শারীরিক নয়।

দ্বিতীয়ত, বেণ্টাম সুখ পরিমাপের ধারাপাতের কথা তুলেছেন। যেহেতু তিনি পরিমাণের কথাই বলেন, সেহেতু পরিমাণ মাপার দাঁড়িপাল্লা নিশ্চয়ই

ভাবতে পারেন, কিন্তু পরিমাণের বাইরে যে-সব অনুভূতি থাকে তা বেণ্টামের 'যন্ত্রে' ধরা পড়ে না। ধারাপাতটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারেও মার্গসঙ্গীত প্রেমিকের হৃদয়াবেগ হিসেব করা যাবে না।

(ঘ) বেণ্টাম দৈহিক কেন্দ্র হিসেবে মানুষে মানুষে সুখবিস্তৃতির কথা বলেছেন। ওঁর মতে এমন সুখ আমাদের কামনা করা উচিত, যা অন্যদের মনেও সাড়া তুলবে। যেমন ধরা যাক, আমি ভোজনবিলাসী এবং আমাকে খাইয়ে আমার পিসীমা তৃপ্তিবোধ করেন। এক্ষেত্রে বেণ্টাম বলবেন সুখের বিস্তৃতি ঘটবে। কিন্তু একটু নজর করলেই দেখা যাবে যে, সুখের বিস্তৃতি তখনই ঘটে, যখন সুখের উৎস শারীরিক না থেকে মানসিক হয়। যেমন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি বা 'শেষলেখার' কবিতাবলী সারা বাঙলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত হতে পারে এবং লোকদের তৃপ্তি দিতে পারে। বেণ্টামের অসুবিধে এই যে, তিনি কেবল শারীরিক প্রক্রিয়ার কথা ভাবায় সুখ-বিস্তৃতিকে এই ছোট্ট কেন্দ্রেই আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। বোঝেননি যে সুখ-বিস্তৃতির জন্য মনটাই আসল। মনেই মহত্ত্ব এবং মনেই তার বিস্তার। গুণগত ভাগ স্বীকার করলে বেণ্টাম বুঝতে পারতেন যে, শরীর-মনে যদিও অচ্ছেদ্য যোগ আছে তবু মন নিজের নিয়মে চলে। তার ভালোমন্দের প্রসঙ্গ ও ক্ষেত্র সবটাই শরীর তৈরি করে না।

(ঙ) বেণ্টাম নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণে বাইরের চাপের ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু আমরা যে-হেতু দেখছি যে, মানুষের স্বাধীন কর্মেই নৈতিকতার প্রশ্ন, মানুষের সচেতনতা বাদ দিলে চলে না। কর্মের সবটাই যদি বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে মনের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া দরকার। কিন্তু মন বেণ্টামের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আছে এবং সবটাই সে গ্লকন বা এডিম্যানটাসের বক্তব্যের মত লোভ বা ভয়ে চালিত নয়। যদি সত্যি সত্যিই গ্লকনদের কথা সত্যি হয়, তবে প্লেটোর সুবিখ্যাত 'প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যটিই ভুল যে, মানুষকে হতে হয়, হয়ে ওঠাতেই তার পরিপূর্ণতার কথা থাকে। শুধুমাত্র ঘুষের লোভ বা ভয়ে কাজ হয়তো করা যায়, তাতে স্বাধীন মনুষ্যত্বের ছাপ থাকে না। কারণ, সেই বাধ্য-বাধকতা তখন প্রায় প্রকৃতির নিয়মের মত মানুষকে কর্মে বাধ্য করে। অথচ নৈতিক কর্ম কখনোই 'বাধ্য' কর্ম নয়, মানুষের স্বেচ্ছামূলক সচেতন কর্মই নৈতিকতার বিষয়।

মিল : সর্বসুখবাদ (Mill's Altruism)

বেন্‌থাম বলেছিলেন, আমরা সুখ-দুঃখের দ্বৈত কর্তৃত্বে বাঁচি ; এটাই জগতের নিয়ম। সুতরাং আমরা সুখ বা দুঃখ চাইতে বাধ্য। আর জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন 'Pleasure and freedom from pain, are the only things desirable as ends ; and····all desirable things····are desirable either for the pleasure inherent in themselves, or as means to the promotion of pleasure and the prevention of pain.' অর্থাৎ মিল বলছেন জীবনের লক্ষ্য হিসেবে সুখটাই একমাত্র কাম্য। সুখকর বস্তু যে আমরা চাই তার কারণ তাদের অন্তর্নিহিত সুখ দেবার ক্ষমতা অথবা তারা সুখ পেতে সাহায্য করে।

মিল অন্যত্র আবার ব্যাখ্যা করেছেন যে 'Desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful are phenomena entirely inseparable....in strictness of language, two different modes of naming the same psychological fact : to think of an object as desirable (unless for the sake of its consequences), and to think of it as pleasant, are one and the same thing ; and to desire anything, except in proportion as the idea of it is pleasant, is a physical and metaphysical impossibility.' মিল জানাচ্ছেন যে, একটা জিনিসকে যখন আমরা চাই তার অর্থই হলো সে আমাদের খুশি করতে পারবে। তেমনি যখন জিনিসটি পছন্দ করি না তার অর্থ ওটা থেকে নিরানন্দ ঘটবে। এই পছন্দ বা অপছন্দ, একই মানসিক মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা। মিল সরাসরি আরো বলেন যে, সুখের অনুপাতেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। কেউ তা প্রতিবাদ করলে মিলের মতে তা হবে অসম্ভব ঘটনা (physical and metaphysical impossibility)।

সুখবাদের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বক্তব্য বলার পর মিল উপযোগিতাবাদের তত্ত্বে আসেন। তিনি লিখেছেন 'No reason can be given why the general happiness is desirable, except that each person, so far as he believes it to be attainable, desires his own happiness. This, however, being a fact, we have not only

all the proof which the case admits of, but all which it is possible to require, that happiness is a good : that each person's happiness is a good to that person, and the general happiness, therefore, a good to the aggregate of all persons.' এই উদ্ধৃতিতে মিলের মধ্য প্রতিপাদ্য হচ্ছে আত্মসুখ সর্বজনীন সুখের সমন্বয় সাধন করা। মিল বেণ্টামের মতো সুখ-দুঃখকে মনস্তাত্ত্বিক কার্য-কারণ স্বরূপ বলেননি অর্থাৎ তিনি বলতে রাজী হননি যে, মানুষ অনিবার্যভাবে সুখ ও দুঃখের দ্বারা পরিচালিত। মিল স্বীকার করেছেন যে, তিনি জানেন না কেনো সাধারণ সুখ আমাদের কাম্য। এই কাম্যতা স্বীকার করলে একটিমাত্র প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নটা এই যে, আমরা কেনো ও কেমন ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সর্বসাধারণের স্বার্থে পৌঁছাবো ? মিলের জবাব হচ্ছে এই যে, সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই তার সুখ কামনা করবে এবং দুঃখকে বর্জন করবে। তারা যদি নিজেদের চর্চা অনুযায়ী সুখ পেয়ে যায়, তবে সমগ্র সমাজের সুখই বৃদ্ধি পাবে ; কারণ সমাজ হলো রাম শ্যাম যদু মধুর সমাহার। সুতরাং তাদের সুখের সমাহারও একত্রিত ভাবে সমগ্র সমাজের সুখের কথাই বলবে। যেমন রাম+শ্যাম+মধু তেমনি রামের সুখ+শ্যামের সুখ+মধুর সুখ জুড়লে সমাজের মঙ্গল।

বেণ্টামের বিরুদ্ধে মিল স্বীকার করেছিলেন যে, সুখের গুণভেদ আছে। সমস্ত সুখই বেণ্টামের পুশপিন ও কবিতার অভিন্নতার মতো নয়। মিল নিজেই দেখিয়েছিলেন যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সমস্ত রকম সুখের অধিকার ও সম্ভাবনা যাঁর আছে) কেবলমাত্র কিছু কিছু সুখকেই বাছাই করেন। তাঁর বাছাই করা সুখকে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করি। মিল লিখেছেন, 'Of two pleasures ··if one of the two is, by those who are competently acquainted with both, placed so far above the other that they prefer it, even though knowing it to be attended with a greater amount of discontent' এবং অসুবিধার সঙ্গে বাছাইয়ের পরেও যদি 'would not resign it for any quantity of the other pleasure which there nature is capable of, we are justified in ascribing to the preferred superiorty of quality, so far outweighing quantity as to render it,

in comparison, of small account'. মিলের লেখায় গুণগত তফাতের প্রশ্ন উঠেছে কারণ দেখা যাচ্ছে বহুক্ষেত্রে লোকেরা এমন সব কাজ করে যাতে তাদের অত্যন্ত অসুবিধে ও কষ্ট অথচ তারা সকলে তা বেছে নেয় এবং সুযোগ পেলেও তা কখনো ত্যাগ করে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র সুখের পরিমাণের কথা নয়, কাজ বাছাইয়ের পেছনে অন্যান্য চিন্তাও থাকে এবং এই চিন্তা ও বাছাইয়ের সঙ্গে গুণের তারতম্যভেদ স্পষ্ট হয়। যেমন ধরা যাক ক্ষুদিরাম বসু। সাধারণ অর্থে তার আত্মসুখের জন্য বিপ্লবীর জীবন বাছা উচিত হয়নি। অথচ তরুণ কিশোর সমস্ত বিপদ ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই দেশ স্বাধীন করার ব্রতে নেমেছিলো। পিছু হঠে পালাতে চায়নি কখনো। সুতরাং ক্ষুদিরাম বসুর সুখের চিন্তা পরিমাণের হিসাবে বোঝা যাবে না, তার জন্যে প্রয়োজন গুণের ব্যাখ্যা। এই প্রসঙ্গেই মিল একটি বিখ্যাত উক্তি করেন 'It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied'।

মিলের কথাতেও গুণের প্রসঙ্গ থাকে

মিল নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ তোলেন। বেণ্টামের মতো বাহ্য নিয়ন্ত্রণকে তিনি ততো মূল্য দিতে রাজী নন। তিনি অন্তরের নিয়ন্ত্রণ মানতেন বেণ্টামের চারটি মঞ্জুরী (sanction) ও মঞ্জুরীজাত বিধিনিষেধের কথা মিল মেনেছেন কিন্তু তিনি জানতেন যে বাইরের চাপে যে বাধ্য-বাধকতা তার মূল্য গভীর নয়। কারণ নৈতিকতা বাইরের চাপের ওপর নির্ভর করেনা। সুতরাং কর্মের নৈতিকতা স্বীকার করবার জন্য অন্তরের শাসনের কথা তোলেন। বিবেক বা অন্তরের শাসন তখনই বোঝা যায় যখন কর্তব্য না-করার জন্য আমাদের মন দুঃখিত হয়। বিবেকের নিয়ন্ত্রণেই মানুষ সুখের জন্য চালিত হয়, অপরের দুঃখ বেদনার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় মিল সুখবাদ সত্ত্বেও একথা মেনেছেন যে অন্যের জন্য আমাদের মনে সহানুভূতি কাজ করে। সহানুভূতিতেই আমরা অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ নেই। সুতরাং আমরা কেবল মাত্র নিজেতেই আবদ্ধ নই, অন্যের প্রতি বিবেচনাও আমাদের মনে আসে।

মিল সহানুভূতিকে মানেন

অন্যের সঙ্গে একাত্মতার প্রসঙ্গে মিল একটি মজার কথা বলেন। মিলের মতে আমাদের লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য অনেক সময়েই এক হয়ে যায়। এই এক হয়ে যাওয়াকে তিনি বলেন 'transferance of interest'। আমার টাকা

দরকার বাঁচবার জন্যে। টাকা রোজগার করতে করতে বাঁচাটা গৌণ হয়ে অর্থ রোজগার করাটাই মুখ্য হতে পারে। তখন সেই অবস্থাকে মিল বলবেন স্বার্থের বদল। এই সদৃশ যুক্তি (analogy)-তে মিল বলেন যে নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যের ভাবনাটাই আমার প্রধান বিবেচ্য হয়ে যেতে পারে।

সমালোচনা—প্রথম দুটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে মিল **'প্রার্থিত বস্তু'** ও **'যে বস্তুকে প্রার্থনা করা উচিত'** তাকে এক করে ফেলেছেন। এই তফাৎটা যদিও দার্শনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তবু লৌকিক জীবনেও আমরা জানি যে আমরা অনেক কিছু কামনা করি কিন্তু সেই কামনা সর্বদাই কামনা করা উচিত ভেবে করি না। কারণ বহু উচিতকে আমরা বর্জন করি। সুতরাং মিল মানুষের সুখের কামনা ও কর্মের ঔচিত্যকে এক করে মারাত্মক দার্শনিক ভুল করেন।

মিলের প্রসঙ্গে আমরা দুটি প্রশ্ন তুলতে পারি : যদি বহু সুখের সম্ভাবনা থাকে তবে কোন্‌টা সবচেয়ে মূল্যবান : দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো কার সুখকে আমরা মান বলে ধরবো? মিলের জবাবকে আমরা চক্রাকার যুক্তি বলতে পারি। তাকেই গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান সুখ বলা হবে যা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বাছাই করেন। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একদল ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের আমরা চিনবো কি ভাবে? কোন্ মানদণ্ডে কর্মের বাছাইয়ে তাঁদের বিচারটিই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে? একটাই জবাব সম্ভব, আমরা সমর্থিত বস্তু বা তাঁদের বাছাইকরা বস্তুর চরিত্র দেখে চিনবো। তাঁরা যা বেছেছেন তা হলো শ্রেষ্ঠ সুখ। এই যুক্তির ফলে অবস্থাটা হলো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ সুখ বাছেন, আর শ্রেষ্ঠ বাছাই দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চেনা যায়। অর্থাৎ মিল একটি চক্রাকার যুক্তি তৈরি করে তার চারপাশে ঘুরছেন।

কোন্ সুখ মূল্যবান্? মানদণ্ড কি?

এই সূত্রেই মিল যখন বলেন যে 'তৃপ্ত শুকরের চাইতে অতৃপ্ত মানুষও ভালো' তখন মিল লক্ষ্য করেন না যে এই বক্তব্যটি মানলে আর তিনি বলতে পারেন না একমাত্র সুখই কাম্য। অর্থাৎ মিল লক্ষ্য করেন নি যে একবার সুখই কাম্য বলবার পর আর সুখের মধ্যে তারতম্য ভেদ করা যায় না। সুখের তারতম্য ভেদ করতে হলে বলা প্রয়োজন **সুখটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যের সূত্রে**

মহাপুরুষরা সুখের সন্ধানে ঘোরেন না

সুখ আসতে পারে। মিলের দ্বিধায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ উঠেছে কিন্তু মিল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রমাণ করতে পারেন নি তেমনি জানেন না যে মহাপুরুষেরা সুখের সন্ধানে ঘোরেন না। যেমন যীশু ক্রুশবিদ্ধ হতে যাননি সুখের জন্য বা ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তিনি রোমকদের যখন ক্ষমা করেন তখন সুখের সন্ধানটাই তাঁর লক্ষ্য ছিলো না। মিল যদিও লিখেছেন 'In the golden rule of Jesus of Nazareth we read the complete spirit of the ethics of utility. To do as you would be done by, and to love your neighbour as yourself, constitute the ideal prefection of utilitarian morality.' কিন্তু দেখাননি কেমন ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ থেকে সামগ্রিক সুখ আসছে এবং কেনো যীশুর নৈতিকতা উপযোগিতাবাদের নৈতিকতা।

এটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ধরা যাক ক গ কাজ করে নিজের জন্য চ সুখের ব্যবস্থা করেছে আর অন্য কয়েকজনের জন্য ছ সুখ এনে দিয়েছে। প কাজ করে সে নিজের জন্য ভ সুখ আনতে পারে ও ফ সুখ আনতে পারে অন্য কয়েক জনের জন্য। এবার ধরা যাক যে চ তুলনায় ভ র চাইতে বেশি এবং ছ তুলনায় ফ র চেয়ে কম। কিন্তু চ+ছ তুলনায় ভ+ফ এর চেয়ে কম। এবারে প্রশ্ন হবে ক, গ কাজটি করবে না প কাজটি করবে?

মিলের প্রথম বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ কেবল মাত্র নিজের শ্রেষ্ঠ সুখের কথাই ভাবতে পারে, কোনো বাছাইয়ের প্রশ্ন ওঠেনা কারণ ক কেবল মাত্র গ কাজটাই বাছতে পারে যেহেতু চ তুলনায় ভ-এর চেয়ে বেশি।

মিলের দ্বিতীয় বক্তব্য অনুযায়ী (নিজের সুখই নিজের কাছে মঙ্গল) ক-র তাই বাছাই করা উচিত কারণ তার মঙ্গলকেই বাছাই করা উচিত।

কিন্তু তৃতীয় বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের উচিত অধিকাংশের শ্রেষ্ঠ সুখের ব্যবস্থা করা, ক-র উচিত প কাজটি বাছাই করা, কারণ ভ+ফ এর সমগ্র সুখটি চ+ছ এর মোট সুখের চাইতে বেশি। তৃতীয় বক্তব্য অনুযায়ী আমরা ধরে নিতে পারি যে একটি লোকের উচিত অন্য সবার মঙ্গলের কথা ভাবা এবং সেই মঙ্গল নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও তাকেই অনুসরণ করা উচিত।

মিলের বিষয়ে এই প্রসঙ্গে যদিও বলা যায় যে তৃতীয় বক্তব্যটি থেকে

মানুষ কেবল সুখই চাইবে প্রতিপাদ্যটি ত্যাগ করতে হবে তবু মিলের প্রধান আলোচ্য (যে সুখই একমাত্র কাম্য) পরিত্যক্ত হচ্ছে না কারণ অধিকাংশের সুখও সুখ। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তির স্বার্থকে পরিত্যাগ করলে সমাজের কথা প্রধান হয়ে ওঠে, যদিও সমাজের মঙ্গল ও ব্যক্তির সুখের মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই।

(গ) বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ যোগ দিলেই সামাজিক সুখ তৈরি হবে এই বক্তব্যটি মিল সঠিক ভেবে দেখেন নি। কারণ সমাজে ব্যক্তিদের যোগ দিয়ে একটি মিশ্র সমাহার তৈরি করা যায় না। তেমনি তাদের সুখকে যোগ দিয়েও সুখের মিশ্র সমাহার সম্ভব নয়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন যে মিলের বক্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু একশো জন সৈন্যের প্রত্যেকেই ছ ফিট করে লম্বা সুতরাং সৈন্যদলটি ছশো ফিট লম্বা। কিন্তু এমন হাস্যকর উক্তি কেউ করে না। অথবা সুখের দিক থেকে হিসেব করলে পরিমাণের অর্থে দেখা যাবে যে বিড়লা প্রমুখ মুষ্টিমেয় ধনীর অর্থের (সুখের) যোগফল ভারতবর্ষে আমাদের মতো দরিদ্রদের সবার অর্থের (সুখের) চাইতে বেশি। সুতরাং এবার আমরা বলতে পারি যে ওই সুখের অধিকারী আমরাও। মিলের বক্তব্য সত্য হতো যদি আমরা একটি সৈন্যের ওপর আর একটিকে দাঁড় করাতাম বা বিড়লাদের সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু প্রথমত তা সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়ত অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ভাষায় "'the aggregate of all person's is no body, and consequently can not be a good to him.'

সুখের যোগফলেই শ্রেষ্ঠ সুখ হয় না

উপযোগিতাবাদ বা সুখবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি ঃ

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের বিরুদ্ধে জি. কে. চেষ্টার্টান চমৎকার লিখেছেন যে 'the utilitarian who distends the meaning of the word selfishness as to say that a man is self-indulgent when he wants to be burned at the stake, is takling nonsense'. আদর্শের জন্য যারা পুড়ে মরেছেন বা ফাঁসীতে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক সুখ বা আত্মকেন্দ্রিক সুখের কথা বলা নেহাত হাস্যকর, অপরাধজনক উক্তি।

দার্শনিক উইলিয়াম জেমস বলেন যে যেহেতু আমাদের সমস্ত কাজের সঙ্গে সুখ ও দুঃখের অনুভূতি জড়ানো সুতরাং তাকেই কর্মের লক্ষ্য বললে

ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই যে যেহেতু একটা সমুদ্রের জাহাজ চলতে চলতে অশ্রান্ত ভাবে কয়লা পোড়ায় সুতরাং তার যাত্রার উদ্দেশ্যটাই হলো কয়লা পোড়ানো!

আরো বলা যায় যে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদী 'pleasure in idea' ও 'idea of pleasure' কে গুলিয়ে ফেলেন। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ থেকে আমরা যখন ঔচিত্যের প্রশ্নে আসি তখনই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ওঠে। কারণ নৈতিকতার ক্ষেত্রে সুখ ও ঔচিত্যকে একাত্মভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারা চাই। অধ্যাপক পলসেন চমৎকার বলেছিলেন যে সুখসম্মত অবস্থায় মূল্যের স্থিতি বা কেন্দ্র নেই। সুখের কেন্দ্র বা স্থিতি থাকে একমাত্র কর্মে, কর্মের সঙ্গেই সুখের বা সুখসম্মত অবস্থার সংযোগ। মিল এই আলোচনার সূত্রেই তাঁর গুণগত সুখবাদের কথা তোলেন। ওঁর বক্তব্যের দুটো গুরুত্ব: (ক) কারো কাছে সাধারণ সুখবাদের সংশোধন প্রয়োজন ছিলো ও (খ) কারো কাছে ওপরের বক্তব্যে সুখবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন মনে হয়েছে। মিল কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেন নি কিন্তু তিনি সুখবাদের প্রাচীন বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন।

মূল্যবোধের সঙ্গে সুখের সম্পর্কের প্রশ্নে অধ্যাপক পেরী বলেছেন যে সুখবাদের মৌলিক ত্রুটি হলো 'its failure to distinguish between the concept of goodness and that object, namely pleasure, to which the concept is supposed to apply.' পেরী বলতে চাচ্ছেন যে মূল্য ও সুখ মেলে না কারণ মূল্য সুখের চাইতে অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপ্ত প্রত্যয়। পেরীর বিরুদ্ধে সুখবাদী বলতে পারেন যে বেশ জীবনের লক্ষ্য সুখ নয়, জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু এমন যদি হয় যে বিশেষ ধরণের আচরণ সুখের বদলে কেবল দুঃখ আনছে তবে তাকে আমরা শুভ বলবো? সাধারণতই তখন আমাদের জবাব থাকে না। আমরা যদি এই জবাব দিই 'না,' তবে সঙ্গে সঙ্গেই সুখবাদীরা ঘোষণা করবে যে এই উদাহরণ অনুযায়ী শুভ ও সুখ একাত্ম হচ্ছে।

পেরীর মতে মূল্য ও সুখ এক নয়

আসলে সুখবাদীদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি এই যে 'the object good or beautiful for some other reasons does not prevent it being at the same time congruous with our instincts and tendencies. Whatever is thus congruous brings pleasure. There is no experience of the good or beautiful without

feeling, but it does not follow that the sense of the good or beautiful has in the feeling.' অর্থাৎ এ কথা ঠিক যে মঙ্গলের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমাদের মানসিকতার যোগ থাকে। আমার স্বভাবের সঙ্গে যার মিল তা থেকে সুখ আসবেই। যে কারণে ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসীর সময়েও দুঃখিত নন কারণ বিদ্রোহী ক্ষুদীরামের স্বভাবের সঙ্গে তার ফাঁসীর কোনো বিরোধ নেই। তাঁর স্বভাবের সঙ্গে ওই মর্মান্তিক ঘটনাও সুখের উৎস হিসেবে মিলে গেছে। কিন্তু মনের আবেগটাই শুভ বা সুন্দর নয়। শুভ বা সুন্দর হচ্ছে লক্ষ্য ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্ম।

সুখবাদের বিরুদ্ধে আরো একটা মূল কথা তোলা যায় যে সুখবাদ জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশক হতে পারে না। সুখবাদীরা অবশ্য ধারাপাত তৈরি করে ন্যায় ও অন্যায়ের, সত্য ও মিথ্যার বিচার করতে চান। কিন্তু ইতি পূর্বেই আমরা দেখেছি যে সুখের যোগফল বা দুঃখের যোগফল সংখ্যা বা পরিমাণ হিসেবে পাওয়া যায় না, কিছু পেলেও তার তাৎপর্য নেই। এমন কি স্বয়ং বেণ্টাম লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 'Tis vain to talk of adding quantities which after the addition, will continue distinct as they were before, one man's happiness will never be another man's happiness, a gain to one man is no gain to another ; you might as well pretend to add 20 apples to 20 years.'

সুখবাদ ব্যবহারিক কর্মে নির্দেশ দেয় না

সুখবাদের সাধারণ ত্রুটিগুলো এক জায়গায় জড়ো করলে দাঁড়াবে—

(ক) রূপহীন তথ্য (Matter without form)—কাণ্ট নৈতিক বিচারের রূপটি দিয়েছিলেন কিন্তু জানাননি কী কী কর্তব্য আমাদের করা উচিত। আর সুখবাদ জানিয়েছে সুখ কামনা করাই আমাদের কর্তব্য কিন্তু তার সর্বজনীন সামান্য রূপটির কথা আলোচনা করেনি। যা কিছু সুখের তাকেই খুঁজতে হবে কিন্তু কেমনভাবে সুখের চরিত্র জানা যাবে তা সুখবাদ আলোচনার যোগ্য মনে করেনি।

এই মতের প্রাথমিক ত্রুটিই এই যে সুখবাদ আমাদের কামনার কথা বলেছে কিন্তু লক্ষ্য করেনি যে আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ করতে চাই, কেবলমাত্র সুখই খুঁজি না। আসলে সুখের সম্পর্ক ব্যক্তির স্বভাবের সঙ্গে। স্বভাবটা জানা নাই অথচ সুখের কথা বলা হচ্ছে—এই অবস্থায় সুখের তাৎপর্য জানা যায় না।

কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে সুখ চায়। আমাদের উদাহরণে যেমন ক্ষুদিরাম বসুর চরিত্র না জানলে, তার কল্পনার লক্ষ্য জানা না থাকলে তার কর্মের কোনো গুরুত্ব বিচার করা যায় না। অন্য আর একজন ব্যক্তি নিশ্চয়ই ক্ষুদিরামের কর্মে সুখের কথা ভাবে না।

(খ) সুখের গুণ (Quality of pleasure)—সুখবাদীরা মোটামুটি ভাবে সমস্ত সুখকেই তুল্যমূল্য ভাবে। কিন্তু আমরা মিলের আলোচনাতেই দেখেছি যে তিনি পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গেই গুণের কথা তুলেছেন। মিলের বক্তব্য অনুযায়ী সুখের ফারাক থাকলে নিশ্চয়ই সুখবাদের মূল বক্তব্যটি পরিত্যক্ত হয় যে সুখটি একমাত্র কাম্য। কারণ একটি সুখ থেকে অন্য সুখের তফাৎটা সুখের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে না। বিচারের জন্য পৃথক মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হয়। সুখের এলাকার বাইরে সুখ বিচারের প্রসঙ্গ স্বীকৃত হলে সুখকে আর আমাদের কর্মের বিচারক বলা যায় না। তখন বোঝাই যায় যে মানুষের কর্মের নৈতিকতা সুখ ব্যতীত অন্যান্য আদর্শের দ্বারা পরিচালিত যদিও কর্মের সঙ্গে সুখের সম্পর্ক থাকতে পারে।

সুখের গুণগত পার্থক্য থাকলে আমরা আর আকর্ষণের দিক থেকে সুখের তালিকা বানাতে পারি না। কারণ পরিমাণ ও গুণের এমন কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই যার দ্বারা পরিমাণ গুণের চরিত্র নির্ধারণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে গুণকে পরিমাণে রূপান্তরিত করতে হয় অথবা পরিমাণকে গুণে পরিণত করতে হয়। কিন্তু উভয়ই সুখবাদের মৌলিক বক্তব্যটি তখন পরিত্যক্ত হবে।

(গ) বস্তু বা লক্ষ্য থেকে সুখের অভিন্নতা (Pleasure inseparable from its object)—আমরা দেখেছি যে সুখ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অস্তিত্ববান অবস্থা নয়। দুভাবে কথাটা বোঝা যেতে পারে। সুখ যদি আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে (ক) সুখের বস্তু থেকে তাকে তফাৎ করা যাবে ও (খ) বিষয়ী অর্থাৎ যার সুখ হয় তারে থেকেও সুখকে পৃথক করা যায়। সুখবাদীরা অবশ্য এই দুটি বক্তব্যকেই কম বেশি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু সুখকে কখনোই তার লক্ষ্য থেকে তফাৎ করা যায় না। যেমন আমাদের উদাহরণটি যে ধ্রুপদী সঙ্গীতের ভক্তরা শীতের রাতটি গান শুনবার জন্য রাস্তায় বসে কাটিয়ে দিলো। এখানে সুখকে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে তাদের এই কর্মটি অত্যন্ত নির্বোধ ও অযৌক্তিক মনে হবে যেহেতু শীতের রাতে বাইরে থাকাটা নিরাপদ নয়। অথচ তারা হাসিমুখে আনন্দের সঙ্গেই বাইরে কাটাচ্ছেন। কেনো কাটাচ্ছেন?

সুখের জন্য না আব্দুল করিমের গানের জন্য? নিশ্চয়ই আব্দুল করিম নামক ওস্তাদের গান শুনবার বাসনাই প্রধান। গান শুনতে পেলে হয়তো সুখ আসবে নয়তো আসবে না। কিন্তু গান শোনাটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সুতরাং আমরা বলবো যে সুখবাদ সুখকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তির কর্মকে আদৌ ব্যাখ্যা করতে পারে না। সুখের জন্যই সুখ একথা কোনো সচেতন ব্যক্তিই যুক্তিতে স্বীকার করবে না।

অনুশীলনী

১। Examine the claim of Pleasure to be a standard of moral judgement

২। What is Altruistic Hedonism ? What improvement were made by Mill upon Bentham's view of it ?

৩। Bring out clearly the distinction between the Psychologoical Hedonism and Ethical Hedoninsm.

৪। Give a critical estimate of Mill's Utilitarinism.

৫। What is Hedonism and what are its different forms? Is Hedonism in any of its forms a satisfactory ethical theory ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাণ্টীয় যুক্তিবাদ ও নীতির বিচার

১। নৈতিক বিচারে রূপের প্রসঙ্গ (Ralevance of Form in Ethical Judgments)

সুখবাদের আলোচনায় দেখিয়েছি যে নির্দিষ্ট সুখটাই সমস্ত কর্মের উৎস ও বিচার। মানসিক ভাবে কর্ম সুখের দ্বারা চালিত আর কর্মের ফল হিসেবে সুখ কর্মের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে। এই বক্তব্যের দুটি প্রধান লক্ষ্য থাকছে। একটি হলো আদিতেই জানা যে **পরিমাণগত ভাবে কোন্ কোন্ কর্ম আমাদের করা উচিত হবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফল দিয়েই কর্মের বিচার।**

এই ধরণের নির্দিষ্ট কর্মের বিরুদ্ধে রূপবাদীরা বলতে চান যে নির্দিষ্ট কর্ম বলতে কিছু জানা নেই যে এটাই ভালো বা এটাই মন্দ। কর্মের চরিত্র নির্ভর করবে তার রূপের দ্বারা। অর্থাৎ রূপবাদীরা বলছেন যে তাঁদের নীতিতেই কর্মকে জানা যাবে। ওঁদের মতে তাই ন্যায়টা চিরকালই ন্যায়, অন্যায়টা অন্যায়।

নির্দিষ্ট কর্ম বলতে কিছু নেই

কোনো যুক্তি বা নিরন্তর চুলচেরা বিচারও কর্মের আত্যন্তিক নিজস্ব চরিত্রটি বদলাতে পারে না। যেমন কোনো 'অন্যায়' কাজ থেকে সুখ পাওয়া গেলে সুখবাদীরা নিশ্চয়ই তাকে সমর্থন করবেন কিন্তু রূপবাদীরা টন টনে সুখ সত্ত্বেও কর্মটিকে অন্যায় ছাড়া আর কিছু বলবেন না। রূপবাদীদের মতে তাই বস্তুর সত্তার মধ্যেই ন্যায় অন্যায়ের প্রসঙ্গ বিধৃত, অন্য কোনো বাহ্য প্রসঙ্গ থেকে তার চরিত্রের বিচার সম্ভব নয়। অবশ্য এ-কথা ওঁরা মানেন যে ন্যায় কাজ থেকে শুভফল পাওয়া যাবেই যাবে। ওঁরা শুধু অস্বীকার করতে চান যে ফলাফল কর্মকে নৈতিক করে, ভালো মন্দের ছাড়পত্র দেয়।

গোড়ায় অনেকে বলতেন যে শুভ কাজের ভালো-মন্দ রঙ বা গন্ধের মতো। অর্থাৎ ওটা কাজের নিজস্ব গুণ, তার চরিত্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কিন্তু বর্তমানে মনস্তত্ত্ব যেহেতু জানিয়েছে যে মনে বিশেষ নৈতিক বিচারের ব্যবস্থা নেই, আগেকার মতো আর ব্যাখ্য করা হচ্ছে না। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বস্তুর গুণ নির্দেশক

অনেকের মতে ভালমন্দ বস্তু ও গুণের সম্পর্ক

বাক্যের মতো আমরা বাক্য গঠন করি। তার কারণ এটা আমাদের ভাষার একটা

পুরোনো ও গভীর অভ্যাস। যেমন আমরা যখন বলি 'সোনা হলদে' তখন সোনাকে একটা বস্তু ধরে নিই ও রঙটাকে তার গুণ। তেমনি যখন বলি 'এই কাজটা ভালো', একই রকমে আমরা কাজটাকে বস্তুর মতো ধরে নিই এবং ভালোত্বকে 'হলদে'র মতো গুণ বলে ভাবি। কিন্তু বর্তমানে আমরা জেনেছি যে সোনার হলুদত্বটা সোনার মধ্যেই নেই বা সোনার সঙ্গেই তার একমাত্র যোগ নয়। আসলে সোনার হলুদত্ব একটা 'বৃত্তি' (function) মাত্র। এই বৃত্তিকে দার্শনিকের ভাষায় বলা যায় 'functions of their relations to other things'। অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে সম্পর্কেই এই বৃত্তিটির প্রকাশ। নৈতিক গুণাবলী এই অর্থে আরো স্পষ্ট ভাবে বৃত্তিমূলক। কাজেই রূপবাদীরা বর্তমানে বলতে চাচ্ছেন যে 'for this reason those who hold the doctrine of inherent moral value today are inclined to think that right or wrong are not qualties of single acts apprehended by a spceial moral sense but apply rather to general principles or norms that are apprehended by reason.' অর্থাৎ রূপবাদীরা বর্তমানে যুক্তিসিদ্ধ নীতির দ্বারাই কর্মের শুভ অশুভ বিচার করছেন।

২। **কাণ্ট** (১৭২৪-১৮০৪)

কাণ্ট লিখেছেন দুটো জিনিস ওঁকে বিস্ময়াভূত করে। একটা হলো তারাভরা আকাশ ও অন্তঃস্থ নৈতিক নিয়ম। তিনি লিখেছেন 'Two things fill me with awe, the starry heavens above and the moral law within.' অর্থাৎ কাণ্ট দুটি নিয়মের কথা বলছেন। একটি হলো **প্রকৃতির নিয়ম আর একটি নৈতিকতার নিয়ম।**

কাণ্ট এই নিয়মের নির্দেশ ও তার প্রাধান্যের সূত্রেই বিচারবাদ গড়েন ও রূপবাদকে সমর্থন করেন। একজন বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকের কথা মতো আমরা জানি 'what Kant meant by his categorical imperative is that the moral quality of an act always shows itself in the fact that it comes to us as a command or a imperative.' কাণ্টের মতে কর্মের নৈতিকতা সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করে আইনের নির্দেশ ও বাধ্যবাধকতায়। কাণ্ট এ-কথা বলছেন কারণ রূপবাদীদের মতো তিনি **কর্মের চরিত্রেই নির্ভর করতে চাচ্ছেন, ফলাফলের ওপর নয়।** কোনো

নৈতিকতা আইনের নির্দেশ ও বাধ্যবাধকতায় প্রকাশ হয়

কাজ যদি উচিত ভেবে করতেই হয় তবে কাজটাই সব। কর্মের চরিত্রেই যদি শুভ-অশুভ বা নৈতিকতা থাকে তবে সেই নৈতিকতা কারো কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো লাগা বা মন্দ লাগার ওপর নির্ভর করে না। সেই কর্মের নৈতিকতা তখন আইনের মতো অমোঘ।

এই কর্মের কোনো প্রস্তাবক সর্ত থাকতে পারে না যে তার ওপর নির্ভর করে কর্মের নৈতিকতা তৈরি হবে। সর্তহীন 'ঔচিত্য'কে প্রয়োজন কর্মের নৈতিকতার জন্য। কারণ তা না-হলে নৈতিকতা আরো অন্যান্য অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করবে। ভাববাদী দার্শনিক তাই আরো লিখেছেন যে 'The moral quality is concerned with the form, not with the content or the act. But this fact does not exclude the further fact that we can give **reasons** for this oughtness and this value. Morality is a matter of reason for Kant, not of feeling.' কাণ্ট যতোই রূপের কথা বলুন, আমরা আগেই দেখিয়েছি যে তিনি বিচারের ওপরেই দাঁড়ান। কিন্তু বিচারে কর্মের ঔচিত্যের রূপটি জানা গেলে তার আবশ্যিকতা ও অনিবার্যতা কেউ বাধা দিতে পারবে না। তাই নৈতিক কর্ম প্রায় একটি নির্দেশ এবং এমন নির্দেশ যার অন্য কোনো সর্তমূলক প্রস্তাবনা সম্ভব নয়। কাণ্ট সে জন্যে নৈতিকতার বিচারে কোনো রকম ভাবাবেগকে স্থান দিতে রাজী নন।

কাণ্টের জ্ঞান কাণ্ড ও মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর নৈতিক বক্তব্য জড়িয়ে আছে। মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্যে কাণ্ট তিনটি কর্ম বা বৃত্তির উল্লেখ করেছেন: বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও সঙ্কল্প। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও বিশ্বকে জানি। এই জানায় মন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে ও নিজেই জ্ঞানের একটি অংশকে প্রস্তুত করে। কিন্তু সঙ্কল্পে আমরা যে জ্ঞান পাই তা যেমন একদিকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান নয় তেমনি বুদ্ধিজাত জ্ঞানও নয়। সঙ্কল্পের স্বাধীন বৃত্তির জন্যই আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির জগত তৈরি করতে পারি। ফলে আমরা পার্থিব কার্য-কারণ তত্ত্ব থেকে, বস্তুর অধীনতা থেকে মুক্তি পাই।

মনের তিনটি বৃত্তি: বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও সঙ্কল্প

কাণ্টের মতে যতোক্ষণ আমরা বাসনা দ্বারা পরিচালিত ততোক্ষণ আমরা স্বাধীন নই। কাণ্ট দেখেন যে যতোক্ষণ আমরা প্রাণীবিদ্যা, নৃতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের সীমার মধ্যে বিচরণ করি ততোক্ষণ বলতেই হবে যে আমাদের কর্ম পূর্বনির্ধারিত।

প্রাণী-তত্ত্ববিদ মানুষকে এমন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখেন যা বিবর্তিত হয়েছে, যার বংশানুক্রমে এক একটা বৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওই শ্রেণীর ধর্মের সঙ্গে মিলিয়েই তখন আমাদের পরিচয়। নৃতত্ত্ববিদ মানুষকে দেখেন কোনো জাতির অংশ হিসেবে। এই জাতির জীবনে ঐতিহাসিকতা আছে, তার নিজস্ব মানসগঠন ও জীবনযাত্রা আছে। কাজেই আমাদের আচরণ ওই জাতির সামান্য বক্তব্য দ্বারা গঠিত। মনস্তাত্ত্বিকও মানুষকে বিশেষ একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারার প্রতিরূপ হিসেবে বিচার করেন। কাণ্ট তাই লেখেন 'Man is one of the phenomena of the sense world, and he, too, is in so far one of the nature causes whose causality must stand under empirical laws. As such, he must have an empirical nature…'। এই প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়জ স্বভাবের পাশেই কাণ্ট মানুষের একটি 'তুরীয় সত্তা'র ('transcendental self') কথা বলেন। এই তুরীয় সত্তার ক্ষেত্রেই নৈতিকতার বিচার।

২। **কাণ্টের ঔচিত্য তত্ত্ব (Kant's Conception of Ought)**

'ইন্দ্রিয়জ সত্তা' স্থানকালে আবদ্ধ এবং প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। তা থেকে আমরা ঔচিত্যের স্বরূপ জানতে পারিনা কারণ ঔচিত্য প্রকৃতির নিয়মের অধীন নয়। প্রকৃতির ঘটনায় 'অস্তিত্ব' (is) আছে কিন্তু 'ঔচিত্য' নেই। প্রকৃতির নিয়মে যখন সে কাজ করে তখন সে প্রকৃতির অধীন, তার স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। কিন্তু যখন আমরা বলি যে 'তার ও ভাবে কাজ করা উচিত বা উচিত নয়' তখন আমরা ধরে নিই যে তার কর্মের স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতাকে স্বীকার না করলে তার নিজস্ব কর্মের কথা কিছুতেই উঠতে পারে না। সুতরাং কাণ্টের ভাষায় নৈতিক দায়িত্বের কথা 'inextricably bound up with the consciousness of the freedom.' যে সত্তা স্বাধীন ভাবে কাজ করে তার সঙ্গেই নৈতিক কর্মের সংযোগ। এই স্বাধীনতার কথা কাণ্ট আরো স্পষ্ট করে জানান যে 'that one can act because one is conscious that one ought, and this one knows in oneself the freedom which—without the moral law—had remained unknown'. এই সূত্রেই কাণ্ট তাঁর বিখ্যাত 'সর্তহীন বাধ্যতা'র (categorical imperative) প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন।

স্বাধীনতা থেকে ঐতিহ্য তৈরি হয়

কাণ্ট তিন রকম বাধ্যতার কথা তুলেছেন। (ক) সর্তাধীন (খ) নির্দেশিত ও (গ) সর্তহীন। যে বাধ্যতা আমরা কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানি তা সর্তাধীন। যে সমস্ত উদ্দেশ্য সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সবাই কামনা করে তাদের লাভ করবার বাধ্যতা হলো নির্দেশিত। নৈতিক নিয়মগুলোকে কাণ্ট বলেন সর্তহীন বাধ্যতা।

আমাদের অধিকাংশ কর্মই সর্তাধীন। তার সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের যোগ থাকে। কিন্তু ঔচিত্যের ক্ষেত্রে, আমরা চাই বা না চাই, আমাদের তা মানতেই হবে, জীবনে মূর্ত করতে না পারলেও মানতে হবে। এই ঔচিত্যের প্রত্যয়টি একটি অনন্য ঘটনা, বস্তুর জগতে কোথাও তার পরিচয় মেলে না। ঔচিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব (obligation) প্রসঙ্গে কাণ্ট লেখেন 'Obligation expresses a sort of necessity...which occurs nowhere in nature. It is impossible that anything in nature **ought to be** other than in fact it is. In truth, obligation—if one has before one's eyes only the succesion in nature—has simply and solely no meaning. We can as little ask what ought to happen in nature as what attributes a circle ought to have'.

ঔচিত্যের অনন্য চরিত্রের জন্য কাণ্ট বলেন যে 'There is nothing in the world—nay, even beyond the world, nothing conceivable, which can be regarded as good without qualification, saving alone a good will.' অর্থাৎ একমাত্র 'শুভ সঙ্কল্প' ছাড়া আর কিছুই নিজে থেকে শুভ নয়। একটি প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে যে শুভ সঙ্কল্পের উৎস কি? কাণ্ট তার জবাবে বলেন যে নৈতিক সত্তা হিসাবে মানুষের চরিত্র থেকেই শুভ সঙ্কল্প তৈরি হয়। সুতরাং নৈতিক সত্তা হিসেবে মানুষ আর বস্তু জগতের বাসিন্দা নয়, যে বস্তু জগত আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ। নৈতিক মানুষ কার্যত 'সত্য' বস্তু জগতের বাসিন্দা, যে জগতের সত্য একমাত্র 'তুরীয় সত্তা'র নৈতিকতা বোধে পরিজ্ঞাত হয়। একমাত্র তুরীয় সত্তাই তাকে জানে।

নৈতিক ঔচিত্যের প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা আরো জেনেছি যে নৈতিক সঙ্কল্পের সূত্রেই আমাদের কর্ম করতে হবে। এবারে প্রশ্ন হতে পারে যে সেই কর্মটি কি? কাণ্ট বলেন তা হলো এমন কাজ যা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন ও অবস্থা নিরপেক্ষভাবে সত্য।

যেমন, চুরি করা অপরাধ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত ইত্যাদি। কাণ্ট যুক্তির ওপর তাঁর নৈতিক ঔচিত্যকে দাঁড় করিয়ে বলেন যে নৈতিক কর্মের কোনো বাহ্য লক্ষ্য নেই, একমাত্র ন্যায় পথে সঙ্কল্পের স্থিতিটাই আলোচ্য। শুভসঙ্কল্প যে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প তার কারণ শুভসঙ্কল্প কোনো বাহ্য তথ্যের দ্বারা চালিত নয়। নিজের অন্তরস্থ নিয়মেই তা চালিত।

কাণ্ট যেহেতু ঔচিত্যের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করেন, তিনি নির্দিষ্ট কোনো কর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন না। কারণ তাঁর মতে ঔচিত্যের চরিত্র জানা থাকলেই কর্ম বিষয়ে মনস্থির করতে পারা যাবে। কর্মের একটাই প্রধান লক্ষ্য যে তা অন্তঃসঙ্গতি সম্পন্ন হবে অর্থাৎ সেই নীতিই নৈতিক কর্মকে পরিচালনা করতে পারে যা স্থান·কাল ও লক্ষ্য নিরপেক্ষ ভাবে আজীবন সত্য থাকবে এবং অন্যের জীবনেও তার ব্যবহার সত্য হবে। কাণ্ট তাই একটি মাত্র নীতির কথা বলেন 'Act only on that maxim (or principle) which thou canst at the same time will to become a universal law.'

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উদাহরণ তুলে কাণ্ট বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত নয় কারণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা নামক কর্মটিকে সর্বজনীন করা যায় না। সর্বজনীন করা হলে সবাই প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করবে এবং তারই ফলস্বরূপ কেউ কখনো প্রতিশ্রুতি দেবে না। আবার প্রতিশ্রুতি না দিলে তা ভাঙবার সুযোগ হবে না বা ভাঙবার কথাই উঠ্‌বেনা। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যা সবার পক্ষে সম্ভব নয় তা একের পক্ষেও অন্যায়। কাণ্টের মতে অন্যায়ের উৎসই হলো ব্যতিক্রম তৈরি করা। কাজেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সবার ক্ষেত্রেই কর্তব্য, কারণ সেটাই নৈতিক কর্ম।

৩। কাণ্টের বক্তব্যের গুরুত্ব (Importance of Kant's Statement)

রূপবাদীদের বিশেষত কাণ্টের প্রতিপাদ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে। প্রথমত, তাঁরা নৈতিকতা বিচারে প্রথম তন্নিষ্ঠ মানের কথা আনেন। অর্থাৎ নৈতিক বিচার শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের আবেগ অনুভূতি নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁরা গোড়া থেকেই নৈতিকতা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের মৌলিক তফাৎ করেন। তৃতীয়ত, কাণ্ট দেখিয়েছেন যে নৈতিক অভিজ্ঞতার একটা অন্তঃস্থ চরিত্র আছে।

নৈতিকতা বিচারে তন্নিষ্ঠ মানের (objective standard) প্রশ্ন মূল্যবান

কারণ তন্নিষ্ঠ মানের অভাবে সমস্ত বিচারটাই ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে এক এক ব্যক্তির এক এক রকম বক্তব্য থাকে। যে যার ক্ষেত্রে নিজের প্রসঙ্গেই আবদ্ধ থাকেন ও বিচারে নিজের আলোচনার বাইরে যেতে চান না। ব্যক্তিগত আলোচনায় তখন সর্বজনীন মান পাওয়া যায় না।

নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের তফাৎটাও গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি লোক নিজের প্রয়োজনেই আবদ্ধ থাকে। সমস্ত কর্মই তখন কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন হয়। যেমন, আমার টাকার দরকার সুতরাং আমি চেক জাল করবো, আমার চাকরির দরকার সুতরাং আমি লোককে মিথ্যা স্তাবকতা করবো ইত্যাদি। অর্থাৎ সমস্ত কর্মই একটা 'যদি'র সঙ্গে জড়িত। কাণ্ট তাই বোঝাতে চেয়েছেন যে হয় কর্মের নৈতিকতার জন্যে নৈতিকতা নয়তো সমস্ত কর্মই নিছক প্রয়োজনের হাতিয়ার। হাতিয়ার মনে করলে কোনো কর্তব্যই আর কর্তব্য থাকে না। কর্তব্য তখন ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রের বাইরে বাহ্য কোনো অবস্থার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং কর্মের বিচারে ব্যক্তির চরিত্রের কিছু এসে যাচ্ছে না। অথচ আমরা ইতিপূর্বেই স্থির করেছি যে কর্ম নির্দিষ্ট ব্যক্তির এবং কর্মেই তার অন্তর্নিহিত সত্তার প্রকাশ। সুতরাং কর্মের মধ্যে হয় তার সত্তা উন্মোচিত হচ্ছে অথবা হচ্ছে না। যদি না হয় তবে নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় নিতান্তই বিশৃঙ্খল ও আপতিক (accidental) হয়ে যায়। আর যদি সত্তা প্রকাশিত হয় তবে বিচারের প্রয়োজন নিতান্ত বাহ্য ঘটনা। কারণ, তখন ব্যক্তির নিজস্ব চরিত্রের তাৎপর্য দিয়েই কর্মের নৈতিকতার বিচার চলে।

এই বক্তব্য থেকেই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি আসে। কর্মে যদি ব্যক্তির স্বভাব বিকশিত হয় তবে কর্মের চরিত্রের মধ্যেই তার শুভ-অশুভ নিহিত থাকে। বাইরে থেকে তার ওপর মূল্য আরোপ করতে হয় না। কর্তব্য সমস্ত সময়েই নিজের গুরুত্বে কর্তব্য থাকে। ন্যায় বা অন্যায় চিরকালই ন্যায় বা অন্যায় থাকে।

৪। কাণ্টের ত্রুটি (Defects of Kant's position)

কাণ্ট তাঁর তত্ত্বে 'ব্যবহারিক যুক্তি'র (practical reason) কথা তুলেছেন। আচরণের দিক থেকে ভালো মন্দের মানটি কাণ্টের তত্ত্ব অনুযায়ী কিছুদূর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। সদর্থক না হলেও নঞর্থক ভাবে কাণ্ট অনেকটা সাহায্য করেন। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। সীমাবদ্ধতার কারণ লুকানো থাকে কাণ্টের 'সর্বজনীনতা' তত্ত্বে। এই তত্ত্বটির ব্যবহার বিষয়ে

দুটি কথা বলা যায়। এই তত্ত্বটি কি প্রতিটি বিশেষ ঘটনায় প্রযোজ্য? যদি যায় তো তত্ত্বটি হাল্কা হয়ে পড়ে। কাণ্ট অবশ্য তা বলেন নি। তিনি তত্ত্বটির প্রয়োগ দেখতে চেয়েছেন বিশেষ শ্রেণীর কর্মে। মার্কিন এক দার্শনিকের মতে 'He meant his principle to be applied to **classes of acts** rather than to particular situations'. ফলে ওঁর বক্তব্য প্রায় একটা প্রান্তিক এবং চূড়ান্ত প্রস্তাবে পরিণত হয় যার প্রমাণ পাওয়া যায় জার্মান দার্শনিক ফিকৃটের আলোচনায় যে, আমার স্ত্রী যদি সত্যের জন্যে মরেন তো মরুন। অর্থাৎ কাণ্ট কোনো ব্যতিক্রম মানতে চাচ্ছেন না। যদিও আমরা জানি যে বিশেষ ঘটনা বিশেষ অবস্থাতেই ঘটে এবং জীবনে অসংখ্য ব্যতিক্রম আছে।

(ক) কাণ্ট কর্তব্যের নির্দেশ দেন না—নীতিশাস্ত্রের সমস্যা দুটো। (১) কেমন করে আমাদের কর্তব্য করবো ও (২) আমাদের কর্তব্য জানবো কি করে। কাণ্ট সঙ্কল্পের চমৎকার আলোচনা করেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে তিনি নির্বাক। যদি আমি আমার কর্তব্য জানি তবে কাণ্ট জানান কেনো তা করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু তিনি জানান না কী ভাবে আমি আমার কর্তব্যকে জানতে পারবো। শেকৃসপীঅরের হ্যামলেট যেমন কর্তব্য করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু জানতে পারেন নি নিজের কর্তব্য কি।

(খ) সর্বজনীনতা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়—সর্বজনীনতা তত্ত্বটি যে সর্বত্র প্রযোজ্য নয় আমরা তা ফিকৃটের উদাহরণে বলেছি। যেমন কারো প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমরা মিথ্যা বলবো কি বলবো না প্রশ্নে দুটি বক্তব্যই সর্বজনীনতা দাবি করতে পারে। একদল বলবে 'সমস্ত অবস্থাতেই প্রাণ বাঁচানো উচিত' ও অন্যদল বলবে 'সমস্ত অবস্থাতেই প্রাণ বাঁচানো উচিত নয়'। এ দুটির মধ্যে আমরা বাছাই করবো কিভাবে? 'আমাদের সত্যকথা বলা উচিত' ও 'যেখানেই সম্ভব প্রাণ বাঁচানো উচিত' এই দুটি নির্দেশকে সর্বজনীন করা যায়। এই অবস্থায় সত্যিই আমরা কী করবো সে বিষয়ে কাণ্টের নীতি আমাদের সাহায্য করে না।

(গ) সর্বজনীনতা তত্ত্বটি আংশিক—আমরা ওপরেই জানিয়েছি যে কাণ্টে কোনো ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা নেই যদিও বিশিষ্ট ঘটনায় ব্যতিক্রমের মূল্য থাকে। যেমন একটি উদাহরণে ক্যাথলিকদের মতো আমরা ঘোষণা করলাম যে 'ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত'। কাণ্টের তত্ত্ব মানলে এই তত্ত্বটি সর্বজনীন হওয়া উচিত। কিন্তু সবাই ব্রহ্মচর্য পালন করলে মনুষ্য জন্মই বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য কোনো লোক পৃথিবীতে থাকবে না। আবার যদি বলা

হয় যে এই সূত্রটি নৈতিক নয় যেহেতু সর্বজনীন করা গেলো না, তবে ব্যবহারিক জীবনের সত্যকে অস্বীকার করতে হবে যেহেতু ক্যাথলিকরা সত্যিই ব্রহ্মচর্যকে নৈতিক কর্তব্য মনে করেন। সুতরাং জীবনে ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখতে হয়।

কাণ্টের প্রতিপাদ্যে যেহেতু বিশিষ্ট কর্মের কোনো নির্দেশ নেই, সমালোচকেরা বলতে চান যে কাণ্টের সঙ্কল্পতত্ত্ব নিছক শূন্য। কারণ কোনো ব্যক্তি জানতেই পারেনা কোন্ সঙ্কল্প থেকে তার কী কর্তব্য তৈরি হবে। হারমান জাকোবি তাই বলেন যে কাণ্টের সঙ্কল্প হচ্ছে 'will that wills **nothing**'।

কাণ্টের 'কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য' বিষয়ক সিদ্ধান্তকে সমালোচকরা অত্যন্ত কঠোর বলেন। তাঁদের সমালোচনার দুটি দিক আছে। (ক) কাণ্ট আবেগ-নির্ভর কোনো কর্মকেই নৈতিক বলেন না। আমরা দেখেছি যে কাণ্ট মনস্তত্ত্বে আবেগ ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বলেছেন। সেই আচরণই একমাত্র নৈতিক যা নৈতিক বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। আবার আমরা একথাও জেনেছি যে নৈতিক বিচার কেবলমাত্র একটি রূপসর্বস্ব বক্তব্য, মানুষের চরিত্রের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। অথচ মানুষের অধিকাংশ কর্মের সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে। কাণ্টের বিরুদ্ধে আমরা তাই জানিয়েছি যে তিনি সঙ্কল্পের কথা বলেছেন কিন্তু মানসিক কর্মের জগতে তার অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেন নি। এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বহু ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন যাঁরা কেবল মাত্র পরের মঙ্গলের জন্যই জীবনপাত করেন। আমরা সাধারণ বিচার বুদ্ধিতেই বুঝি যে গড়পড়তা লোকের সঙ্গে তুলনায় এই সব বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষেরা অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কাণ্টের কর্তব্যতত্ত্ব যেহেতু নিছক বিচার বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু তিনি এমন সব ব্যক্তির জীবনে— কর্মের তাৎপর্য বোঝেন নি। কাণ্টভক্ত মহাকবি শীলার তাই লিখেছেন যে 'Man not only **may** but should bring pleasure and duty into relation to one another; he should obey his reason with joy'।

এই বক্তব্যের জবাবে কাণ্ট অবশ্য বলেন যে, কোনো ব্যক্তি কর্তব্যের সঙ্গে তার মানসিক ঝোঁক মেলাবেনা তা নয় তবে সে ঝোঁক থেকেই কর্তব্য করবে না বা তার করা উচিত হবে না। তৎসত্ত্বেও কাণ্টের প্রস্তাবনায় কঠোরতা কিছু কমে না। কারণ, শেষ পর্যন্ত তিনি একমাত্র যুক্তি বিচারের পথেই কর্তব্য নির্ধারণের কথা বলেন।

(খ) কাণ্টের বক্তব্য যে অত্যন্ত কঠোর তার কারণ তিনি ব্যতিক্রমকে

অস্বীকার করেন। মহাপুরুষদের জীবন ও বক্তব্য থেকে আমরা জানি যে এমন কোনো নির্দেশ নেই যা বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম স্বীকার করে না। দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কর্ম আছে যা ব্যতিক্রম বলেই স্থায্য। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো আদর্শের জন্য জীবনপণ করেন তখন তাকে আমরা স্থায্য বলি কারণ সে রকম পণ অন্য সবাই করবে না। সবাই করলে আর তা থেকে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাবে না। যেমন আমাদের পুরনো উদাহরণে ব্রহ্মচর্যের কথা বলা হয়েছে। সবাই ব্রহ্মচর্য পালন করলে মনুষ্য জাতিই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। সেক্ষেত্রে কেউ যদি ভবিষ্যতের কথা ভেবে কুমার থেকে যায় তবে কাণ্ট তার কর্মকে নৈতিক বলবেন না। অথচ আমরা জানি যে কাণ্ট বিয়ে করাই সবার কর্তব্য বলেন না।

অনুশীলনী

১। Explain and examine Kant's theory of 'Categorical Imperative'

২। Does morality necessarily imply complete elimination of emotions and passions ? Examine in this connection Kant's theory of 'Duty for Duty's Sake.'

৩। Give a short critical account of Kant's ethical theory.

৪। What is Kantian Formalism ?

সপ্তম অধ্যায়

বোধিবাদ ও নৈতিক মান

১। বোধি বলতে কি বোঝায় (The nature of Intuition)

দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা ও দর্শনের আলোচনায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির কথা বারবার ওঠে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ থেকে জ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রপাত কারণ ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা বিচারের উপকরণাদি সংগ্রহ করে। বুদ্ধি ওই উপকরণের ওপর শৃঙ্খলা আরোপ করে। অভিজ্ঞতার বিচারে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ অবিসম্বাদী-ভাবে স্বীকৃত। অভিজ্ঞতা বলতে সাধারণতই ইন্দ্রিয়ের সংবেদন ও তজ্জাত ধারণাকেই বোঝায়। তবে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংবেদনে কোনো ফারাক নেই। তারা একই সঙ্গে চলে।

বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আরো একটি নতুন শব্দের ব্যবহার চলছে। তাকে বলা হয় বোধি (intuition)। বোধি বুদ্ধিও নয়, ইন্দ্রিয়জ সংবেদনও নয়। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্য ছাড়াই যখন প্রত্যক্ষত মন কোনো বস্তুকে জানে আমরা বলি বোধির দ্বারা ওই জ্ঞানটি সম্ভব হয়েছে। কর্মের নৈতিকতা বিচারে এই বোধি বুদ্ধির সাহায্য ছাড়াই জানে কেনো কোন্ কাজটি ভালো বা মন্দ। অধ্যাপক লিলির মতে বোধির তিন রকম বিষয়বস্তু আছে।

(ক) কোনো একটি বিশেষ কাজ ভালো কি মন্দ জানবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ ভাবেই জানতে পারি। যেমন, মহাভারতের কাহিনীতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ।

(খ) এক শ্রেণী বা একটি বিশেষ জাতের কর্মকে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে জানতে পারি সত্যিই তারা ভালো কি মন্দ। যেমন কাণ্টের বক্তব্য যে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করা উচিত নয়।

(গ) কর্ম বিচারের নৈতিক নিয়মও প্রত্যক্ষভাবে মন জানতে পারে। যেমন মানুষকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অধ্যাপক মুরহেড বোধিবাদের চরিত্র বিষয়ে লিখেছেন '(1) Conscience is something ultimately **simple** and underived. (2) Its judgments are **intuitive**. Acts of fraud and cowardice are condemned,

acts of truthfulness, courage, selfrestraint are approved, without reason sought or assigned. (3) Hence its peculiar **authority**, commanding our allegiance irrespective of all secondary considerations of pleasure or utility. (4) Hence, too, its **universality**. It is found among all races, the lowest as the highest, and in all moral individuals.' মুরহেডের ব্যাখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে যে বোধিবাদ যেহেতু ইন্দ্রিয়ের সংবেদন ও বুদ্ধি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে নৈতিকতা জানতে পারে তখন নিশ্চয়ই এমন কোনো বোধের কেন্দ্র আছে যা এই জানায় সাহায্য করে। বোধিবাদীরা তাকেই 'বিবেক' বলেন। বিবেকই কর্মের নৈতিকতা সরাসরি জানে। বিবেককে আমরা যে এতো মূল্য দিই তার কারণই হলো বিবেকের বোধি-জাত জ্ঞান। কারণ এই জ্ঞান থেকেই বিবেক আমাদের পরিচালনা করে। বিবেকের সর্বজনীনতার প্রমাণ এই যে বিবেক কম-বেশি সমস্ত মানুষেই উপস্থিত। বিবেক ছাড়া কোনো মানুষ কল্পনা করা যায় না, বিবেকই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। বিবেককে কোনো কিছু থেকে সিদ্ধান্ত হিসেবে পাওয়া যায় না।

বোধির বিরুদ্ধে নানা ধরণের আপত্তি তোলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ব্যক্তি ভাবে নিশ্চয়ই বিবেক আমাদের কর্মের ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে সাহায্য করে কিন্তু সমস্ত অবস্থাতেই যে বিবেক সব জানতে পারে তার কারণ নেই। কেনোনা আমরা বহুক্ষেত্রেই কর্মের বিষয়ে অনিশ্চিত থাকি, দ্বিধাদ্বন্দ্বে পীড়িত হই।

স্বভাবত বিবেকের শাসন কার্যকরী হলেও বিশেষ অবস্থায় বিবেকের নির্দেশ অস্পষ্ট থাকতে পারে বা বিবেক সম্পূর্ণই বিফল হতে পারে। বা, আমরা এ-কথাও জানি যে বিবেক সমস্ত অবস্থাতেই অভ্রান্ত নয়। কারণ, আমরা বিবেকের নির্দেশে অনেক কাজ করবার পর জানি যে কর্মটি যথোচিত হয় নি।

বিবেকের নির্দেশেও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। বিশেষ এক অবস্থায় বিবেক বিরোধী নির্দেশ দিতে পারে। তখন এই বিরোধ কে দূর করে?

২। অন্ধ বোধিবাদ (Dogmatic Intuitionism)

যে বোধিতত্ত্বে কর্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচার না করেই বিবেক নৈতিকতা জানতে পারে তাকে হেনরী সিজউইক নাম দিয়েছেন 'অন্ধ বোধিবাদ'। কাজের চরিত্র বিবেক স্থির করে, বিবেকই একমাত্র এবং চূড়ান্ত বিচারক। এক্ষেত্রে বোধিবাদীরা বিবেক বলতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিবেক বোঝাচ্ছেন না,

তাঁরা সামান্য বিবেকের কথা বলছেন। ব্যক্তির বিবেক সংশয় পীড়িত হতে পারে, ব্যক্তি বিচারে ভুল করতে পারে কিন্তু সামান্য বিবেক সমস্ত অবস্থাতেই অভ্রান্ত। অধ্যাপক মুরহেডের বৈশিষ্ট্যগুলিতেই এই বিবেকের চরিত্র স্পষ্ট হয়।

বোধিবাদীরা বিবেকের কথা বলেন কারণ তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন যে কর্মের চরিত্র তার নিজস্ব সত্তার ওপর নির্ভরশীল। বাইরের কোনো মান ব্যবহার করলে সর্বদাই আমরা কর্মের বিচারে বাহ্য বক্তব্যে পরিচালিত হবো। বাহ্য বক্তব্য বিভিন্ন অবস্থায় স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ নয়। নৈতিক বিচার সাপেক্ষ বক্তব্য হলে কখনোই তা সামান্য সত্যে পৌছাতে পারবে না। সামান্য সত্যের অভাবে তখন আমরা ব্যক্তিবিশেষের কর্মবিষয়ে উৎসুক হতে পারি কিন্তু তার ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে কোনো রায় দিতে পারি না। কারণ, তখন বলতে হবে যার যেমন উদ্দেশ্য তেমনি তার কর্ম।

সমালোচনা—(ক) যদি কিছু কাজ ভালো আর কিছু কাজ মন্দ হয় এবং তার কোনো যুক্তি জানা না থাকে, যদি বিবেকই একমাত্র বিচারক হয়, তবে নৈতিক বিচার ব্যক্তির খেয়াল খুশিতে পরিণত হবে। কারণ, প্রতিটি ব্যক্তিই তার বিবেকের দোহাইয়ে কাজ করবে এবং বিবেকের নামে কর্মের ন্যায্যতা দাবি করবে।

(খ) যদি বিবেক অবস্থা বিশেষে তার রায় পরিবর্তিত করে, যদি সমস্ত ব্যক্তির বিবেক একই রায় দেয় তবে আমরা নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য যে বিচারের কোনো নীতি বা মানদণ্ড আছে। এই মানদণ্ডের সাহায্যেই নিশ্চয়ই অবস্থা-বিশেষের চরিত্র ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং রায় দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সহজেই জানতে পারা যায় কোন্ সামান্য নীতির ওপর বিশেষ বিচারকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা ওই বিশেষ বিচারগুলোকে বিশ্লেষণ করলেই সামান্য নীতির পরিচয় পাই। তখন বোঝা যায় যে অন্ধ বা অদার্শনিক বোধিবাদ দর্শনের রাজ্যে চলে আসছে কারণ বর্তমানে আর দার্শনিক নীতিকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। যে দার্শনিক নীতি বাইরে থেকে তৈরি করা হচ্ছে ও বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। মানদণ্ডের প্রয়োজন করে কারণ কর্মের নৈতিকতা বিচার নীতির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

(গ) যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিবেক বোধিতে কর্মের চরিত্র জানতে পারে তবু সন্দেহ থাকে যে তা বিচার প্রক্রিয়া, বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করছে কেনো। তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, বিবেকের বিচার কোন্ কষ্টিপাথরে

বৈধ বলে স্বীকৃত হচ্ছে? যদি জবাবে বলা হয় যে তা নৈতিক যুক্তির ফল তবে, বোধিতত্ত্বে লক্ষ্য এসে পড়ে। নৈতিক কর্ম তখন স্পষ্টতই কোনো ভবিষ্যত লক্ষ্যের দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হয়। কর্মের ন্যায়অন্যায়কে আমাদের বুঝতে সুবিধে হয় লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে। মঙ্গলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত অবস্থায় নৈতিক বিচারের তাৎপর্য নিছক অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং বিবেককে তখন বাহ্য কোনো মানদণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

(ঘ) মনুষ্যসমাজে সর্বত্রই কোনো একটি নীতি কাজ করেনা। জনগোষ্ঠির ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নৈতিক বোধ জড়িত। বোধিতত্ত্বে নৈতিক বোধের বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করা যায় না। বোধিবাদীরা বিবেকের সর্বজনীনতা ধরে নিয়েছেন অথচ দেখছেন না বিবেক সর্বত্র একই কর্ম ও নৈতিকতা উপস্থিত করেনি। র‍্যাশডালের মতে 'The moral notions which have seemed equally innate, self-evident and authoritative to those who held them have **varied** enormously with different races, different ages, different individuals—even with the same individuals at different periods of life.'

(ঙ) বিবেকের নির্দেশে বিরোধ দেখা দিলে আমরা মঙ্গলের দ্বারা পরিচালিত হতে চাই কারণ মঙ্গল বা শ্রেয় বোধ ব্যতীত সেই বিরোধ থেকে আর কোন কিছুই মুক্তি দিতে পারে না। বোধিবাদীরা 'ন্যায়'কে সর্বাধিক মর্যাদা দেন। ন্যায় নিজে থেকেই ন্যায়, অন্য বিবেচনার ওপর তার সত্য নির্ভর করে না। কিন্তু আমরা বলতে চাচ্ছি যে 'ন্যায়' শ্রেয়র সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রেয়কে পালন করে বলেই কোনো কর্ম 'ন্যায়' আর করেনা বলেই কোনো কর্ম 'অন্যায়'।

অন্ধ বা অদার্শনিক বোধিতত্ত্ব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: (ক) নৈতিক বোধ ও (খ) নন্দন বোধ।

৩। নৈতিক বোধ তত্ত্ব (Theory of Moral Sense)

নৈতিক-বোধ বা ইংরেজী 'moral sense' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন হাচেসন তার 'সিসটেম অব মরাল ফিলসফি' গ্রন্থে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেমন করে আমাদের নৈতিকতার ধারণা জন্মায় ও জবাবে জানিয়েছিলেন, যেমন আমাদের রঙের বোধ জন্মায়। আমরা কোনো একটি রঙের নাম দিয়েছি 'লাল' কারণ আমরা কয়েকটি লাল বস্তুর উদাহরণ পেয়েছি। এই অভিজ্ঞতালব্ধ লালবস্তু থেকে লাল রঙটিকে তুলে এনে আমরা নির্বিশেষ লাল প্রত্যয়টি তৈরি

করি। একই রকমে নৈতিকতার বোধ আমরা তৈরি করি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঘটনার বিচার করে। বিশিষ্ট ঘটনার বিচার থেকে আমরা নৈতিক বক্তব্যটিকে আলাদা করে নির্বিশেষ তত্ত্বটি তৈরি করি। লাল বস্তুর লাল রঙটিকে যে আমরা জানতে পারি তার কারণ দৃষ্টিশক্তি নামক আমাদের একটি ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে লালকে লাল বলে চিনতে পারি। দৃষ্টিশক্তির অভাবে লাল নামক রঙটিকে চেনা সম্ভব হতো না। ঠিক একই রকমে নৈতিকতার ক্ষেত্রে নৈতিক বোধ নামক ক্ষমতার জন্যেই কর্মের ভালোমন্দ বুঝতে পারা যায়। এই ক্ষমতাটির অভাব ঘটলে আমাদের নৈতিক বোধ বলতে কিছু থাকে না। নৈতিক বোধের এই ক্ষমতাকে হাচেসন বলেন 'The moral sense .of beauty in actions and affections, by which we perceive virtue or vice in ourselves or other.' এই বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে কর্ম নিজেতেই ভালো বা মন্দ এবং নৈতিকবোধ আমাদের বিশেষ ঘটনার ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে অবহিত করে।

সমালোচনা—(ক) এই মতে বিবেক এমন একটি বোধ যার উৎস বিষয়ে আমাদের জানবার কিছু নেই। বলা চলে বিবেক হচ্ছে স্বসমুত্থ (sui generis) বা যা আপনা থেকেই জন্মেছে। বিবেকের সঙ্গে বুদ্ধিজাত বিচার বা নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের কোনো যোগ নেই। 'নৈতিক বোধ' সম্পূর্ণ পৃথক একটি 'চেতনা'। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে বিবেক নিশ্চয়ই বিচারের সঙ্গে জড়িত নইলে বিবেকের সঙ্গে জীবনযাত্রার কোনো সম্পর্ক থাকে না। তখন সমস্ত কর্মকেই পৃথক একটি অজ্ঞাত চেতনার সঙ্গে জড়িত হতে হয়।

(খ) নৈতিক বিচার যদি কেবল মাত্র বিবেকের বোধ বা চেতনা হয় তবে তাকে অন্যান্য চেতনা থেকে শ্রেষ্ঠ আসন দেবার কোনো যুক্তি নেই। যদি সত্যিই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় তবে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতার বিচার আছে। অর্থাৎ গৌণ বা অগৌণ স্থান যেহেতু নির্ধারিত হয় মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে, নৈতিক-বোধও বিচারের দ্বারা স্থির করা হচ্ছে। সুতরাং 'যুক্তি'র সঙ্গে বিবেকের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(গ) নৈতিকবোধ কেবলমাত্র 'চেতনা' বা 'সংবেদন' হলে তার সর্বজনীন বৈধতা থাকে না। সংবেদন হিসেবে সংবেদনের কোনো সত্য বা মিথ্যা নেই। বিচার ক্রিয়াতেই একমাত্র সত্য মিথ্যার প্রসঙ্গ থাকে। অথচ বিবেকের সংবেদ-নেই যদি কর্মের নৈতিকতা বিচার হয় তবে এক এক ব্যক্তির এক এক রকম

সংবেদন হতে বাধ্য এবং সেই সংবেদন অনুযায়ী নৈতিক বক্তব্যও পৃথক হতে বাধ্য। যেমন, হিন্দু নারীর সহমরণ প্রথা এককালে ভারতীয়দের কাছে সম্পূর্ণ নৈতিক মনে হয়েছে অথচ য়ুরোপীয়দের মনে হয়েছে বর্বর আচরণ। মানুষের বিবেক যদি একই সংবেদন তৈরি করবে তো নৈতিক বিচারের বিভিন্নতা ঘটার কারণ থাকতো না। একই কর্ম বিষয়ে বিরোধী নৈতিক বিচার সম্ভব হলে নীতিশাস্ত্রের কোনো তন্নিষ্ঠ (objective) মানে থাকে না। কাজেই নৈতিক বিচারের যদি তন্নিষ্ঠ মান থাকে তবে তা কখনোই সংবেদন-নির্ভর নয়, তার সঙ্গে বিচারের সম্পর্ক আছে।

(ঘ) অধ্যাপক স্টিফেনের মতে সংবেদন আমাদের নৈতিক বাধ্যতার চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে না। কোনো কাজ আমাদের মনে বিশেষ অনুভূতি জাগাতে পারে কিন্তু কেনো তাকে আমরা মানবো, কেনো মানা উচিত ইত্যাদিকে সংবেদন ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(ঙ) নৈতিক বিচারের সঙ্গে জীবনের শুভ-অশুভের কল্পনা জড়িত। শুভ-অশুভর বোধ কোনো ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভর করে না। তার কল্পনা ও ধারণা মানুষের জ্ঞান ও বিচারই তৈরি করে। সুতরাং নৈতিক বোধ বিচার ব্যতীত সম্ভব নয়।

(চ) নৈতিকবোধ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-নির্ভর হলে তাকে মনের আবশ্যিক অংশ বলা যায় না। কারণ কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব ঘটলেও মানুষ মানুষ থাকে। কিন্তু বিবেক না থাকলে মানুষ আর মানুষ নয়। সুতরাং মানুষ যেহেতু বিবেক ছাড়া মানুষ নয়, বিবেকও ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা ইন্দ্রিয় সংবেদন মাত্র নয়।

(ছ) নৈতিক বোধতত্ত্ব অনুশোচনা ও অন্যায় বোধকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিচার বুদ্ধিতেই মানুষ ন্যায়-অন্যায় জানে কারণ অন্যায়ের ধারণা থেকেই অনুশোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। কিন্তু আলোচ্য তত্ত্বে অনুশোচনার সুযোগ নেই।

৪। **নন্দনবোধ তত্ত্ব (Aesthetic Theory)**

নন্দনতাত্ত্বিক মতে একমাত্র সৌন্দর্যই নৈতিকতা বিচারের চূড়ান্ত মান। এই বক্তব্যে আমরা বলতে পারি নৈতিকতা ও সৌন্দর্য, অনৈতিকতা ও কুশ্রীতা সমার্থক। হাচেসন, শ্যাফ্‌টসবেরী, রাস্কিন প্রমুখরা এই মতের সমর্থক। শ্যাফ্‌টসবেরী লিখেছেন 'What is beautiful, is harmonious and

proportionable; what is harmonious and proportionable is tiue; and what is beautiful and true is agreable and good. আবার শ্যাফ্‌টসবেরী বলেন 'Beauty and good are one and the same'. হাচেসন বলেন The moral beauty and deformity of actions'। রাস্কিন লেখেন 'Taste is not only the index of morality; it is the only morality. Tell me what you like and I will tell you what you are.' হাচেসন দুরকম শুভত্বের কথা বলেন, (ক) বস্তুগত শুভত্ব ও (খ) রূপগত শুভত্ব। বস্তুগত শুভত্ব সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ। রূপগত শুভত্ব জানা যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসমঞ্জস কর্মের চরিত্র থেকে।

হাসচেন তাঁর 'সুষমা (harmony) তত্ত্বের ওপর নৈতিকতাকে দাঁড় করান কারণ তিনি ব্যক্তিগত ও সাধারণ মঙ্গলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। হাচেসন ও শ্যাফ্‌টসবেরীর বক্তব্যের সমস্যা বিষয়ে সিজউইক বলেছেন 'It remains to consider how, from the doctrine that affection is the proper object of approbation, we are to deduce that moral rules or 'natural laws' prescribing or prohibiting outword acts.' অর্থাৎ সিজউইক জানতে চাচ্ছেন অনুরাগের সংবেদনেই যদি কর্মের ভালোমন্দ তৈরি হয় তবে আমাদের জানা দরকার কেমন করে নৈতিক নিয়ম প্রস্তুত হবে। একথা সবার জানা যে, যে কর্মে সর্বসাধারণের মঙ্গল হয় সে কর্ম আমার শ্রেষ্ঠ সমর্থন পায়। কিন্তু যদি তা 'নির্মোহ-মমতা' থেকে তৈরি না হয়? হাচেসন অবশ্য এ প্রশ্নের জবাবে মধ্যযুগীয় স্কলাটিক দর্শনের 'বস্তুগত' ও রূপগত' বিভাগটি ব্যবহার করেন। ওঁর ভাষ্যে 'An action is **materially** good when in fact it tends to the interest of the system, so far as we can, judge of its tendency, or to the good of some part consistent with that of the system, whatever were the affections of the agent. An action is **formally** good when it flowed from good affection in a just proportion.' এই ব্যাখ্যা থেকেই হাচেসন উপযোগিতাবাদের দিকে ঝোঁকেন এবং বস্তুগত শুভর এমন একটি ব্যাখ্যা দেন যা পরবর্তী কালে বেন্টাম গ্রহণ করেন। হাচেসন তাকেই বস্তুগত শুভ বলেন যা 'which procures the greatest happiness for the

greatest numbers, and the worst which in a like manner occasions misery.' হাচেসনের রূপগত বক্তব্যের সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ জড়িত। তিনি just proportion অর্থাৎ সঙ্গতির কথা বলেছেন, সৌন্দর্যে এই সঙ্গতি থাকা দরকার যা কোনো রকম আতিশয্য বা ন্যূনতাকে দূর করে। বস্তু যদি সঙ্গতিতে সুন্দর হয় তবে কর্মও নিশ্চয়ই সঙ্গতিতে সুন্দর। কর্মের সৌন্দর্যকেই আমরা নৈতিকতা বলবো যেহেতু কর্মের সঙ্গতিতে অন্য সবার সম্পর্ক স্বীকৃত।

সমালোচনা—(ক) সৌন্দর্য বোধ নির্মোহ ও নিঃস্বার্থ। কারণ সৌন্দর্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রয়োজন জড়িত হলে সঙ্গতির কথা চাপা পড়বে, প্রধান হয়ে উঠবে নিজেদের কথা। শুভ ও সুন্দরকে আমরা নিজেদের কথা ভেবে স্বীকার করি না, তাদের স্বকীয় চরিত্রের জন্যই গ্রহণ করি। তৎসত্ত্বেও কিন্তু ন্যায় ও সুন্দরকে এক এবং অভিন্ন ভাবা চলে না। সৌন্দর্য আমাদের মাতাতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে কোনো বাধ্য বাধকতার যোগ নেই। নৈতিক বিচারের আসল লক্ষ্যই কিন্তু কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা—যা উচিত হিসেবে আমাদের মানতেই হয়। কর্তব্যের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে যন্ত্রনা জড়িত থাকে কিন্তু সুন্দরের সঙ্গে যন্ত্রণার কোনো সম্পর্ক নেই।

(খ) সৌন্দর্যের বোধ মন্ময় (subjective) এবং বিষয়ী-সাপেক্ষ। কাজেই বিষয়ীর অনুভূতিতে সুন্দরের বোধ জন্মে ও লয় পায়। সেক্ষেত্রে সুন্দর সম্পর্কে একটি সর্ববাদীসম্মত বক্তব্য তৈরি করা যায় না। অথচ নৈতিক বক্তব্য সবার ক্ষেত্রে একই রকমে প্রযোজ্য এবং তা সব অবস্থাতেই একটি সামান্য নিয়ম।

(গ) সঙ্গতি ও সুষমা আমাদের মনে সুন্দরের বোধ জন্মাতে পারে কিন্তু সুন্দরের বোধ থেকে আমাদের যে নৈতিক বোধ জন্মাবেই এসব কোনো কারণ নেই। যেমন বিকলাঙ্গ শিশু সঙ্গতি নষ্ট হওয়াতেই বিকলাঙ্গ। ব্র্যাডলী বলেছেন তাকে মেরে ফেলা নৈতিকভাবে অন্যায় নয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের বক্তব্যে তা হয়তো সমর্থনীয় কিন্তু ব্র্যাডলীর বক্তব্য সবাই মানতে রাজী নন কারণ জীবন কেবলমাত্র সঙ্গতি ও সুষমা নয়। প্রাণের দাবীতে এই বিকলাঙ্গ শিশুটিও নৈতিকভাবে বাঁচার দাবী করতে পারে। সুতরাং সুন্দর প্রত্যয়টি নৈতিক কর্মের বিচারক নয়। অসুন্দরভাবে সৎকর্ম করলেও কর্মটি সৎ থাকে।

(ঘ) নৈতিক বোধের সঙ্গে আমাদের অনুমোদন ও আপত্তি জড়িয়ে থাকে। অনৈতিক কর্ম বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত বিরাগ। কিন্তু সৌন্দর্যের বোধ কোনো

ব্যক্তিতে অনুপস্থিত থাকলে তাকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করি না বা তার বিভিন্ন কর্মকে অনৈতিক বলতে পারি না।

(ঙ) অধ্যাপক ব্রাইস বলেন যে সৌন্দর্যের তৃপ্তিকে কখনোই কর্তব্যে রূপান্তরিত করা যায় না। শ্যাফ্‌টসবেরী ও হাচেসন সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই উপযোগিতাবাদের দিকে ঝোঁকেন। সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গলের কথা বলেন। অর্থাৎ কর্মকে তাঁরা ফলাফলের সঙ্গে মিশিয়ে দেখতে চাচ্ছেন এবং শুধুমাত্র সৌন্দর্য দিয়ে কর্মকে বিচার করছেন না।

(চ) সৌন্দর্যের বিচার জীবনের বিশেষ একটি অংশের সঙ্গে (সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু জীবনের এমন কোনো অংশ নেই যে বিষয়ে নৈতিক বিচার রায় দেয় না। সমস্ত কর্মেই নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গ থাকে।

(ছ) সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে সুন্দরের অস্তিত্বের যোগ আর নৈতিক বিচারের সঙ্গে ঔচিত্যের। অস্তিত্ব ও ঔচিত্যে যে-ফারাক সে-ফারাক নৈতিক বিচার ও সৌন্দর্য বিচারে। সুতরাং হাচেসনের মতো তাদের অভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

(জ) সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক বোধের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে র‍্যাশডালের মতে নৈতিকবোধকেই সমর্থন করতে হবে। কারণ নৈতিক বোধ সমগ্র সত্তার, সৌন্দর্যবোধ কেবলমাত্র সত্তার কোনো একটি অংশের। অনেক সময় নৈতিক মঙ্গল ও নন্দনতাত্ত্বিক মঙ্গলে পার্থক্য থাকে, আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে নৈতিক মঙ্গলটাই আমাদের কাম্য। কারণ নৈতিকভাবে অশুভ অথচ নন্দনতাত্ত্বিকভাবে শুভ জীবনকে শান্তি দিতে পারে না।

৫। মার্টিন্যুর বোধিবাদ (Intuitionism of Martineau)

মার্টিন্যুর বক্তব্য অনেকটাই হাচেসনের সঙ্গে মেলে। তিনি প্রথমে কর্মের উৎসের একটি মনস্তাত্ত্বিক তালিকা দেন। পরে ওই কর্মের উৎসকে নৈতিকভাবে একটি স্তর পর্যায়ে সাজান। এই স্তর বিভাগ দেখেই বোঝা যাবে কোন্ কার্যটি ভাল বা মন্দ। এই তালিকার সঙ্গেই মার্টিন্যু জানাচ্ছেন যে কর্মের লক্ষ্য থেকেই কর্মের চরিত্রের ব্যাখ্যা হবে। আবেগ, মনোভাব ও বাসনা কামনাই কর্মের মনস্তাত্ত্বিক [illegible]। মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের ওপর মার্টিন্যু এবার হাচেসনের নৈতিকবোধকে চাপান। বলেন বিবেক হলো অনন্য একটি নৈতিকবোধ যা প্রায় অনুভবের মতই সংবেদনে এক মুহূর্তেই কর্মের উৎসের ভালোমন্দ বুঝতে পারে। কর্মের উৎসগুলি কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে স্থির আছে।

কর্মের উৎসগুলিকে মার্টিন্যু লক্ষ্য (মোটিভ) বলেন। এই আবেগকে তিনি আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রাথমিক আবেগ ও লক্ষ্য প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা চালিত। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ের আবেগগুলি প্রকৃতির নিয়মে উদ্ভূত হলেও বিবেচনা ও চিন্তার দ্বারা সংস্কৃত। প্রথমটির চাপে আমরা লক্ষ্যকে না ভেবেই চাই, আর দ্বিতীয়টির চাপে বস্তুকে চাই সুখের জন্য। প্রথমটিতে লক্ষ্যের স্পষ্ট ধারণা থাকে না কিন্তু দ্বিতীয়টিতে লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

মার্টিন্যুর মতে কোনো দুটি লক্ষ্যের এক মূল্য নেই। কর্মের উচিত বা অনুচিত ব্যাপারে দুটি কথা আমাদের স্থির করতে হয়। (ক) লক্ষ্যের স্তরবিভাগে লক্ষ্যের স্থানটি কোথায় ও (খ) যে-বিরোধী লক্ষ্যকে বর্জন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিচয় কি।

মার্টিন্যুর তালিকা নিম্নতম প্রবৃত্তি বা লক্ষ্য

(ক) মাধ্যমিক লক্ষ্য—সন্দেহ প্রবণতা, প্রতিশোধমলক প্রবৃত্তি ইঃ;

(খ) মাধ্যমিক জৈব ঝোঁক—আরামে থাকবার কামনা ইঃ

(গ) প্রাথমিক জৈব ঝোঁক—যৌন ক্ষুধা ও খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন বোধ।

(ঘ) প্রাথমিক পশুজনোচিত ঝোঁক—ইচ্ছামলক কর্ম

(ঙ) লাভের ইচ্ছা

(চ) মাধ্যমিক প্রস্তুতি—আবেগজাত সমর্থন

(ছ) প্রাথমিক আবেগ—ভয, বিরাগ, ক্রোধ

(জ) মাধ্যমিক পশুজনোচিত ঝোঁক—ক্ষমতার লোভ ইঃ

(ঝ) মাধ্যমিক আবেগ—সংস্কৃতির ইচ্ছা

(ঞ) প্রাথমিক মনোভাব—বিস্ময় ও শ্রদ্ধা

(ট) প্রাথমিক প্রস্তুতি--পিতার প্রেম, সামাজিক বন্ধুত্ব

(ঠ) প্রাথমিক করুণা

(ড) প্রাথমিক শ্রদ্ধা।

মার্টিন্যু স্বেচ্ছামূলক স্বাধীন কর্মকেই নৈতিক বিচারের বিষয় বলেন। ওঁর মতে প্রত্যেক স্বাধীন কর্মেই বিরোধী লক্ষ্য থাকে। বিরোধের মধ্য থেকে বিবেক নিজেই একটি লক্ষ্যকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বেছে নেয়। আমার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে বাছাই করা ও খারাপটিকে বর্জন করা।

মার্টিন্যু লিখেছেন 'Every action is **right,** which, in presence of a lower principle, follows a **higher**; every action is **wrong,**

which, in presence of a higher principle, follows a **lower.**' লক্ষ্যের বিরোধ ছাড়া বিবেক কিন্তু বাছাই করতে পারে না। কারণ তাঁর মতে প্রতিটি লক্ষ্যের নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তাদের সম্পর্ক ওই স্তরবিভক্ত ক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হয়। ওঁর ভাষায় 'Every one of them lying between a lower and a higher, is **right** in competition with the former, **wrong** when resisting the latter, and cannot be judged without reference to its alternative.'

সমালোচনা—(ক) মার্টিন্যু কর্মের উৎসকে প্রবৃত্তি নাম দিয়ে ভুল করেন। কারণ যা কর্মের উৎস তার সঙ্গে কর্মের ঔচিত্যের কোনো যোগ নেই। যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণকে আমার নৈতিক বিচার বলি না। লক্ষ্য (motive) সচেতন ভাবে স্থির করা হয়। সুতরাং স্বাধীন কর্মের লক্ষ্য হিসাবেই তাদের একমাত্র নৈতিকতার সঙ্গে সংযোগ।

(খ) মার্টিন্যু বলেছেন যে প্রবৃত্তির স্তরবিভক্ত ক্রম, ভালোমন্দের ক্রমটি বিবেক এক মুহূর্তে নিজে থেকে জানে। কিন্তু এ-কথা সত্য হতে পারে না। কারণ ছকটি মার্টিন্যুর তৈরি এবং তিনি তা বিচার বিবেচনা করে তৈরি করেছেন। যদি সবার ক্ষেত্রেই বিবেকের এই প্রবুদ্ধ জ্ঞানটি সত্য হতো তবে তালিকাটিও জানা থাকতো। অথচ মার্টিন্যুর তালিকা যে সবাই স্বীকার করবেন তা নয়।

(গ) মার্টিন্যুর তালিকায় উচ্চনীচ বিভাগ আছে। কিন্তু দুটি প্রবৃত্তির মধ্যে এমন কোনো উচ্চনীচের সামান্য সম্পর্ক সম্ভব নয়। এক এক সময় এক একটি শ্রেষ্ঠ। যেমন অবস্থা তেমনি তাদের বিচার হয়। কর্মের কোনো নির্দিষ্ট দৃঢ় বিভাগ হতে পারে না। যদি করুণা ও প্রতিবাদের দ্বন্দ্ব হয় তবে কথনোই বলা চলে না যে একমাত্র করুণাই শ্রেষ্ঠ।

(ঘ) বিবেক ওঁর মতে জন্মগত। এই বিবেকটি সার্বভৌম ও সত্য। কিন্তু বিবেকের স্বীকৃতির পরেও বিচারে বিভিন্নতার প্রশ্ন আছে। বিভিন্নতার কারণেই বিবেকের বিচারে ভ্রান্তি দেখা যায়। সুতরাং আমরা কথনোই বিবেককে অভ্রান্ত বলতে পারি না।

২। দার্শনিক বোধিবাদ (Philssophical Intuitionism)

দার্শনিক বোধিবাদের বক্তব্যে বিবেক অনুমান সম্পর্কিত ঘটনার বিচার করে। বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মের ন্যায় অন্যায় উপলব্ধি করে এবং বিশেষ

ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করে, উচিত্যের বিচার করে। এই মতের তিনজন প্রধান প্রবক্তা ক্লার্ক, কাড´ওয়ার্থ ও হোলাস্টন।

ক্লার্ক (১৬৭৫-১৭২৯)—ক্লার্ক বলেন মানুষ ও বস্তুকে কেন্দ্র করে কতোগুলো শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বর্তমান। এই সম্বন্ধগুলোই সত্য ও নীতির ভিত্তি। গণিতে দুই আর দুইয়ের যোগফল যেমন স্থির ও নির্দিষ্ট তেমনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির কার্যকারণের মতো মানুষের নৈতিক নিয়ম। ক্লার্ক লিখেছেন ওঁর চেষ্টাই হবে নৈতিক বক্তব্যকে 'to place morality among the sciences capable of demonstration, from self-evident propositions, as incontestible as those in mathematics'. অর্থাৎ ক্লার্ক চাচ্ছেন নৈতিকতত্ত্ব প্রথমত বিজ্ঞান হবে; দ্বিতীয়ত, তাকে প্রমাণ করা যাবে, ও তৃতীয়ত, গণিতের মতো স্বতঃসিদ্ধের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত হবে। নৈতিকতত্ত্বকে এই পর্যায়ে আনতে পারলে আর দেশকালপাত্র ভেদে তার স্বরূপ পরিবর্তিত হবে না। ক্লার্ক তাঁর বক্তব্যে হব্‌স ও লকের বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে চান যে, আত্মনির্ভর স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক সূত্রগুলোকে আপনা থেকেই জানা যায়, তারা সুখ দুঃখের ওপর নির্ভর করে না।

ক্লার্ক তাঁর আলোচনায় দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে চাচ্ছেন। (ক) নৈতিকতার স্বতঃসিদ্ধ ও অক্ষয় সূত্রগুলো কি? ও (খ) ব্যক্তির সঙ্কল্পের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি? তিনি সম্পর্কের সূত্রটি আবিষ্কার করেন একটি তত্ত্বে, যাকে বলেন fitness and unfitness of the application of different things or different relations to one another'। অর্থাৎ সম্বন্ধের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার সঙ্গে নৈতিকতার যোগ। এই উপযুক্ততাকে আবার বিচার করতে হয়। বিচারের নীতিটি হলো 'fitness or suitableness of certain circumstances to certain persons, and unsuitableness of others, according to the nature of things and the qualification of persons' অর্থাৎ ব্যক্তি ও অবস্থার ওপর উপযুক্ততা নির্ধারিত হয়। এই উপযুক্ততাকে অবশ্য বোধিতে জানা যায়, গণিতের মতোই তাদের সম্পর্ক বুদ্ধি গ্রাহ্য। সততার চারিটি নীতির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বিষয়টি স্থির করেন। এই নীতিগুলি হচ্ছে

(ক) ঈশ্বরভক্তি (piety towards god), (খ) সাম্য (Equality), (গ) সহযোগীদের সম্পর্কে উপচিকীর্ষা (Benevolence towards our fellows), ও (ঘ) নিজের সত্তার প্রতি সংযম, যাকে ক্লার্ক বলেন 'sobriety'।

সমালোচনা—হেনরী সিজউইক বলছেন এই বচনগুলির স্বতঃসিদ্ধতা মানলেও সমস্যা থাকে। কারণ, আমরা জানতে চাইবো এই নীতিগুলির জ্ঞান কতোদূর পর্যন্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে বা তাদের করা উচিত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এ-বিষয়ে ক্লার্কের বক্তব্য তেমন স্পষ্ট নয়। কারণ ক্লার্ক গণিতের ভাষা ব্যবহার করছেন, যা 'অস্তি' (is) বিষয়ে বিবেচনা করে, আর নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য উচিত (ought)। তিনি সরাসরি একবার লিখছেন যে 'Originally and in reality it is as natural and (morally speaking) necesary that the will should be determined in every action by the reason of the thing and the right of the case, as it is natural and (absolutely speaking) necessary that the understanding should submit to a demonstrated truth.' ক্লার্কের মতে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সর্বদাই বস্তুর যুক্তি এবং বিবেচ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত বোধ থেকেই নিজের কর্তব্য স্থির করবে। কিন্তু পরেই তিনি মানতে বাধ্য হচ্ছেন যে, অন্যায়ের সঙ্গে সুখ বা দুঃখ জড়িত হলে অবস্থাটা পালটে যায়। তিনি নিজেই স্বীকার করছেন 'if thereby they deprieved themselves of all possibility of receiving any advantage from their adherence' তবে কর্মের বদল সম্ভব। অর্থাৎ তিনি স্বতঃসিদ্ধ নীতি ও অক্ষয় নৈতিকতার সঙ্গে এবার ব্যক্তিবিশেষের বিবেচনাকে জুড়ছেন। ফলেযুক্তির এই দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় তাঁর গাণিতিক প্রত্যয়টির চরিত্র নষ্ট হয়। অর্থাৎ যেমনখুশি দুদিকেই প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আমরা প্রশ্ন করতে পারি, যদি স্বতঃসিদ্ধ নীতি থাকে তবে উপযুক্ততা কি ভাবে বিচার করা হবে? বোধিতে গাণিতিক যুক্তি ধরা পড়তে পারে কিন্তু তা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হবে না কেনো? উপযুক্ততা স্থির করবার জন্যে নীতির প্রয়োজন থাকে। অথচ ক্লার্ক বলছেন উপযুক্ততার বোধ থেকেই নীতি তৈরি হবে। আমরা কার্যত উপযুক্ততা বিচার করি লক্ষ্য বস্তু বা কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। লক্ষ্য বা কল্পনাকে বলি আদর্শ, আদর্শ পূর্বেই স্থির করতে হয়, কাজেই উপযুক্ততা বিচারের পূর্বেই আমাদের বিচারের মানদণ্ড প্রয়োজন।

ক্লার্ক তার প্রয়োজন বোধ করেন না কাজেই তিনি কর্মের নৈতিকতা ও উপযুক্ততাকে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে করে তোলেন।

(খ) কাডওয়ার্থ (১৬১৭—১৬৮৮)—ক্যামব্রিজ প্লেটোপন্থীদের মধ্যে কাডওয়ার্থের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সিজউইকের ভাষায় কাডওয়ার্থের খোঁজ ছিলো "to uphold the essential and eternal distinctions of good and evil as independent of mere arbitrary Will, whether human or divine'। কাডওয়ার্থ কোনো রকম খেয়ালী নীতিকে মানতে চাননি। ঈশ্বরেরই হোক আর মানুষের হোক, ন্যায়-অন্যায়ের তারতম্য কখনোই খেয়াল খুশি হতে পারে না। তার নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, কারণ ন্যায়ের চরিত্র যেমন স্পষ্ট, অন্যায়েরও তাই। তিনি কার্যত হবসের বক্তব্যকে অস্বীকার করেন যে, ন্যায়-অন্যায় সার্বভৌমের ইচ্ছা। তেমনি তিনি ডান স্কোটাস ও অক্কমের মতকেও বর্জন করেন যে, নৈতিকতা ঈশ্বরের খুশি মাত্র।

ওঁর মতে শুভ ও অশুভর বস্তুগত বা তন্নিষ্ঠ (objective) চরিত্র আছে, যুক্তিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন যুক্তিতে জানা যায় স্থানের সম্পর্ক ও সংখ্যার হিসেব। গণিতের মতোই নৈতিকতাকে জানা যায় বুদ্ধিতে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে নয়।

(গ) হ্বোলাস্টন (১৬৫৯-১৭২৪)—ক্লার্কের অনুসরণে হ্বোলাস্টন বলেন যে 'there is a moral fitness and unfitness in actions, prior to all will, which determines the Divine conduct' এবং নৈতিক নীতিকে আমরা যুক্তি দিয়ে জানতে পারি। তাকেই হ্বোলাস্টন অন্যায় বলেন যা 'is contrary to the nature and reason of things'। কিন্তু তিনি কোথাও জানান না এই বিমূর্ত যুক্তিটি কি। তিনি কার্যত মনস্তাত্ত্বিক ভাবে জানতে চাচ্ছেন বিবেক কি কি নির্দেশ দেয়: কিন্তু এই নির্দেশগুলিকে সাজিয়ে স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে দাঁড় করানো বিষয়ে হ্বোলাস্টনের কোনো উৎসাহ নেই।

ওঁর মতে সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করলেই অন্যায়ের সূত্রপাত হয়। যেমন বাবা-মাকে সম্মান করা পুত্রের কাজ। এ কাজে অমান্য করলে তাকে অন্যায় বলা হবে। অন্যের সম্পত্তি চুরি করা পাপ কারণ তার দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে যে অপহৃত সম্পত্তির মালিক অন্য ব্যক্তি।

সমালোচনা—দার্শনিক বোধিবাদ নৈতিক নিয়মগুলোর ভিত্তি বিষয়ে আলোচনা করে না। কেনো তাদের স্বীকার করা হবে সেকথাও জানায় না।

নৈতিক ধারণাগুলোর ভালো-মন্দ বিষয়ে এই তত্ত্ব মনস্তাত্বিক আলোচনা করে কিন্তু তার নৈতিক উৎস বিষয়ে চর্চা করে না। কেনো এদের যথার্থ বলা হবে তা কখনোই জানা যাচ্ছে না।

এই বক্তব্যে নৈতিক নিয়ম অক্ষয় ও অপরিবর্তনীয়। অথচ ব্যক্তি বিশেষে তার তফাৎ দেখা যাচ্ছে। অক্ষয় নিয়ম ও ব্যক্তিবিশেষের পৃথক বিবেচনা কি ভাবে সম্পর্কিত হবে তা বোধবাদীরা স্পষ্ট করেন না। ফলে এই বিরোধের সঠিক মীমাংসা এই তত্ত্বে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই মতবাদ গাণিতিক হওয়ায় নৈতিক আদর্শের কথা বলে না। অথচ আদর্শ ছাড়া নৈতিক নিয়ম অর্থহীন। কারণ গণিত ঔচিত্যের আলোচনা করে না। বস্তু বা সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করে মাত্র।

অনুশীলনী

১। Estimate the value of intuitionism as an ethical theory.

২। What is Intuition? Is diversity of morals compatible with Intuitionism?

অষ্টম অধ্যায়

পূর্ণ পরিণতিবাদ

১। **পরিণতি বলতে কি বোঝায় (Nature of Perfection)** ব্যক্তির পরিণতিকেই আমরা নীতিশাস্ত্রের একটি লক্ষ্য বলেছি। পরিণতির সঙ্গে সময়ের যোগ অনিবার্য। কারণ পরিণতিতত্ত্বে যা-আছে তাকেই পরিপূর্ণ মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। যা-আছে তা কেবল একটি স্বীকৃতি মাত্র, যাকে আমরা 'অস্তি' বলেছি। অস্তির স্বীকৃতি থেকে যেই ঔচিত্যে রূপান্তরিত হবার কথা ওঠে, অমনি বোঝা যায় যে স্বাধীন কর্মরত ব্যক্তিকে অন্য কিছু হতে হবে যা সে এই মুহূর্তেই নয়। কাজেই সময়ে তার পরিবর্তনের কথা থাকে। প্রতিটি মুহূর্ত ও দণ্ডপলে আমরা দেখতে চাইবো কেমন করে ব্যক্তি অন্য কিছু হচ্ছে ও কতোটুকু হচ্ছে। ব্যক্তির হওয়াটা তার জীবদ্দশা জুড়ে চলে। সুতরাং জীবদ্দশা অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তার সমস্ত কর্মকে বিচার করা হবে। তার কর্ম দিন থেকে অন্য দিনে এক থাকে না, এমন কি একটি দিনেই সে নানা কাজ করে। কিন্তু সে যে-কোনো কাজই করুক, তার যাবতীয় কাজে তার চরিত্রের ছাপ পড়ে। চরিত্রও এক মুহূর্তে কিছু নির্দিষ্ট প্রত্যয় নয়, তারও পরিবর্তন আছে। কর্মের মধ্যেই যেহেতু পরিবর্তন জানা যায়, চরিত্রকে আমরা বিচার করি কর্ম ও পরিবর্তনের সূত্রে। কর্মকে ও কর্মের পরিবর্তন অনুযায়ী চরিত্রের পরিবর্তনকে সময়ের হিসেবে দেখলে শুধুই অবস্থান্তর বোঝা যায়। তাৎপর্য বুঝবার জন্য আমাদের বাড়তি প্রত্যয়ের প্রয়োজন। এই বাড়তি প্রত্যয়টিকে আমরা মানদণ্ড বলি। মানদণ্ড বিচার বিবেচনা প্রসূত। ব্যক্তির চরিত্রকে বিচারের জন্য পরিণতি অর্থাৎ তার হয়ে ওঠার লক্ষ্যকে আমরা আত্মবিকাশের নীতিতে বুঝবার চেষ্টা করছি। **আত্মবিকাশকেই** আমরা বলেছি **তার বর্তমান অস্তিত্ব থেকে ভবিষ্যত রূপান্তরের কথা।**

অস্তি থেকে ঔচিত্য

ইতিহাসে যদিও প্লেটো এবং এরিষ্টটল পরিণতির মানদণ্ডেই সমস্ত জগতের মূল্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন তবু বর্তমানকালে পরিবর্তনের প্রসঙ্গ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে জড়িত। হেগেল ও কোঁতের দার্শনিক প্রস্তাবনা থেকেই লামার্ক ও ডারউইনের সূত্রপাত। পরবর্তী

ধাপে হর্বর্ট স্পেনসর এই অভিব্যক্তিবাদের প্রত্যয়টিকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করবার চেষ্টা করেন। নৈতিক বিচারে অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা উঠলে আমরা গোড়াতেই মানি যে নৈতিকবোধ ও বিচারের পরিবর্তন আছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হয়, অভিব্যক্তিবাদ নৈতিকতা বিচারে কতোটুকু সাহায্য করে? আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে ব্যক্তির কর্মের পরিবর্তন আছে এবং পরিবর্তিত কর্মের মধ্য দিয়েই সে তার লক্ষ্য অনুযায়ী কল্পনার চরিত্রটিকে প্রস্ফুটিত করে। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদ যদি শুধু পরিবর্তনের কথা কথা বলে তবে নৈতিকতার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। কিন্তু যদি সে বলে যে পরিবর্তনের সঙ্গে নীতি ও লক্ষ্য জড়িত তবে আমরা জানতে চাইবো সেই লক্ষ্যের স্বরূপ কী এবং কোন কোন্ কর্মে তার পরিচয় প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রত্যেক পরিবর্তনেই **তিনটি** পর্যায় থাকে। শুরু, পরিবর্তনের ধারা ও পরিণতি। আমরা কিন্তু অভিজ্ঞতায় কেবলমাত্র পরিবর্তনের ধারাটিকেই পাই। যেমন, কবে কখন কোন্ প্রাণী কি রূপে তার অভিব্যক্তি শুরু করেছে এবং বর্তমান অবস্থার পরেও তার আর কোনো সম্ভাব্য পরিবর্তন হবে কিনা, আমরা জানতে পারিনা। একই রকমে নৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা আদিম অবস্থা সঠিক জানিনা বা ভবিষ্যত পরিণতির রূপটাও চোখের সামনে নেই। আমরা কেবল মাত্র বর্তমান অবস্থাটিকেই জানি। অথচ বিচারে আমরা হয় **সূত্রপাত** অথবা **পরিণতি** ছাড়া পরিবর্তনের স্বরূপ জানতে পারি না। এই বক্তব্য থেকে দুটি পদ্ধতি পাওয়া যায়, জন্মের বিচার ও পরিণতির বিচার।

প্রথম পদ্ধতিকে আমরা ইতিপূর্বেই বর্জন করেছি। কারণ উৎপত্তির দ্বারা তাৎপর্য বোঝা যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানিয়েছি যে উৎপত্তির বিচার 'অস্তি' বিষয়ে চিন্তিত, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে আমরা ঔচিত্য বিষয়ে চর্চা করি।

হর্বর্ট স্পেনসর—হর্বর্ট স্পেনসর তাঁর 'প্রিন্সিপল্স অব এথিক্স' গ্রন্থে অভিব্যক্তিবাদের ধারণাকে নীতিশাস্ত্রে প্রয়োগ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে আচরণের ভালোমন্দ বলতে আমরা কী বুঝি? স্পেনসর বলছেন যে, সমস্ত প্রাণীরই আচরণ আছে, আচরণের ভালো-মন্দও আছে। তিনি তাই নিম্নতর প্রাণীর নজীরে বলেছেন যে তার জীবন কার্যত 'The continuous adjustment of internal relations to external relations' অর্থাৎ বাইরের প্রতিকূলতার চাপে জীবদেহটি সর্বদাই ভেতরে ও বাইরে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। কারণ খাপ খাওয়াবার সঙ্গে তার বাঁচামরা জড়িত। তার

সমস্ত আচরণ এই খাপ খাইয়ে নেওয়াকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। স্পেনসর বলছেন যদি জীবদেহটির আচরণ তার বাঁচাকে সাহায্য করে তবেই তার আচরণ ভালো, নইলে ভালো নয়। কারণ শুভ-আচরণেই জীবনের সুখ ও আনন্দ আর অশুভ আচরণে জীবনে দুঃখ ও দুর্দশা। জীবনের সমস্ত আচরণই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ যেহেতু সম্পূর্ণ দুঃখ-বিরহিত আনন্দ বলে জীবনে কিছু পাওয়া যায় না।

স্পেনসরের বক্তব্যে মৌলিক একটি ত্রুটি লুকিয়ে আছে। তিনি বৈজ্ঞানিক হিসেবে কেবল পরিবর্তনের অবস্থাটাকে দেখছেন এবং তাকেই ভালো বা মন্দ বলছেন। ওঁর ভালোমন্দের মানদণ্ডটি হলো : জীবদেহের আচরণ পরিবেশের সঙ্গে 'খাপ' খাচ্ছে কিনা। খাপ খেলেই তিনি তাকে ভালো বলবেন। কিন্তু খাপ খাওয়াবার অর্থ কী? যে কোনো অবস্থাতেই তো মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে যাচ্ছে এবং কর্ম করছে। সুখে থাকুক বা দুঃখে থাকুক (সুখ দুঃখের সঙ্গে কর্মের নৈতিকতার মূল যোগ নেই) তাকে কর্ম-বিরহিত অবস্থায় কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ওই বেঁচে থাকার অবস্থাকেই আমরা 'খাপখাওয়ানো' অবস্থা বলতে পারি। তখন তার আচরণকে বিচার করবো কি ভাবে? আরো একটা মারাত্মক ত্রুটি আছে। মানুষ যখন কর্ম করে তখন সে চোখের সামনে তার পরিণতিটি দেখতে পায় না। অর্থাৎ সে জানেনা খ থেকে ক কর্মটি বাছাই করলেই প্রকৃতির সঙ্গে তার খাপ খাওয়া হবে। সে তখন কর্মটি করে মাত্র। স্পেনসর বলতে পারেন, ওই লোকটি ভেবে নেয় তার ক কর্মটি খাপ খেতে সাহায্য করবে। এই বক্তব্য বিষয়ে আমরা বলবো যে, স্পেনসর তবে 'খাপখাওয়ানো' নামক অবস্থাটির একটি নির্দিষ্ট রূপ কল্পনা করেছেন। নির্দিষ্ট রূপের অভাবে তিনি কেমন করে বর্তমানের কর্মকে ভবিষ্যতের সঙ্গে মেলাবেন? অথচ স্পেনসর কোনো উদ্দেশ্য বা পরিণতির লক্ষ্যকে স্বীকার করেন না।

স্পেনসর শুধু পরিবর্তনকে দেখছেন

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও স্পেনসর পরিণতিবাদী। লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়েই তিনি কর্মকে বিচার করতে চান। কিন্তু অন্যান্য বিবর্তনবাদীরা ওঁর কথা স্বীকার করেন না। যেমন স্যর লেসলী স্টিফেন দুটি প্রত্যয় ব্যবহার করেন স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা। ওঁর ভাষায় 'A moral rule is a statement of a condition of social welfare.' তাকেই তিনি ধর্ম (virtue) বলেন যা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে। অর্থাৎ স্যর লেসলীর মতে কর্মের নৈতিকতা সামাজিক স্থিতাবস্থার সঙ্গে জড়িত। এই বক্তব্যে নিঃসন্দেহেই ভ্রান্ত লক্ষ্যেরচু

প্রয়োজন করে না কারণ সমাজকে তার বর্তমান অবস্থার ভারসাম্যের দিক থেকে বিচার করলেই চলে।

অধ্যাপক স্যামুএল আলেকজাণ্ডারও একই কথা লেখেন। ওঁর কথায় জানছি 'An act or person is measured by a certain standard or criterion of conduct, which has been called the moral ideal. The moral ideal is an adjusted order of conduct, which is based upon contending inclinations and establishes an equilibrium between them. Goodness is nothing but this adjustment in the equilibrated whole.' আলেকজাণ্ডারের মতে কর্মের নৈতিকতা নির্ভর করে একই রকমে সমাজের ভারসাম্যের সঙ্গে নিজের কর্মের সামঞ্জস্য বিধানে।

ভারসাম্যের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্যর লেসলী ও আলেকজাণ্ডার 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বকেই নীতিশাস্ত্রে প্রয়োগ করেছেন। নৈতিকজীবনে প্রায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতোই যোগ্য আচরণটি রক্ষা পাচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনকে তিনি ব্যাখ্যা করেন, কোনো এক ব্যক্তি প্রথমে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মতামত দিয়ে দেশে বিরাগভাজন হন। পরে কালক্রমে লোকেরা ভাবতে ভাবতে তাঁর কথাকে মানতে থাকে এবং দেখা যায় যে আগেকার বিরাগ এবার আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। আলেকজাণ্ডার লিখেছেন 'Persuation cores-ponds to the extermination of rivals' কারণ প্রকৃতি কেবলমাত্র যোগ্যতম প্রাণীকেই বাঁচবার অধিকার দেয়। মানুষের সমাজে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বলতে এই চাপটাই বোঝায় যখন প্রতিপক্ষ আমার বক্তব্য মেনে নিচ্ছে। তাই তিনি বলেন 'the victory of mind over mind consists in persuasion.'

আলেকজাণ্ডারের আলোচনায় নৈতিক জীবনযাত্রার অনেক অজ্ঞাত সত্য স্পষ্ট হয় কিন্তু নৈতিকতার তত্ত্বটি জানা যায় না। কেনো লোকেরা কাজ করে এবং কাজের ফলে কেমন ভাবে সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হয় এ-বিষয়ে ওঁরা নানা মতামত দিয়েছেন, কিন্তু ওই মতামতের নিজস্ব নৈতিক মূল্য কি ব্যাখ্যা করেন নি। ধরা যাক সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করাই নৈতিকতা। আমি সাধারণভাবে স্বীকৃত অন্যায় আচরণে এই ভারসাম্য রক্ষা করছি। এবার প্রশ্ন, আমার কর্ম কি নৈতিক? যদি নৈতিক হয় তবে কর্মের নিজস্ব চরিত্র বলতে

কিছু থাকে না। এবং লোকেরা যে-কোনো কর্মকেই শুধুমাত্র তাদের ভারসাম্য বিষয়ক নিজস্ব মতামতের ওপর দাঁড় করাবেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্নটি থাকছেই যে, **কর্মের ক্ষেত্রে যে বাছাই তার নীতিটি কি?** ভারসাম্য রক্ষিত হবার আগেই আমাকে কর্ম করতে হচ্ছে। সুতরাং নৈতিকভাবে হয় আমাকে আগেই ভারসাম্যের বিষয়ে মন স্থির করতে হয় অথবা কর্মকে বিচারের মানদণ্ড জানতে হয়। অর্থাৎ আমরা জানতে চাইবো কেনো সমাজকে 'ভারসাম্যে' রাখতেই হবে? আলেকজাণ্ডার ও স্যর লেসলী তার জবাব দেন না।

২। **পরিণতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Elements of Perfectionism)**

পরিণতিবাদের লক্ষ্য ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার উদ্দেশ্যময় পরিণতি বা পরিপূর্ণতা। প্রতিটি ব্যক্তিই অনন্ত সম্ভাবনাময়। কিন্তু নানাবিধ কার্যকারণে তার পরিপূর্ণতালাভে বাধা ঘটে। প্রথমত, নিজেই হয়তো জানেনা তার লক্ষ্য কি। দ্বিতীয়ত, পরিপূর্ণতার প্রয়াসে চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ বাধা দিতে পারে। পরিণতির আগেই তার জীবন শেষ হতে পারে।

এরিস্টটল তাঁর 'টিলস' তত্ত্বে পরিণতির কথা তোলেন। তিনি সমস্ত জীব জগতের ক্ষেত্রে 'টিলস' বা লক্ষ্য বা পরিণতিকেই মূল চালক শক্তি বলেন। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিণতির সঙ্গে সচেতনতার যোগ থাকে। সচেতনভাবে নিজস্ব পরিণতির কথা জানতে পারাই মানুষের মনুষ্যত্ব কারণ সে তার অনন্ত সম্ভাবনাময় কর্ম থেকে বিচার বিবেচনায় স্বকীয় কর্মকে বাছাই করে। **বাছাইয়ের সঙ্গেই তার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় এবং স্বাধীন সঙ্কল্পেই তার আত্ম-প্রকাশের সূত্রপাত ঘটে।** দার্শনিক হেগেল যেমন পরিণতিবাদের চরিত্র বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) বাঁচার জন্যে মরো ও (খ) পুরুষ হও।

(ক) **'বাঁচবার জন্যে মরো'**—সাধারণভাবে আমরা মৃত্যুকে জীবনের শেষ মনে করি। আর সেজন্যে মৃত্যু বিষয়ে আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। জীবন ছেড়ে, এই হাসি আনন্দ গান ছেড়ে কেউ মৃত্যুর কথা ভাবতে রাজি নয়। অথচ প্রত্যেক ধর্মেই বার বার মৃত্যু বিষয়ে প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে। তারা বলছে মৃত্যুর বোধ ছাড়া জীবনের সার্থকতা তৈরি হয় না। মৃত্যুকে মানতে পারাতেই জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। মধ্যযুগীয় খৃষ্ট ধর্মের মতে আত্মার জন্য দেহকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে। আত্মার জন্যেই দেহের মৃত্যু দরকার। হেগেল অবশ্য খৃষ্টধর্মের মতো এমন সঙ্কীর্ণভাবে প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করেন নি, এমনকি সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রতার কথাও বলেন নি।

ওঁর মতে আত্মা তার ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে বৃহত্তর জীবনবোধে সঞ্জীবিত হবে। এই জীবনবোধ কখনোই নিছক আত্ম বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থে সীমাবদ্ধ নয়। আত্মা প্রতি ব্যক্তিরই আছে। আত্মার প্রকাশ ঘটে তার 'আমি' তে। কারণ 'আমি'র পূর্ণবোধেই আত্মার পরিণতি। কিন্তু সাধারণ মানুষ 'আমি'র দ্বারা কেবলমাত্র নিজেকেই বোঝে, নিজের অব্যবহিত স্বার্থ ও প্রয়োজন সিদ্ধি ছাড়া তার সচেতনতায় আর কিছুই থাকে না। নিজেকে ছাড়িয়ে সে বড়োজোর নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কথা ভাবে কিন্তু তার বেশি কখনোই নয়। কিন্তু হেগেল বলছেন ব্যক্তিকে এই আত্মনিবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা কাটাতে হবে। শুদ্ধ আত্মবোধে কোনো সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধ থাকে না, ব্যক্তি নিজের মধ্যেই জগতের সবকিছুকে উপলব্ধি করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক যেমন বলতেন দুটি 'আমি'র কথা। 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি' শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। জগতের সব কিছুই তার, আর সে কথার অর্থ সবই তার প্রয়োজনের। কিন্তু 'পাকা আমি' নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে ত্যাগ করে। সে অন্যের প্রয়োজনের মধ্য দিয়েই নিজেকে উপলব্ধি করে। জগত তারই জন্যে, তারই প্রকাশের প্রয়োজনে তৈরি, কিন্তু জগত তার আশু প্রয়োজন ও স্বার্থকে পরিপোষণ করে না।

কাজেই নিজের পরিপূর্ণতার জন্য কাঁচা আমিকে ত্যাগ করতে হয়। বাঁচার জন্যেই মৃত্যুকে স্বীকার করতে হয়। কারণ প্রতিমুহূর্তে সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করেই অর্থাৎ মৃত্যুর বোধেই জীবনের অগ্রগমনকে আস্বাদ করতে হয়।

(খ) **'পুরুষ হও'**—হেগেল অসংখ্য মানুষের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজছেন। গড়পড়তা সাধারণ মানুষেরা জৈব প্রাণধর্মের পরিচয় মাত্র। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দেবার বাসনা জাগেনি। নিত্যদিনের সংসার ধর্মই তাদের জীবন কেন্দ্রস্থ। তার বাইরে অন্য কোনো বৃহত্তর জগত, আত্মচেতনতার প্রসঙ্গ বা নিজের এই ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরোবার কোনো কথা নেই। এই গড়পড়তা মানুষ ও গড়পড়তা জীবন যাত্রায় অধিকাংশ মানুষই হয়তো খুশি কিন্তু হেগেল বলতে চাচ্ছেন এই একটানা অভ্যাসিক জীবন ধারায় মানুষের পরিচয় নেই। যেহেতু মানুষ তখনই মানুষ যখন সে আত্মসচেতনতায় গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে তফাৎ হয়েছে, নিজের সম্পর্ককে বুঝতে চাচ্ছে চারপাশের সঙ্গে মিলিয়ে, স্বাধীনতার ছাপ ফেলছে বিভিন্ন কর্মে।

এই স্বাধীন সচেতনতাই যদি মানুষের লক্ষ্য হয় তবে তাকে ব্যক্তি হয়ে

উঠতে হয়। ব্যক্তি বলতে বুঝি যে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্ত হয়েছে তার অন্তর্নিহিত সত্তা, যা সে হতে পারে তার কর্মে। অন্তর্নিহিত সত্তা যতোই ব্যক্ত হয় ততোই মানুষ 'পুরুষ' হতে থাকে। 'পুরুষ' তাকেই বলে যে আত্মশক্তিতে জীবন ও জগতের মুঠো ধরেছে। অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুতুলের মতো কেবল পরিচালিত হচ্ছে না, নিজেই নিজের চলবার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে। অর্থাৎ পুরুষত্বের সঙ্গে শক্তি ও প্রকাশের সম্পর্ক প্রথমত, তার নিজস্ব শক্তিকে বুঝতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, সেই শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে তার ভবিষ্যত কল্পনার লক্ষ্যে।

ব্যক্ত হলেই ব্যক্তি, লক্ষ্যের টানে তার বাস্তবতা

নিজের চরম পরিণতির লক্ষ্য স্থির রেখে সে যতোই চলবে সেই পথে, ততোই তার কাঁচা আমি ঝরবে এবং সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অধ্যাপক জন কেয়ার্ড লিখেছেন 'That I am capable of a universal life, a life transcending the limits of my own individuality, I learn practically in my relations to other human beings, when I find it possible so to identify myself with them as to make their life my own. The capacity of love and sacrifice is the capacity so to escape from the limits of the particular self that the happiness of others shall become my happiness. Morality, or the moral life may be described as the renunciation of the private or exclusive self and the identification of our life with an ever-widening sphere of spiritual life beyond us.' 'পাকা আমি'র সাধনায় ব্যক্তির পরিপূর্ণতা। তাই হেগেল বলেন 'নিজে পুরুষ হও ও অন্য পুরুষদের শ্রদ্ধা করো।'

৩। পরিণতি: ব্যক্তি ও সমাজ: আত্ম-বিকাশের তত্ত্ব মানলে একটি প্রশ্ন ওঠে যে ব্যক্তি কি সামাজিক মানুষ হিসেবে তার চর্চা করে না? অর্থাৎ প্রশ্নটি উঠছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে। পরিণতিবাদে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ব্যক্তির যেমন পরিণতি আছে তেমনি সমাজেরও পরিণতি আছে। কারণ শুদ্ধ পরিণত সমাজেই ব্যক্তির পরিপূর্ণতা। সমাজে ও ব্যক্তিতে বিরোধ কল্পনা করলে তাদের পারস্পরিক শত্রুতায় কেউ আর পরিণতির দিকে চলতে পারবে না। সমাজ মানুষের জীবনে গোড়া থেকেই আছে। সমাজ ছাড়া কোনো মানুষের পরিচয় সম্ভব

নয়, সমাজেই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ। তেমনি মানুষ ছাড়া সমাজ সম্ভব নয়। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ এমন একটি সামগ্রিক পূর্ণ যে একের অভাবে অন্যের চরিত্র অপূর্ণ। তাই ব্যক্তির পরিণতি একমাত্র সমাজেই সম্ভব এবং সমাজ ব্যক্তির মতোই সর্বদা নিজস্ব পরিণতি খোঁজে। এই দুইয়ের নিজস্ব পরিণতিতে তারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

পরিণতিবাদে পূর্ণ মানুষকে যেহেতু চর্চার বিষয় করা হয়েছে, তার মনের কোনো একটি ঝোঁককে প্রধান মূল্য দেওয়া হয়নি। অনুভূতি, সচেতনতা, ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা ও সংযম সমস্ত কিছু মিলিয়েই তার পরিচয়। সে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ তৎপর নয়, সে কেবল যন্ত্রবৎ বুদ্ধির আচরণেই নিবদ্ধ নয়। কামনাবাসনা ও যুক্তিবিবেচনার সংমিশ্রণেই তার জীবন গঠিত। এই পরস্পর বিরোধী আবেগ অনুভূতির জন্যই তার পরিণতির কথা উঠেছে। কারণ প্রতিমুহূর্তেই সে নানাবিধ মিশ্র টানের কারণে ভাঙছে গড়ছে, তার রূপ নানা মূর্তিতে ফুটে উঠছে। এই সহস্র টান ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার কল্পনার পথে চলে।

অনেক নীতিশাস্ত্রবিদ্, যেমন সেট বলেন যে, মানুষের বাসনা-কামনার দিকটা হলো চরিত্রের খারাপ দিক, আর বুদ্ধি বিবেচনার দিকটা উচ্চতর বৃত্তির দিক। মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিত্বকে তিনি তফা‚ করে বলেন যে, ব৷সনা-কামনায় মানুষ স্বতন্ত্র হয় কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশে মানুষ পূর্ণতার দিকে যায়। সেটের এই বক্তব্য আংশিকভাবে সত্য কারণ ব্যক্তিকে এমন সম্পূর্ণ দুটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা যায় না। বাসনা-কামনা ও বিচার-বিবেচনা এক সঙ্গেই চলে।

বাসনা কামনা ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সত্ত্বেও ব্যক্তি যে তার পরিনতির পথে চলে তার কারণ ব্যক্তির বিবেক। বিবেকের নির্দেশেই ব্যক্তির প্রতিটি কর্ম পরিচালিত হয়। কিন্তু সমস্যা থাকে এই যে বিবেক প্রতিমুহূর্তেই স্পষ্ট নয় বা তারও ভুল হতে পারে। তবু ভুল ত্রুটির মধ্যেও লক্ষ্য মানুষকে সঞ্জীবিত রাখে। কারণ পরম পরিণতির মনুষ্যত্বে মানুষকে যেতেই হয়। যেহেতু 'মানহুঁশ' হবার কারণেই সে পশুজগত থেকে পৃথক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ-কথাই চমৎকার বলেছেন যে জীবন 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থ।'। এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'মানহুঁশ' হলেই মানুষ। মান বা আত্মসম্মানের বোধ আসে আত্মস্থতায় অর্থাৎ যখন নিজের সম্পর্কে ব্যক্তির স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে।

বিবেক চলে নীতির নির্দেশে। নৈতিক মানের পরিচালনায় বিবেক প্রতিটি কর্মেই স্বাধীন সঙ্কল্পের ছাপ ফেলেও বাছাইয়ের মধ্যদিয়ে মনুষ্যত্বের

বিকাশের কথা ভাবে। মানুষের জীবন কোনো এক মুহূর্তেই পূর্ণ নয়, তাকে ধাপে ধাপে পূর্ণতার দিকে চলতে হয়। সত্যের গভীরতম বোধ পর্বে পর্বে জীবনকে প্রকাশ করে, তাকে নতুন অভিজ্ঞানের পথে ঠেলে দেয়।

পরিণতির লক্ষ্যে যে-মানুষ চলে তার মনুষ্যত্বের আনন্দটাই সব। নিছক সুখানুভূতি তার লক্ষ্য নয়। যদিও জীবনে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা সবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত তবু অভিজ্ঞতায় পরিণতিবাদী আনন্দকেই প্রধান স্থান দেন। কারণ আনন্দ সুখ ও দুঃখের সীমার বাইরে এমন একটি মানসিক স্থৈর্য যা সুখে নির্লিপ্ত ও দুঃখে নির্বিকল্প। অথচ পরিণতিবাদী মানুষকে পূর্ণতায় দেখতে চান বলেই বাসনা কামনাকে ত্যাগ করেন না। বাস্তব জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যেই পরিণতিকে খোঁজেন। কারণ তিনি জানেন পরিণতি নির্দিষ্ট একটি চূড়ান্ত অবস্থা নয়। পরিণতি প্রতিমুহূর্তে ও প্রতিদিনের কর্মেই প্রকাশিত। **প্রতিদিন ব্যক্তি পরিবর্তিত হতে থাকলেই তার পরিণতি।**

৩। পরম কল্যাণবাদ (**Eudaemonism**)

পরিণতিতত্ত্বকেই কল্যাণের অর্থে গ্রীকভাষায় 'ইউডিমনিজম' বলা হয়। সাধারণভাবে ইউডিমোনিয়ার অর্থ 'সুখ' বা 'সমৃদ্ধি' কিন্তু প্লেটো ও এরিস্টটলের পরিণতি তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে এর অর্থ দাঁড়ায় লক্ষ্য নির্দিষ্ট পূর্ণতা (কল্যাণ)-র আদর্শ। এই আদর্শে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সুখের কথা নেই, ব্যক্তির কাম্য পরিণতির কথা থাকছে। পরিণতির লক্ষ্যে চলতে গেলে সুখের বদলে হয়তো ব্যক্তিকে দুঃখই বরণ করতে হবে তবু পরিণতিই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সুতরাং ইউডিমোনিয়ার সঙ্গে সুখের যোগ খুব কম।

পরম কল্যাণবাদের তত্ত্বে পরিণতিকেই কল্যাণ বলা হচ্ছে। কারণ বাহ্য সুখ বা দুঃখ সাময়িক ঘটনা মাত্র। ব্যক্তির জীবনে তার হয়ে ওঠাই মূল। হয়ে ওঠার নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই। যে যার মতো হবে। যদি সে না-হয় তবে তার জীবনে প্রাণের কোনো প্রমাণই নেই। কারণ চাঞ্চল্যেই প্রাণের পরিচয়। প্রকৃতির নিয়মে জীব কোনো এক কেন্দ্রে স্থির নয় কারণ সে স্থির থাকতে পারে না। তাকে চলতেই হবে। ভালো হোক বা মন্দ হোক জীবের গতিটাই সত্য। এরিস্টটল এই গতির পেছনে মহাজাগতিক পরিণতির নিয়ম দেখতে পান। যেমন বটবীজ থেকে বটবৃক্ষই হবে, অন্য কোনো বৃক্ষ সম্ভব নয়। এর কারণ, বটবীজে বটবৃক্ষের পরিণতিই

নিবদ্ধ। মানুষের ক্ষেত্রেও পরিণতি তার চরিত্রে নিহিত কিন্তু মানুষ সচেতন ভাবে পরিণতির দিকে চলে, প্রকৃতির ওপরেই নির্ভর করে থাকে না।

ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্য তার আদর্শ চরিত্র। এই আদর্শ চরিত্র আবার শুদ্ধ সঙ্কল্পজাত, কারণ সঙ্কল্প ও বিচারেই ব্যক্তি নিজস্বতার পরিচয় দেয়। আদর্শ চরিত্র সবক্ষেত্রেই আবার সামাজিক চরিত্র। কারণ, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং অন্য মানুষের সম্পর্কেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। কোনো একটি মানুষ কখনোই মানুষ নয়। দার্শনিকভাবে মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ কিছুই নেই, যতোক্ষণ না সে অন্যের কাছে প্রতীত থাকছে, অন্যের বোধে স্বীকৃত হচ্ছে। অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কের জগতেই তার স্বীকৃতি। গ্রীন যেমন বলেছেন 'The realization of human personality means its realization in **society**.'

দার্শনিক ব্র্যাডলীর ব্যাখ্যায় তাই, অবস্থান অনুযায়ী কর্ম স্থির হয়। অবস্থান সামাজিক ভূমিকা। ব্যক্তির সমস্ত কর্মই তার সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকার সঙ্গে মিলিয়ে চলে কারণ তার অবস্থানেই তার সত্তার পরিচয়। অবস্থান ও পেশার সম্পর্কে ব্যক্তি একদিকে তার সামাজিক নির্দিষ্ট কর্ম করে ও অন্যদিকে তার কল্পনাকে দৈনন্দিনের কর্মে মূর্ত করতে চায়। অবস্থান বলতে বোঝায় সে জীবনের যে পর্যায়ে আছে। ভূমিকা হলো সে অবস্থান অনুযায়ী যে-কর্ম করে। ভারতবর্ষে যেমন চতুর্বর্ণের মধ্যে মানুষের অবস্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। অবস্থান অনুযায়ী ব্রাহ্মণের কর্তব্য ছিলো জ্ঞানের চর্চা করা।

সম্ভাবনা ও কর্ম মিলিত হলেই ব্যক্তির পূর্ণতা তৈরি হয়। পূর্ণতার জন্য সাময়িক স্বার্থ ও প্রয়োজনকে ব্যক্তি ত্যাগ করে। আত্মত্যাগেই ব্যক্তির আত্মস্থতার প্রমাণ হয়। কারণ আত্মত্যাগে ব্যক্তি তার' কাঁচা আমি'কে ত্যাগ করতে পারে।

সমালোচনা—(ক) পরিণতিবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান আপত্তি মানদণ্ড বিষয়ে। সমালোচকরা বলেছেন যে পরিণতি লক্ষ্য হতে পারে কিন্তু পরিণতি-তত্ত্ব দ্বারা প্রতিটি কার্যের পরিণতি বিচার করা যায় না। অর্থাৎ কাজের পরিণতি আমাদের যেহেতু জানা থাকে না তাই কাজকে কি ভাবে বাছাই করবো? সুতরাং পরিণতিবাদ নৈয়ায়িক মানদণ্ড হতে পারে না।

(খ) একদল পণ্ডিতের মতে পরিণতিবাদ চক্রাকার যুক্তি। শুভকর্ম ব্যক্তির পরিণতিকে পুষ্ট করে, আবার যা ব্যক্তির পরিণতিকে পুষ্ট করে তাই

শুভকর্ম। দুটি প্রত্যয়ই ব্যাখ্যার জন্য নিজেদের মেনে নেওয়ার চক্রটি তৈরি হয়।

পরিণতিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলো পরিণতিবাদের চরিত্র বুঝতে ভুল করে। পরিণতিবাদ নিঃসন্দেহেই কর্মবিচারের মানদণ্ড দেয়। কারণ চরিত্র বিষয়ে ধারণা থেকেই আমরা তার কর্মকে বিচার করি এবং সে নিজে বুঝতে পারে কাজটিতে তার কতোটুকু মঙ্গল। তাছাড়া প্রত্যেক কর্মের সঙ্গেই প্রচলিত নীতি ও সংস্কৃতির বক্তব্য থাকে। সেই কর্মটিকে নীতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে সহজেই বিচার করা যায়। কর্ম বাছাইয়ে নিশ্চয়ই ভুল হতে পারে কিন্তু ভুলের মধ্যদিয়েই ব্যক্তির চরিত্র সঠিক কর্মের পথে চলে।

অনুশীলনী

১। Is pleasure or perfection the real ethical standard?

২। It has been said that self-realisation is the perfect moral ideal. What is the self to be realised? Discuss.

নবম অধ্যায়

গীতার কর্মযোগ

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা শ্রীশ্রীব্যাসদেব রচিত মহাভারতের অংশ। প্রত্যক্ষত যদিও গীতা ব্যাসদেবের রচিত কিন্তু ভারতীয় মাত্রেই জানে যে গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত। কারণ ভারতীয় জীবনের সার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহারণাঙ্গনে সখা সব্যসাচীকে উদ্দেশ্য করে বলেন। অর্জুনবিষাদ-যোগে স্বজনবান্ধবদের সামনে অর্জুনের মনে সাময়িক বৈরাগ্য ও বিষাদ উপস্থিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ক্লৈব্য দূর করবার উপলক্ষে সমগ্র জীবনের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করেন। আচার্য বিনোবাজী চমৎকার বলেছেন 'মহাভারতের মধ্যভাগে, এক উঁচু দীপের মত অবস্থিত থাকিয়া গীতা সমস্ত মহাভারতে আলোকপাত করিতেছে। একদিকে ছয় পর্ব অপরদিকে বার পর্ব ইহার মধ্যভাগে যেমন, তেমন একদিকে সাত অক্ষৌহিনী অপর দিকে এগার অক্ষৌহিনী সেনার মধ্য-ভাগে গীতার উপদেশ দেওয়া হইতেছে'। আচার্য বিনোবাজীর বক্তব্য থেকেই জানা যচ্ছে যে গীতা মহাভারতের অর্থাৎ বিরাট ভারতবর্ষের প্রবহমান মহৎ সংস্কৃতির কেন্দ্র-বিন্দু। গীতাতেই ভারতীয় জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি নিহিত। কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত আঠারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে এই উপদেশ দেওয়া হয় কারণ গীতা কর্মচঞ্চল জীবনের মধ্যেই মানুষের বাসনা-কামনার তাৎপর্য ঘোষণা করে এবং শেখায় কেমন করে জীবনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেমন করে জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝতে হবে। সখা সব্যসাচীকে যেমন ভগবান হাত ধরে পথ প্রদর্শন করেন তেমনি আমাদের জন্যেও চিরকালীন আদর্শ লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

গীতা তাই কর্মের কেন্দ্রেই জীবনের রহস্য উন্মোচন করে। কর্মকে বর্জন করে অসাড় নির্জীব জড়পদার্থের তুল্য জীবনের কথা গীতার আলোচ্য নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন গীতা শব্দটিকে ওল্টালেই গীতারহস্য স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ তিনি বলছেন 'ত্যাগই' গীতার নির্দেশ। কিন্তু এই ত্যাগ জীবনকে ভীরু কাপুরুষের মতো অস্বীকার করে নয়। জীবনের সমস্ত দায়িত্ব বহন করে, পুরুষকারের জয় ঘোষণাতেই গীতার আদর্শ জীবনে প্রতি-

কর্মের কেন্দ্রেই জীবনের রহস্য

ফলিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর শিক্ষাতেই আচার্য বিনোবাজী ব্যাখ্যা করেন, 'এক পরমেশ্বর ব্যতীত পূর্ণ নির্দোষ কেহ নাই, তেমন কেবল দোষযুক্তও এই পৃথিবীতে কেহ নাই, এ-কথা মহাভারতে অতি স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্টিরের দোষ যেমন দেখান হইয়াছে, আর একদিকে তেমনি কর্ণ দুর্যোধনের গুণরাজির উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে, মানবজীবন সাদা ও কালো তন্তুতে বোনা পট এ-কথাই মহাভারত বলিতেছে। অলিপ্ত থাকিয়া ভগবান ব্যাস জগৎরূপ বিরাট সংসারের আলো-অন্ধকারময় চিত্র দেখাইতেছেন'। অর্থাৎ জীবনের স্বরূপ ঘোষণাই গীতার উদ্দেশ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জীবনের কেন্দ্রে বসিয়ে কর্মের চরিত্র বিষয়ে অবহিত করছেন।

জীবন ও কর্মই যদি গীতার প্রবচন হয় তবে জিজ্ঞাস্য হবে সেই কর্মের স্বরূপ কি ? ব্যাসদেব কর্মযোগ অধ্যায়ে কর্মের প্রকৃতি ও সত্তা বিষয়ে আলোচনা করেন। কর্মের সঙ্গে যোগ শব্দটিকে তিনি যুক্ত করেছেন। যোগ বলতে সম্পর্ক বোঝায়। সম্পর্ক জীবনের সিদ্ধান্ত সমূহের সঙ্গে। আমরা তাই বলতে পারি জীবনের সিদ্ধান্তসমূহকে আচরণ করার কলা বা উপায় হচ্ছে যোগ। গীতায় ভগবান একদিকে জীবনের পরিণত লক্ষ্য (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) বিষয়ে আমাদের সচেতন করেন ও অন্যদিকে তাকে কর্মেও রূপান্তরিত করবার জন্য নিয়োগকলা (কর্ম) পরিদর্শন করান। তিনি জানান, দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, আত্মার অখণ্ডতা ও অমরতার প্রতি দৃষ্টি রেখে, স্বধর্মাচরণ করতে হবে।

কর্ম একটি যোগ

স্বধর্মাচরণ হয় কর্মে। দ্বিবিধ ভাবনা থেকে কর্মের সূত্রপাত। (ক) নিজ কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করবো ও (খ) ফলভোগ করতে না পারলে কর্ম করবো না। কিন্তু গীতা শেখায় 'কর্ম অবশ্যই করতে হবে কিন্তু ফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মীর নিশ্চয়ই ফললাভ ঘটে কিন্তু সচেতনভাবে ফলের অধিকার ছাড়তে হবে।' রজোগুণ বলে, যা নেবো তা ফলের সঙ্গেই নেবো। আর তমোগুণের মতে, ফল নেই তো কর্মও ছাড়বো। রজোগুণ ও তমোগুণে তাই একটি সূক্ষ্ম মিল থাকে, উভয়তই কর্ম ও ফলকে মিশিয়ে ভাবা হচ্ছে। কিন্তু গীতা বলে এই দুই গুণের উর্দ্ধে উঠতে হবে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণী হতে হবে, যাঁর কেবল কর্মটাই থাকে, ফলের কোনো বাসনা থাকে না। গীতা যেহেতু ফল ত্যাগের কথা বলে সেহেতু প্রশ্ন উঠতে পারে যে কর্ম তবে কি যেমন তেমন ভাবে সারা হবে ? গীতা বলে, না। কর্ম উত্তমভাবে

ফল লাভের জন্যই কর্ম

ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। সকাম পুরুষের কর্মের চাইতে নিষ্কাম পুরুষের কর্ম অধিকতর ভালো হওয়া চাই। কারণ, এই আশা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। সকাম পুরুষ ফলাসক্ত হওয়ায় ফলের চিন্তায় তার সময় ও শক্তি ব্যয় হয়। নিষ্কাম পুরুষ তার সমগ্র শক্তি ও সময়কেই কর্মে নিযুক্ত করতে পারে। যেমন প্রাকৃতিক শক্তি; তাঁর অন্য চিন্তা না থাকায় শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে। নিষ্কাম পুরুষের চিত্তস্থৈর্যে অপব্যয় নেই।

নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গে আমরা জানি কর্মের সঙ্গে ফলের যোগ নিতান্তই পরোক্ষ। কর্মের লক্ষ্যে থাকে কর্মটি, লক্ষ্যের তন্ময়তাতেই কর্মীর চরিতার্থতা। এহেন কর্মীকে গীতায় তাই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়েছে। কারণ অর্জুনের ভাষায় তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ 'যাঁর বুদ্ধিতে সাংখ্যনিষ্ঠা স্থির হয়েছে, ফল-ত্যাগস্বরূপ যোগ যাঁর প্রতি রোমকূপে পরিব্যাপ্ত। ফলত্যাগের পূর্ণতা যাঁর মধ্যে দৃষ্ট হয়, কর্ম সমাধিতে যিনি মগ্ন' অর্থাৎ যিনি কর্মের রহস্যভেদ করেছেন, কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মকে সম্পর্কিত করতে পেরেছেন।

সাংসারিক লোক নিয়ত কর্ম করে। ফলের আশায় তার নানাবিধ সাময়িক ফল লাভ হয় আর কর্মযোগীর কর্ম অনন্ত ফলের সন্ধান পায়। যেমন ধরা যাক যীশুখৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টলষ্টয় একবার চমৎকার বলেছেন 'লোকে যীশু খৃষ্টের ত্যাগের প্রশংসা করে। কিন্তু এই যে সাংসারিক জীব প্রত্যহ কতো রক্ত-পাত করে কতো পরিশ্রম করে! তার কথা কে বলবে! দু দুটো গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে সংসারী জীব চক্কর কাটছে, যীশুখৃষ্টের চেয়ে তার কষ্ট বহুগুণ বেশি। আর বহুগুণ বেশি দুর্গতি। তার অর্ধেক কষ্টও যদি তারা ভগবানের জন্য করে তবে সত্য সত্যই যীশুর চেয়ে তারা বড়ো হয়ে যাবে।' কারণ যীশু ফলের অপেক্ষা করেননি আর সাংসারিক লোক ফলের অপেক্ষায় নানা স্বার্থ-পীড়িত সংশয় ও বিরোধ টেনে আনে। এমনই ফলের বাসনা যে লোকের প্রতিটি কর্মে পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ থাকে, প্রতিযোগিতা থাকে এবং তারই ফলস্বরূপ সমাজে অশান্তি ও অন্যায় স্তূপাকার হয়ে ওঠে। আবার সমাজের এই স্তূপাকার অন্যায়ের কারণে তাদের জীবন বিষময় হয়ে পড়ে। তাই বলা যায় যে ভাবনার ভেদহেতু সংসারী ব্যক্তি ও কর্মযোগীর কর্ম বিভিন্ন। ফলের ভাবনায় যে পীড়িত সে স্বার্থবোধে জর্জরিত, স্বার্থবোধক কর্ম তার আত্মার বন্ধন। অথচ কর্মযোগীর কর্ম আত্মবিকাশক যেহেতু তিনি স্বধর্ম অনুযায়ী কর্ম করেন, কর্মফলকে পৃথকভাবে মনোযোগের বিষয় মনে করেন না।

কর্মযোগীর কর্ম থেকেই শুদ্ধি আসে, তাই বলা হয় 'কর্মনা শুদ্ধিঃ'। কারণ কর্মযোগীর কর্মে স্বধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। জীবন তাকে যে কর্মে নিযুক্ত করে সেই কর্মটির সুষ্ঠু প্রতিপালনই তার স্বভাব, স্বভাবের পূর্ণতায় তার স্বধর্ম রক্ষা পায়। গীতায় তাই কর্ম শব্দের অর্থ স্বধর্ম। আমরা আহার করি, পান করি, নিদ্রা যাই—এ সমস্তই কর্ম। কিন্তু গীতায় কর্ম শব্দে এই সব ক্রিয়া বোঝায় না। কারণ, প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় মানুষের কর্মের স্বাধীনতা নেই। স্বাধীন কর্মেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয় যেহেতু বাছাইয়ের মধ্যেই ব্যক্তি হয় তার স্বধর্ম রক্ষা করে বা করে না। স্বধর্মের সঙ্গে তার মোহহীনতার যোগ আছে কারণ মোহে কর্মী আশু লক্ষ্যে আবদ্ধ থাকে, প্রয়োজনের সীমা ছাড়াতে চায় না, কেবলমাত্র নিজেকে কেন্দ্র করেই ঘোরে। স্বধর্ম রক্ষার সঙ্গে তাই নিষ্কামতার যোগ। নিষ্কাম কর্মের প্রথম পরিচয় কাম ও ক্রোধকে জয় করা। এ-কথার অর্থ এই নয় যে মানুষের কামনা বাসনা থাকবেনা। বলা হচ্ছে, কামনা বাসনাকে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে জড়াতে হবে। আত্মপ্রকাশে ব্যক্তি শুধু 'আত্ম'ই নয়, সে নিরহঙ্কারও বটে অর্থাৎ সে নিজের আত্ম বা কাঁচ আমিকে ত্যাগ করে। যেহেতু তার নিজের সঙ্গে সঙ্গে আরো অসংখ্য লোকের ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় অসংখ্য লোকের মনে মনে স্বার্থের জন্ম হয় এবং পরিশেষে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত মনুষ্যত্বের ভিত্তিকেই ধ্বংস করতে চায়। গীতা তাই চিত্ত সংশোধনের জন্য কর্মের কথা বলে। এই কর্মের নাম বিকর্ম। কর্ম স্বধর্মাচরণের বাহ্য স্থূল ক্রিয়া। এই বাহ্য কর্মে চিত্তসংযোগ করাকে বিকর্ম বলে। নিষ্কাম কর্ম তখনই সিদ্ধ হয় যখন বাহ্য কর্মের সঙ্গে চিত্তশুদ্ধিরূপ আন্তরিক কর্ম যুক্ত হয়।

কর্মেই স্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়

এই বিশেষ কর্ম বা বিকর্ম নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে পৃথক হয়। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের এ৷ত্মতায় নিষ্কমতা আসে। নিষ্কামতা থেকে তৈরি হয় অকর্ম। অর্থাৎ তখন আর কর্মের কথা মনে থাকে না। কর্মের বোঝা অবলুপ্ত হয়।

এবারে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিকর্ম ও অকর্মই যদি লক্ষ্য হয় তবে কর্মের প্রয়োজন কি? কর্মের প্রয়োজন একান্ত। দোষ ধরা পড়লেই দূর করা যায়। দোষ ধরা না পড়লে বিকৃতি আসে। কর্ম করলেই দোষ ধরা পড়বে। কর্মের দোষ দূর করবার জন্যে বিকর্মের প্রয়োজন। কর্মকে নির্মল করবার

জন্য যখন অবিরাম চেষ্টা চলে তখন আপনা থেকেই কর্ম নির্মল হয়। নির্বিকার কর্ম যখন সহজভাবে সংঘটিত হতে থাকে তখন তার গতি ও প্রবাহ মনে প্রত্যক্ষ থাকে না। কর্মটি যে কখন করা হয়েছে তা টের পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কর্মটি অকর্ম হয়ে যায়। অকর্মস্থিতিই গীতার কর্মবিষয়ে প্রধান বক্তব্য।

অনুশীলনী

১। Explain the ethical position of the Srimatbhagabat Gita.

২। What is the doctrine of Karma explained by Lord Krishna in the Bhagabat Gita ?

দশম অধ্যায়

বিবেক

১। নীতিশাস্ত্রে বিবেকের স্থান (Place of Conscience in Ethics.

নীতিশাস্ত্রের বিচার কর্মের নৈতিকতা বিষয়ে। কর্মের নৈতিকতা বলতে আমরা বুঝি ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায় ও উচিত অনুচিতের বোধ। আমাদের প্রতিটি কর্মের সঙ্গেই তার যোগ। আমরা পৃথকভাবে বিচারের আগেই কোনো বস্তুকে ভালোমন্দ বলে ধারণা করি; এমন কি জানি যে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দ ছাড়াই কিছু কিছু বস্তু বা বিষয় ভালো কিম্বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়। আমাদের নিজস্ব চিন্তা ছাড়াই যদি বস্তু, বিষয় বা কর্ম যদি ভালো মন্দ, উচিত অনুচিত হিসেবে আখ্যাত হয় তবে প্রশ্ন উঠবে তাদের এই চরিত্রটি আসে কোথা থাকে এবং আমরাই তাদের জানছি কিভাবে? একদল দার্শনিকের মতে আমাদের একটি বিশেষ বোধ আছে যার সাহায্যে এই বৈশিষ্ট্যকে জানতে পারি। এই বোধটি আমাদের সহজাত যদিও তার সংস্কারের প্রয়োজন, যদিও তার পরিবর্তনের শিক্ষা প্রয়োজন। খৃষ্টধর্ম যেমন বলে যে প্রতিটি ব্যক্তির মনে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আছে, এই কণ্ঠস্বরটিই কর্মের ন্যায়-অন্যায় বুঝতে শেখায়। অন্তর্নিহিত এই বোধটিকেই খৃষ্টধর্ম বিবেক বলে। এই বোধের সাহায্যেই আমরা আপনা থেকেই কর্মকে জানতে পারি। বিবেকের সাহায্যে আমাদের নৈতিকতার বিচার তৈরি হয়। এই বিচারের চরিত্র সর্বদাই অব্যবহিত, অনন্য এবং স্থির। তার কোন ব্যতিক্রম নেই।

বিশেষ মানসিক বোধ : বিবেক

বিবেক প্রায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো কাজ করে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিবেকই একমাত্র চূড়ান্ত রায় দিতে পারে যেমন দৃষ্টির ক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রিয় শেষ কথা জানায়, ঘ্রাণের ক্ষেত্রে জানায় ঘ্রাণেনিন্দ্রিয়। দৃষ্টির ক্ষেত্রে চোখের ওপর থাবার কোনো ব্যবস্থা নেই, যেমন নেই ঘ্রাণের ক্ষেত্রে নাকের ওপর থাবার। যতোবার ঘ্রাণ নেবো ততোবারই নাকের সাহায্য নিতে হবে, নাক ব্যতীত ঘ্রাণ পাবার আরো কোনো পথ বা উপায় আমাদের হাতে নেই। অর্থাৎ যদি কোনো

গন্ধকে খারাপ বা ভালো বলি তবে আমরা জানাতে পারবো না যাকে ভালো বা খারাপ বলছি তা কেনো খারাপ বা ভালো। তেমনি বিবেককে পেরিয়ে যাবার কোনো পথ নেই। একমাত্র বিবেকই বলতে পারবে কোন কাজটি ভালো বা মন্দ। এই ব্যাখ্যায় বোঝা যাচ্ছে বিবেক প্রায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের মতো আরো একটি ইন্দ্রিয় যা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে কর্মের চরিত্র শেখায়।

এক্ষেত্রে একটি মাত্রই প্রশ্ন হতে পারে যে হেন 'ইন্দ্রিয়'টি অর্থাৎ বিবেক আসছে কোথা থেকে? কেউ কেউ বলেন বিবেক আসছে অতিপ্রাকৃত (supernatural) স্তর থেকে। আবার কেউ বলেন যে বিবেক কার্যত বহু শতাব্দী ব্যাপী নৈতিক চিন্তা বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতার ফল। বিবেকের উৎস যাই হোক, সর্বদাই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বিবেক প্রত্যক্ষভাবে এবং ধ্রুব ভাবে কর্মের নৈতিকতা বিচার করতে পারে। বিবেককে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার ফল বললে মৌলিক ত্রুটি থাকে। অভিজ্ঞতা দিয়ে অভিজ্ঞতার বিচার হতে পারে না। তার জন্যে মূল্য বিচারের বোধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কর্মকে নৈতিকতার ছাড়পত্র দেবার আগেই জানতে হয় কী ভালো এবং কেনো ভালো! যা অভিজ্ঞতা নির্ভর তা পূর্বেই ভালো বা মন্দ হতে পারে না। সুতরাং অভিজ্ঞতার পূর্বেই অভিজ্ঞতা বিচারের যে মানদণ্ডটি থাকছে তাকেই বিবেক বলতে হয়। উপযোগিতাবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো কেবলমাত্র ফলাফল দিয়ে কর্মের বিচার করলে আমরা কখনোই কর্মের মূল চরিত্রকে জানতে পারি না। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তখন সম্ভাব্য ফলাফল জানতে হয়। অথচ তা জানা সম্ভব নয়। তা ছাড়া একথাও আমরা জানি যে ফলাফল ঘোষিত হবার আগেই আমরা কর্মের ওপর রায় দিয়ে থাকি। অর্থাৎ ভালো মন্দ বিষয়ে আমাদের পূর্বার্জিত ধারনা প্রয়োজন। বহু ক্ষেত্রে আবার একই কর্ম কখনো ভালো এবং কখনো খারাপ। সুতরাং তখন ভালো মন্দের বিচারটি নিছক অবস্থা নির্ভর হয়ে যায়। অবস্থা ও ফলাফল থেকে কর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে কোনো সামান্য সত্যে পৌছানো সম্ভব হয় না। কাজেই বিবেক বা নৈতিকবোধের প্রসঙ্গ গোড়া থেকেই থাকে।

বিবেক অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়

বিবেকের বিচারকে আমরা অব্যবহিত (immediate), অনন্য (unique) ও স্থির বা চূড়ান্ত (absolute) বলছি। একটা উদাহরণে বক্তব্যটি পরিষ্কার

হবে। যেমন 'শুভ' বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে। শুভকে সাধারণতই আমরা করণ কারকে বুঝি, যা ভালো করায় (good for something) বা কিছুর জন্যে ভালো। কুইনিন 'ভালো' কারণ ম্যালেরিয়া তাড়ায়। ম্যালেরিয়া তাড়াবো কেনো? যেহেতু ম্যালেরিয়া একটি রোগ। রোগ তাড়াবো কেনো? কারণ রোগের থেকে সুস্থতা ভালো। কেনো সুস্থতা ভালো? ভাল ভাবে থাকার জন্যে। কেনো ভালো ভাবে থাকবো? তখন বলতে পারি, আমার ইচ্ছে। জবাবটা ঠিক রূপকথার গল্পের শেষে পিঁপড়ের ইচ্ছের মতো। অর্থাৎ প্রশ্নের পর প্রশ্নে এমন একটা জায়গায় পৌঁছানো হচ্ছে যখন আর কোন স্পষ্ট প্রায়োগিক ও প্রয়োজনীয় জবাব দেওয়া যায় না।

বিবেকের বিচার : অব্যবহিত অনন্য ও বিশিষ্ট

আমার ইচ্ছে বললে আর কারণের প্রসঙ্গ থাকে না। যে কোন ভাবেই প্রশ্ন করলে দেখা যাবে যে একটা পর্যায়ে প্রয়োজনের জবাব শেষ হচ্ছে এবং আমরা নিশ্চুপ হতে বাধ্য হচ্ছি। সুতরাং বিচারটি অনন্য হচ্ছে যেহেতু তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নেই; চূড়ান্ত বা স্থির হচ্ছে কারণ 'আমি মূল্যবান মনে করছি' এই বক্তব্যের বাইরে আর কোনো লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না; বিচারটি অব্যবহিত কারণ তাকে বোধি ব্যতীত জানা যাচ্ছে না, অন্য কোনো বিচার থেকে তাকে সিদ্ধান্ত হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্ডিনাল নিউম্যান এই অবস্থাকেই বলেছেন 'One step enough for me' অর্থাৎ এর বেশি আমি বলতে পারবো না। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জিও সঠিক বলেন যে 'Perhaps we may interpret conscience as meaning the apprehension of the immediate step to be taken. It is the direct perception that, so far as our knowledge goes, some particular time of conduct is what is right. for us'.

সুতরাং নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে নৈতিক বোধ বা বিবেকের কথা থাকছে। যে মানসিক বোধের সাহায্যে কর্মের নৈতিকতা বিচার করা যায় তাকেই আমরা বিবেক বলবো। বিবেক দুভাবে কাজ করে। প্রত্যেক কর্মের সঙ্গে বিধি ও নিষেধের বাহ্য নির্দেশ দ্বারাই বিবেক কোনো কাজকে সমর্থন করে এবং কোনো কাজকে করে না। কাজটা আমরা করি বা করি না তাতে কিছু এসে যায় না, বিবেক যথারীতি তার নির্দেশ জানাবেই জানাবে। যারা বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনতে অভ্যস্ত তারাই একমাত্র বিবেকী ব্যক্তি অর্থাৎ নৈতিক ব্যক্তি।

২। বিবেক সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব (Some Theories of Conscience.)

(ক) সুখবাদী বা উপযোগিতাবাদী বক্তব্য—বিশেষ মানসিক বোধ বা বৃত্তি হিসেবে বিবেককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন উপযোগিতাবাদীরা। কারণ তাঁরা একমাত্র সুখকেই জীবনের কাম্য বলেন। তাঁরা আত্মপ্রেম ও বিবেচনাকেই বিবেকের সমার্থক মনে করেন। একমাত্র সুখই যদি জীবনের পুরুষার্থ হয় তবে বিবেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না কারণ সুখের বিবেচনাতেই কর্মের শুরু। কর্মের ফলেই সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাবৎ দুঃখকে বর্জন করে সুখের সন্ধান করাই একমাত্র কর্তব্য। সুখ ও দুঃখকে সহজেই প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে চেনা যায়। তার জন্যে বিশেষ বোধের দরকার করে না।

অহংবাদী সুখতাত্ত্বিকরা ধরেই নিয়েছেন সুখ মানুষ চাইবে। সুতরাং আত্মসুখের প্রেরণা থেকেই মানুষ বিবেচনায় কেবল মাত্র সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক সুখের কথা ভাববে। কাজেই এঁদের কাছে বিবেক নিছক দূর দৃষ্টি, ভাগ্যের ধারণা, বোধ ও অনুমান মাত্র। যাঁর অনুমান সবচেয়ে ভালো তিনিই সবচেয়ে বেশি সুখী। গ্রীক এরিস্টাপ্পস ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই সুখ বলতেন। এপিকিউরস তার সঙ্গে যুক্তিকে মিশিয়ে ছিলেন। এরিস্টাপ্পসের কাছে লক্ষ্যটাই মূল ছিলো, তিনি পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি কিন্তু এপিকিউরস সঙ্গে যুক্তি বিবেচনার পদ্ধতি ছকেন।

উপযোগিতাবাদী (Utilitarians)-দের মতেও সুখই কাম্য। তাঁরা অবশ্য **সহানুভূতিকেই** বিবেক বলতেন। সহানুভূতি বোধ ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে। অনুষঙ্গের নিয়ম ও স্বার্থ রূপান্তরের নীতিতে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই সহানুভূতিকে জানতে পারে। মিল যেমন লেখেন 'The internal sanction of duty is a feeling in our own mind; a pain, more or less intense, attendant on violation of duty. This feeling, when disinterested, and connecting itself with the pure idea of duty, not with some particular form of it, is the essence of conscience; উপযোগিতাবাদীরা সহানুভূতির কথা তোলেন যেহেতু ওঁরা জানেন যে মানুষ সমাজে বাস করে এবং সহানুভূতি ব্যতীত

বিবেক সুখের জন্যই কর্মকে চালায়

একের অহং অন্তকে বিপদগ্রস্থ করে তুলবে। সমবেদনা ও সহানুভূতিতে বরং নিজের স্বার্থ পেরিয়ে অন্যদের কথাও ভাবা যায় এবং তখনই একমাত্র সমগ্র সমাজের মঙ্গল। কিন্তু সহানুভূতিই সব নয়; সহানুভূতিতে কিছুটা অন্ধতা থাকে। সহানুভূতির সঙ্গে সক্রিয় বিবেচনা মেলাতে হয়। বিবেচনাতেই ব্যক্তি সহানুভূতিকে পরিচালনা করে।

অনেকে সহানুভূতির উৎস নিয়ে ভাবিত হন। বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকরা জানান যে সুখের ধারণা যেমন অভিজ্ঞতা-নির্ভর তেমনি সমবেদনা সামাজিক। সমাজবদ্ধ মানুষ নিজের প্রয়োজনেই বংশপরম্পরায় সমবেদনার সংস্কার অর্জন করে। সমবেদনাতেই তার নিজের সুবিধে, অন্যদেরও সুবিধে। অর্থাৎ সমবেদনা ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। সামাজিক উত্তরাধিকার থেকেই ব্যক্তির মনে তা ছড়িয়ে যায় পরিবারের মারফৎ।

(খ) বোধিতত্ত্বে বিবেক (**Conscience in Intuitionism**)

বোধিবাদীদের মতে বিবেকই অন্তর্নিহিত নৈতিক বোধ। বোধ আপনা থেকেই সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে ন্যায় অন্যায়কে বুঝতে পারে। বিবেক প্রত্যেক বিশিষ্ট কর্মের নৈতিকতা স্থির করে। জীবনের কর্মে বিবেকই একমাত্র ধ্রুব। বিবেকের কোনো বিচ্যুতি নেই।

বোধিবাদীরা অনেকে আবার বিবেককে নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে নন্দনবোধ বা সৌন্দর্যবোধ বলেন। তাঁদের মতে কর্মের সুষমা বিচারে এই বোধটি প্রযোজ্য হয়। বিবেক সরাসরি কর্মের রূপ ও সুষমা থেকেই ন্যায় অন্যায়ের কথা বলে। সুষমাহীন কর্ম অন্যায় এবং সুষমাযুক্ত কর্ম ন্যায়। সুষমা বিচারে বিবেকই ধ্রুব। বিবেকের কোনো বিচ্যুতি নেই। এই বক্তব্যের প্রচারক হলেন হাচেসন ও স্যাফ্‌টসবেরী।

তৃতীয় গোষ্ঠির বোধিবাদীরা যেমন কাডওয়ার্থ ক্লার্ক প্রমুখরা বিবেককে বুদ্ধি বা যুক্তির বোধ বলেন। বিবেক বোধির দ্বারা জাগতিক নৈতিক নিয়মাবলীকে জানতে পারে। নিয়ম চার পাশে ব্যাপ্ত আছে, বিবেক তাদের যুক্তিতে প্রায় গণিতের মতো জানতে পারে। জানার ক্ষেত্র পর্যন্ত বিবেকের কোনো বিচ্যুতি নেই। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটতে পারে। তাই ওঁরা বলেন বিবেককে শিক্ষায় যোগ্য করে তুলতে হয়।

বাটলার বলেন আত্মপ্রেম, মহানুভবতা ও বিবেক এই তিনটি হলো চরিত্রের মূল অংশ। এই তিনটি যুক্তিবুদ্ধির নীতি। এরা যদিও পরস্পর সম্পর্কিত

তবু বিবেক আত্মপ্রেম ও মহানুভবতা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ একমাত্র বিবেক চিন্তায় স্তায়ের তত্ত্ব বিষয়ে অবহিত হতে পারে। চরিত্রের অন্যান্য অংশকে বিবেক পরিচালনা করে। বাটলার তাই বলতে পারেন 'Had it strength, as it has right, had it power, as it has manifest autho rity, it would absolutely govern the world.'

বিবেক অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের যেমন আছে তেমনি প্রত্যেক মানুষেরও আছে। বিবেকের বিচার বলতে তাই ব্যক্তিবিশেষের বিচার বোঝা হয় না, পৃথক পৃথক ব্যক্তির মনে সর্বজনীন বিবেকই উপস্থিত। তাদের চিন্তা ও বিচার বিশ্বজনীন বিবেকের অংশ হিসেবেই গুরুত্ব পায়। রাস্কিন যেমন বলেন যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র তার বিবেক নিয়েই পূর্ণ হতো তবে তার বিবেককে গাধার বিবেক বলা যেতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ বিচারের মান হলে কখনোই সত্যে পৌঁছানো যায় না। সুতরাং বিবেককে সামান্য ও বিশ্বজনীন বলতে হয়।

বোধিবাদীরা যখন বলেন বিবেক অভ্রান্ত তখন কেউ কেউ এ-কথায় আপত্তি তোলেন যে, এ-কথা মানলে বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন বিচার ও ভুলত্রুটির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই বিপদ থেকে দূরে থাকবার জন্যে অন্যরা জানান, বিবেক যতোটুকু বোধির সাহায্যে নৈতিক নীতি জানছে, ততোটুকুই সে অভ্রান্ত। তবে বুদ্ধি নিশ্চয়ই প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে। সুতরাং প্রয়োগ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে বিবেক গোড়া থেকেই পরিণত নয়, তাকে শিক্ষায় পরিণত করা যায়।

কাণ্ট ও কড্‌ওয়ারউড বিবেককে অভ্রান্ত মনে করতেন। কাণ্টের ভাষায় 'ভ্রান্তবিবেক' বলে কিছু হয় না। কারণ যদি বিবেককে অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের পরিচালক বলে স্বীকার করি, তবে আবার ভ্রান্তি কি! কড্‌ওয়ারউডও বলেন বিবেককে শিক্ষা দেওয়া যায় না।

বিবেকের অস্তিত্ব স্বীকার করবার পর অনেকে কিন্তু বিবেককে নৈতিকবোধ বলতে রাজী নন। যেমন স্টুঅর্ট ও মিল। স্টুঅর্ট বলেন বিবেক ও নৈতিকবোধ পৃথক। ওঁর মতে বিবেক ব্যক্তির নিজস্ব কর্মের ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক কিন্তু তার সঙ্গে অন্যের কর্মের কোন যোগ নেই। স্টুঅর্টের এই বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ, ওঁর বক্তব্য মানলে ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিতে একটি দ্বৈত তৈরি করা হয়। আমাদের তখন ভাবতে হবে আমার বিবেক ও অন্য লোকদের বিবেকে

কোন সংযোগ নেই। আমি যে-বোধে নিজের কর্মকে বিচার করতে পারি তার দ্বারা কেনো যে অন্যের কর্মকে বোঝা যাবে না সেকথা স্টুয়ার্ট বলতে পারেন না।

মিলের মতে বিবেক **আবেগপ্রবণ** ও নৈতিক বোধ **বুদ্ধিচালিত**। তিনি লিখেছেন 'The internal sanction is a **pain,** more or less intense, attended on a violation of duty. This **feeling** when disinterested and connecting itself with the pure idea of duty, and not with some peculiar form, or with any of the merely accessory circumstances, is the essence of **conscience.**' মিলের উদ্ধৃতিতে জানা যাচ্ছে যে, **মনের আবেগ কর্তব্যে মিলিত হলেই** মিল তাকে বিবেক নাম দেন।

আর নৈতিকবোধ ওঁর ভাষায় Our **moral faculty** is a branch of our **reason,** not of our sensitive faculty, and must be looked to for **abstract doctrins of morality** not for perfection of it in the concrete.' মিল বলেন যে বুদ্ধি আমাদের নৈতিক বোধ তৈরি করে এবং এই নৈতিকবোধ কার্যত নির্ভর করে অভিজ্ঞতার ওপর। সুখদুখের হিসেব করে তালিকাবদ্ধ করেই নৈতিক নীতি তৈরি করা হয়।

(গ) **কাণ্টীয় কৃচ্ছ্রতাবাদ ও বিবেক**—কাণ্টের দর্শনে অনুভূতির কোনো স্থান নেই। সমস্ত রকম আবেগ অনুভূতিকে নির্মূল করে বুদ্ধির নির্দেশে চলাই মানুষের কর্তব্য। কর্মের লক্ষ্য কর্তব্য, কর্তব্যের জন্য কর্ম। কাণ্টের মতে বাসনাহীন কর্তব্যকর্মই একমাত্র নৈতিক কর্ম। কাণ্টের সঙ্গে মিলের পার্থক্য এই প্রসঙ্গেই।

আবেগের ভূমিকা ছাড়াই কাণ্ট ও মিলের আরো একটি তফাৎ আছে। মিলের মতে বিবেকের মূলে আছে অনুমান আর কাণ্ট বলেন বিবেকের মূলে আছে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। মিল বলেন সেই কাজটাই ভালো যাতে অধিকাংশ লোকের সুখবিধান হয়। কিন্তু প্রশ্ন থাকে কাজের ফলাফল আগেই জানাবো কি ভাবে? মিলের সিদ্ধান্তে অনুমান আমাদের সে কথা জানায়। অনুমানের সার্থকতার ওপরেই বিবেকের চরিত্র নির্ভর করছে। সুতরাং বিবেকের ভিত্তি আনুমানিক যুক্তি।

কাণ্টের মতে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে অনুমানের দরকার করে না। আমরা চেষ্টা ছাড়াই নিজেদের অস্তিত্বকে জানি। তেমনি ভাবে কর্মের চরিত্র বোঝা যায়। সুতরাং কর্মের ফল বিষয়ে চিন্তা না করেই কর্মের চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ ফল ভালো হলেও কাজটি অন্যায় হতে পারে বা ফল খারাপ হলেও কাজটি ন্যায় হতে পারে। অনুমান-নিরপেক্ষ এক ভাগবত শক্তি আমাদের আছে যার দ্বারাই নৈতিক বোধ জন্মায়। একেই বিবেক বলে। বিবেকের জন্য কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। অভিজ্ঞতা বিচারের জন্য গোড়া থেকেই আমাদের মনে বিবেক উপস্থিত। বিবেক বোধিতেই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। কাণ্ট তাকে বলেন 'নৈতিক যুক্তি' (Moral Reason)। অর্থাৎ বিবেক আলোর মতো স্বপ্রকাশ।

বিবেক কাণ্টের মতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বোধ নয়, বিবেক সামান্য ও সর্বজনীন। বিবেকের নির্দেশ তেমনি অভ্রান্ত। অনুমানের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে কিন্তু বোধি কখনো বিপথে চালিত করে না।

(ঘ) পূর্ণ পরিণতিবাদ ও বিবেক—পরিণতিবাদী পণ্ডিতরা সমস্ত কর্মকেই বিবর্তনের নজীরে ব্যাখ্যা করায় বলেন বিবেকেরও পরিবর্তন আছে। তাই তাঁদের প্রথম প্রতিপাদ্য হলো বিবেকের নির্দেশ চিরন্তন নয়। বিবেক সর্বজনীন হতে পারে, এমন কি সামান্যও হতে পারে কিন্তু তার নির্দেশ চিরকাল এক হতে পারে না। আমরা দেখছি এক এক কালে ও এক এক দেশে আচরণ বিভিন্ন। আচরণের বিভিন্নতাই প্রমাণ করে বিবেকের অনিশ্চয়তার কথা।

দ্বিতীয়ত, পূর্ণতাবাদের মতে বিবেকের নির্দেশ অনুমান-নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সত্য নয়। পরিণতবাদীরা বলেন যে বিবেকের চরিত্রে অনুমান আছে এবং অনুমানের কারণেই তার সিদ্ধান্তে ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে। অনুমাণ যে সত্য তার প্রমাণ কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আমাদের বিবেচনা করতে হয়, ভেবে স্থির করতে হয় কোন্ কাজটি উচিত হবে বা হবে না।

বিবেক নির্ভুল কিন্তু তার সঙ্গে অনুমানের যোগ আছে যেহেতু মানুষ জন্মেই পূর্ণ নয়

সুতরাং যে কর্মটিই তখন বাছাই করি না কেনো তার সত্য মিথ্যা ফলাফলের ওপর বা আরো বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে। কার্যত, তাই কাণ্ট মানুষের ক্ষেত্রে আবেগ ও বুদ্ধিকে যতোটা তফাতে রেখেছেন তা সম্ভব নয়। কারণ একাধারেই মানুষ আবেগ ও বিবেচনার প্রতিমূর্তি। নির্মোহ কর্মের পেছনেই

তার অসংখ্য মোহ জমা হয়ে থাকে। এই আবেগ ও বিবেচনার টানাপোড়েনেই বিবেক মন স্থির করে।

তৃতীয়ত, পরিণতিবাদীরা বলেন যে বিবেকের নির্দেশ অহেতুক নয়। কাণ্ট কর্মের চরিত্র যে কেনো গ্যায় বা অন্যায় তা বলেন না। বিবেকের ছাড়পত্র পেলেই কর্ম সৎ বা অসৎ। পরিণতিবাদীরা আপত্তি জানিয়ে দেখাতে চান যে ন্যায়-অন্যায়ের জন্য অন্য কোনো যুক্তি না থাকলে, বিবেককে স্বৈরাচারীর সিংহাসন দিতে হয়। ওঁদের মতে বিবেক নির্দিষ্ট কারণেই কর্মকে ভালোমন্দ বলে। এই কারণটি জীবনের মধ্যেই নিহিত। জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করাই চরম আদর্শ; শ্রেয়র প্রতি দৃষ্টি রেখেই কর্মের নৈতিক মূল্য স্থির করা হয়। বিবেক পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কর্ম বিষয়ে নির্দেশ দেয়।

বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে বিবেকের অস্তিত্ব বিষয়ে সবার মিল আছে। তফাৎ হচ্ছে বিবেকের চরিত্র ও বিবেক নির্দিষ্ট কর্মের চরিত্র বিষয়ে। বিবেককে শুধুমাত্র আবেগ অনুভূতি বা শুধুমাত্র যুক্তি বিবেচনা বলায় মানুষের মৌলিক চরিত্রটিই অবলুপ্ত হয়। কারণ মানুষ একাধারেই আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং মন আবেগে পরিচালিত হবে এবং যুক্তি বিবেচনায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে মনের আবেগকে যুক্তির পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ করেই জীবনের আদর্শ মূর্ত করতে হয়।

বিবেক ও অভিজ্ঞতার যোগ আছে। কারণ অভিজ্ঞতাতেই কর্মের চরিত্র স্থির হয় এবং বাছাইয়ের মধ্যে মন নিজের লক্ষ্য বিষয়ে অবহিত হতে পারে। কিন্তু এ-কথার অর্থ এই নয় যে অভিজ্ঞতাতেই বিবেকের জন্ম। কারণ এ-কথা মানলে অভিজ্ঞতার পূর্বে বিচারের কোনো মানদণ্ড থাকে না এবং পূর্বে যদি বিচারের মানদণ্ড না থাকে তবে পরিশেষেও তার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পূর্বেই বিবেকের ধারণা থাকে।

বিবেকের বিচার যেমন অনুমানজাত তেমনি অভ্রান্ত। অভ্রান্ত কেনোনা বিবেক সর্বদাই সত্যকে জানায়। অনুমানজাত কারণ বিবেক অজ্ঞাত কর্মে তার বিচারকে প্রয়োগ করে। জন্ম মাত্রই কোনো ব্যক্তি পূর্ণ নয়। তাকে আত্ম-আবিষ্কার করেই পূর্ণতা পেতে হয়। সুতরাং আত্ম-আবিষ্কার পর্বে পর্বে ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই সে চলতে থাকে।

বিবেক ও বিবেচনা (Conscience and Prudence)

বিবেক কর্মের নৈতিকতা বিচার করে আর কর্মে মানুষের বিবেচনা ও

বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, বিবেক ও বিবেচনার সম্পর্ক কি? বিবেচনা ও বিজ্ঞতাই কি বিবেক? বহুক্ষেত্রেই বিবেচনা সত্ত্বেও বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায় না বা শাস্তির ভয়ে, পুরস্কারের লোভে আমরা অনেক কাজ করি যাতে বিবেচনার প্রকাশ হয় কিন্তু তাকেই বিবেক বলতে আমাদের বাধে। মনে মনে জানি ন্যায় কোন্‌টা কিন্তু মাথা বাঁচাবার জন্য আমরা উল্টো কথা বলতে পারি। উল্টো কথায় জীবন রক্ষা পায় বটে কিন্তু ন্যায় বা সত্যের প্রকাশে বিবেকের স্বীকৃতি থাকে না। অধ্যাপক মার্টিন্যু যেমন বলেন বিবেক হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি (insight) আর বিবেচনা হচ্ছে দূরদৃষ্টি (foresight)। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে **বিবেচনার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, লাভ-লোকসান জড়িত।**

বিবেককে আমরা বিশিষ্ট মানসিক বোধ বলেছি। আমাদের মনের অনুভব ও স্মৃতির মতোই বিবেক একটি বৃত্তি যা নিজের ক্ষেত্রে সর্বদাই অভ্রান্তভাবে পথ-নির্দেশ করে। ধরা যাক যেমন স্মৃতির সাহায্যে আমরা অতীতকে স্মরণ করি, বিবেকের সাহায্যেও তেমনি কর্মের ভালো-মন্দকে জানতে পারি। স্মৃতি অবশ্য মনে একক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করে না, তার সঙ্গে অন্যান্য মানসিক বৃত্তিও জড়িত থাকে।

বিবেচনা অনুমানিক ও প্রযে জনগত

বিবেক সম্পর্কেও একই রকমে বলা যায় যে বিবেকের সঙ্গেও অন্যান্য প্রক্রিয়া মনে কাজ করে। তৎসত্ত্বেও স্মৃতিকে যেমন পৃথক বৃত্তি বলেছি তেমনি বিবেককেও পৃথক বোধ বলতে হয় যেহেতু তার নিজস্ব পৃথক কর্ম আছে। বিবেক স্বপ্রকাশিত আলোকের মতো কর্মের চরিত্রকে উদ্‌ভাসিত করে। বিবেককে জানা যায় বোধিতে। কিন্তু বিবেচনার সঙ্গে বোধির যোগ এতো ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ নয়। **বিবেচনা প্রধানতই আনুমানিক।।** বিবেচনার সঙ্গে সর্বত্র নৈতিকতার যোগও নেই। **বিবেচনার প্রশ্ন কর্মের কার্যকারিতা বিষয়ে, নৈতিকতা বিষয়ে নয়।**

বিবেক **অন্তর্দৃষ্টি আর বিবেচনা দূরদৃষ্টি।** বিবেকের নির্দেশে আমরা জানি যে মানুষের কর্ম সগুণ। ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক প্রত্যেক কর্ম তার গুণেই প্রকাশিত। যেমন ন্যায়-কর্মে ন্যায্যতা গুণটিই কর্মকে বিশিষ্ট চরিত্র দেয়। এই গুণটির কারণে কর্মটি চিরকালই ন্যায় থাকবে। গুণটি কর্মের লক্ষণ। বিবেক কর্মের এই অন্তঃস্থ গুণটি জেনেই তাকে আমাদের কর্তব্য বলে নির্দেশ দেয়। দূরদৃষ্টি কর্মের যে 'গুণ' লক্ষ্য করে তা সামাজিক অর্থাৎ বহু মানুষের

সম্পর্কে তার লাভ-লোকসানের হিসেব খতিয়ান করা হয়। কর্মের নিজস্ব চরিত্রের ওপর লাভ-লোকসান নির্ভর করে না। নির্ভর করে প্রয়োগের ওপর। কর্মের প্রয়োগকে স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলেই বিবেচনার সিদ্ধি ঘটে।

বিবেক ও বিবেচনা উভয়তই মনের নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের চরিত্র দুটি ক্ষেত্রেই এক নয়। বিবেকের নিয়ন্ত্রণ অন্তরের আর বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরে থেকে। বিবেচনায় স্বার্থের বিচার হয়, স্বার্থ যেহেতু সামাজিক বিবেচনায় কর্ম সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিলেই স্থির হয়। বিবেক বাইরের সামাজিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনা কিন্তু তার নির্দেশ ব্যক্তির মনে। সে তা মানতে পারে, নাও মানতে পারে কিন্তু মানা-না-মানার সঙ্গে সামাজিক লাভ-ক্ষতির কোনো যোগ নেই। অথচ বিবেচনার সঙ্গে সর্বদাই বাইরের প্রয়োজন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

বিবেকের যোগ সবার সঙ্গে কিন্তু বিবেচনার যোগ প্রধানতই নিজের সঙ্গে। বিবেক যেহেতু বাইরের সামাজিক লাভ লোকসানের হিসেব করে না, বিবেক সর্বদাই এমন একটা সত্যে পৌঁছাতে চায় যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির মূল্যই স্বীকৃত। কারণ ব্যক্তির বিবেক সামান্য ও সর্বজনীন বিবেকেরই অংশমাত্র। বিবেচনা নিছক লাভক্ষতির ব্যবহারিক হিসেব করায় হিসেবের লক্ষ্য সর্বদাই ব্যক্তির নিজের স্বার্থ। বিবেকে তাই আত্মোৎসর্গের কথা থাকে, নির্মোহ হবার কথা থাকে। কিন্তু বিবেচনায় আত্মত্যাগের কথা ওঠে না। আত্ম ও মোহের সঙ্গেই তার যোগ। সুতরাং আমরা বলতে পারি বিবেকের সম্পর্ক 'পাকা আমি'র সঙ্গে আর বিবেচনার যোগ 'কাঁচা আমি'র সঙ্গে।

বিবেচনাকে কখনো বিচক্ষণতা (wisdom) বা জ্ঞান বলা হয়। শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে বিবেচনা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এলে নিশ্চয়ই জ্ঞান ও বিবেকে ফারাক থাকে না। জ্ঞানেই মানুষ আশু লাভক্ষতির বন্ধন পেরোতে পারে এবং গীতার উপদেশ মতো নিষ্কাম কর্মে নিজের সত্তাকে প্রকাশ করতে পারে।

অনুশীলনী

১। Define Conscience and show how far it is reliable as a guide to moral actions.

২। Discuss the different views of Conscience and draw your own conclusion.

৩। Distinguish between Conscience and Prudence and discuss their connection in moral judgment.

একাদশ অধ্যায়

নৈতিক কর্তব্যবোধ

১। কর্তব্যবোধের চরিত্র (Nature of obligation).

প্রত্যেক কর্মের সঙ্গেই কর্মের বাধ্যতা জড়িত থাকে। নিছক লাভ লোকসানের কর্মেও বাধ্যতা থাকে। বাধ্যতা আসে কর্মের ফলাফল থেকে। অর্থাৎ যে কাজ করলে আমার লাভ হয় সে কাজ আমি কর্তব্য বোধেই শুধু করি না। তার পেছনে আমার প্রচুর উৎসাহ থাকে। তেমনি নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রেও ন্যায়-কর্ম বিষয়ে আমাদের মনে একটি বাধ্য-বাধকতা তৈরি হয়। মনে মনে বলি যে কাজটি আমার করা উচিত। যা উচিত তা প্রতিপালিত হবার দাবি করে। ঔচিত্যের এই বাধ্য-বাধকতায় সামাজিক আইনের জোর নেই কিন্তু আমরা নিজেদের গরজেই তাকে কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করি।

প্রশ্ন হতে পারে কেনো এই বাধ্য-বাধ্যকতা। লাভক্ষতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বাধ্য-বাধকতা থাকে যে, এই কাজটা করলে লাভ হবে সুতরাং করবো, ওটা করলে ক্ষতি হবে সুতরাং করবো না। নৈতিক কর্মের সঙ্গে প্রয়োজনের কোনো যোগ না থাকায় বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটি জটিল হয়। এই প্রশ্নটিকে নানা ভাবে আলোচনা করা যায়।

(ক) আইনী বিধি ও বাধ্যতা (Legal Theory and Obligation)

আইনজ্ঞরা বলেন রাষ্ট্র, সমাজ বা ঈশ্বর যা নির্দেশ দেন তাই ন্যায় এবং তদনুযায়ী কাজ করাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্যকে আমরা স্বীকার করবো কেনো? গ্লকন ও এডিম্যান্টাসের মতো বলতে পারা যায়, সামাজিক পুরস্কারের লোভে ও সামাজিক শাস্তির ভয়ে। লোভ ও ভয়টা যেমন সমাজ বা রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গেও আমাদের একই সম্পর্ক। ঈশ্বরকে কখনো আমরা ঘুষ দেবার চেষ্টা করি ও কখনো শাস্তির ভয়ে মানতে চাই।

এই তত্ত্বটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না কারণ নৈতিক কর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীন কর্ম। স্বাধীনতার অভাবে, নিয়ন্ত্রণের অধীন কর্ম আদৌ নৈতিক কর্ম নয়।

(খ) সুখবাদ ও বাধ্যতা (Hedonism and Obligation)—

আত্মসুখবাদে আত্ম বা অহংটাই সব। সমস্ত কর্মেই শুধু নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থ। কাজেই যে কাজে নিজের সুখ নেই সে কাজের বাধ্যবাধকতা নেই। প্রশ্ন ওঠে, আমরা ভালো কাজ করবো কেনো? তার জবাবে সুখবাদ জানায় যে ব্যক্তির নিজেকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং তাকে নিজের স্বার্থের কথা ভাবতেই হবে। নিজের মঙ্গলের কথাই তার ওপর বাধ্যবাধকতা চাপাবে।

সর্বসুখবাদীরা বলেন যে-কাজে অধিকাংশ লোকের সুখ সে কাজই শুভ এবং আমাদের এমন শুভ কাজ করাই কর্তব্য। পরের সুখের জন্য আমরা কাজ করবো কেনো প্রশ্নের জবাবে সুখবাদ জানায় যেহেতু আমি পরের সঙ্গে সম্পর্কিত সুতরাং পরের কাজ ছাড়া আমার নিজের কাজ হবে না। পরোপকারে অভ্যস্ত হলে মন নিজে থেকেই আমাদের এমন কাজে উদ্‌বুদ্ধ করবে। সঙ্গে আছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও বিবেকের প্রেরণা।

হর্বর্ট স্পেনসর বলেন ভয় থেকেই কর্তব্যবোধ তৈরি হয়। তিনি লেখেন 'Because man learned his duty under the prescription of political, religious and social authorities, it is thought that fear ot punishment is the real meaning of obligation.' তিনি অবশ্য আরো বলেন যে কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা সামাজিক ভারসাম্যহীনতার জন্যেই গড়েছে। সমাজে যখন ভারসাম্যতা থাকে না অর্থাৎ হয় ব্যক্তি নয়তো সমাজের পাল্লা বিশেষ একদিকে ঝোঁকে তখন সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। কারণ তখন ব্যক্তি বা সমাজ নিজের স্বার্থেই উদ্‌বুদ্ধ থাকে। বাধ্যবাধকতা চাপ দিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে। ব্যক্তি ও সমাজের সার্থক সম্পর্কে বাধ্যবাধকতার আর প্রয়োজন থাকবে না। কারণ তখন ব্যক্তি ও সমাজ যে যার সীমায় সচেতন ভাবেই নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে, জোর করে পালন করাবার প্রয়োজন থাকে না। স্পেনসর প্রমুখরা কিন্তু খেয়াল করেন না নৈতিক কর্মের বাধ্যতা বাইরের নয়, বিবেকের।

(গ) বোধিবাদ ও বাধ্যতা (Intuitionism and Obligation)—

বোধিবাদে নৈতিক বাধ্যতার উৎস বিবেক। বিবেক আমাদের কর্মের চরিত্র বিষয়ে শুধু অবহিতই করে না, জানায় কর্মটি আমাদের করা উচিত। মার্টিন্যু বলেন যে ন্যায় ও বাধ্যতার সম্পর্কটি সংশ্লেষক (synthetic)। ওঁর মতে নৈতিক কর্মের বাধ্যতা তৈরি করেছেন ঈশ্বর। কর্মের অন্তঃস্থ গুণই তার

ন্যায় বা অন্যায় কিন্তু তৎসত্ত্বেও যা ন্যায় তার বাধ্যতা ঈশ্বর আমাদের ওপর চাপিয়েছেন। প্রায় আইনী বাধ্যতার মতো মার্টিন্যুর এই বক্তব্য। বাধ্যতায় দুটি ব্যক্তি উপস্থিত : ঈশ্বর ও আমি।

মার্টিন্যু বাধ্যতাকে ঈশ্বরের ওপর দাঁড করিয়েছেন ফলে কর্মের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ ঈশ্বর আমাদের কাছে কর্ম দাবী করলেও প্রতিপদে যদি বাধ্যবাধকতা চাপান তবে আমরা বড জোর যন্ত্রের মতো কাজ করি, কাজে নিজেদের বোধ ও সচেতনতার পরিচয় দিই না।

(ঘ) কৃচ্ছ্রতাবাদ ও বাধ্যতা (**Kantian Rigorism and Obligation**)—

কাণ্টের মতে কাজের ভালোমন্দ রাষ্ট্রবিধি বা সমাজের ওপর নির্ভর করে না। কাজটির ভালোত্ব তার নিজের মধ্যেই নিহিত। যেমন অসহায় নরনারীদের হত্যা করা খারাপ। যে ভাবেই হত্যা করা হোক বা যে-দেশেই হত্যা করা হোক, হত্যা নিঃসংশয়ে অনৈতিক কর্ম। কাণ্ট সুখবাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাই ফলের বিবেচনা ত্যাগ করে কর্মের নিজস্ব চরিত্রেই বাধ্যতা খুঁজতে বলেন।

সুখবাদের বক্তব্যে বাধ্যবাধকতা আসে সংশ্লেষণাত্মক ভাবে। কর্মের নিজস্ব ভালোমন্দ নেই কিন্তু তার সঙ্গে ফলাফলের হিসেবটা জুডলেই তা ভালো বা মন্দ। পূর্বে যে গুণ ছিলো না তাকে বর্তমানে আরোপ করাতেই কাণ্ট একে সংশ্লেষণাত্মক বলেন। তিনি বিশ্লেষক পদ্ধতির সমর্থক। তিনি বলেন প্রতি কর্মই সগুণ। তাদের ভালোমন্দ তাদের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলেই জানা যাবে, বাইরে থেকে জুডতে হবে না। যেমন যদি বলি মানুষের বুদ্ধি আছে তবে 'বুদ্ধি' নামক গুণটি মানুষ পদটির অন্তর্নিহিত, কিন্তু যদি বলি মানুষ দৌড়ায় তবে এই গুণটি পদের বাইরে থেকে আনা হয়েছে। তেমনি কোনো একটি কর্মকে ন্যায় বললে তার চরিত্রের মধ্যেই ন্যায়ের সূত্র থাকতে বাধ্য।

কাণ্টের বক্তব্য প্রধানতই সত্য কিন্তু তিনি সমস্ত রকম অনুভূতিকে বিসর্জন দেওয়ায় আলোচনা একদেশদর্শী হয়ে পডেছে।

(ঙ) পূর্ণপরিণতিবাদ ও বাধ্যতা (**Perfectionism and Obligation**)—

পরিণতিবাদীরা কাণ্টের বক্তব্য সমর্থন করেন যে কর্মের গুণ কর্মের নিজের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকে যে, ন্যায় গুণটি যদিও কর্মেই নিহিত তবু ন্যায়টি কি ? কাণ্ট এই প্রশ্নটির জবাব দিতে পারেন না। পূর্ণ পরিণতিবাদীরা

বলেন কর্মটি ন্যায়, কারণ কর্মটিতে আমার পরিণতির আদর্শ সিদ্ধ হচ্ছে। গীতায় ভগবান বলেছেন যে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত। তাকে কর্মের মধ্যেই সেই সম্ভাবনার পরিণতি আনতে হবে। যে-কর্ম এই ক্রম-উদ্‌বর্তিত আত্মপ্রকাশের সাহায্য করে তাই আমাদের জীবনে বাধ্যবাধকতা।

অপূর্ণ থেকে পূর্ণতায়, অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে যাওয়াটাই কর্মের লক্ষ্য। কর্মের নৈতিকতা প্রতিপদেই তাই বিচার হয় বিভিন্ন আত্ম-প্রয়াসের সঙ্গে। কর্মের বাধ্যতাও নিজেরই সৃষ্টি কারণ ওগুলো নিজের ওপরেই প্রয়োগ করা যায়। গ্রীন সেকথাই বলেন যে শ্রেয়র আদর্শকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। বাধ্যবাধকতা তাই নিজের কাছে, নিজের আত্মপ্রকাশের গরজে তৈরি।

২। **কর্তব্য (Duty)—**

নৈতিক ভাবে আমরা যা করতে বাধ্য তাকেই কর্তব্য বলে। বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কর্তব্যের গভীর যোগ। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে নৈতিক কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা যদিও নীতি বা নিয়ম মেনে চলে তবু তার পেছনে শাস্তিদানকারী কোনো শক্তি নেই। অর্থাৎ নৈতিক কর্তব্য ভাঙলেও বাইরের কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। জবাবদিহির প্রয়োজন একমাত্র নিজের কাছে।

কর্তব্যের সঙ্গে নিয়মের যোগ অঙ্গাঙ্গী। যেমন ইহুদীরা 'দশটি নির্দেশ' (Ten Commandment) মানতেন। নির্দেশে থাকে কিছু বিধি ও কিছু নিষেধ। কিছু করতে হবে এবং কিছু করতে হবে না। কিন্তু নৈতিক কর্তব্য ও নির্দেশের বাহ্য চাপে একটাই তফাৎ যে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ কেবলমাত্র স্বেচ্ছামূলক স্বাধীন কর্মেই প্রকাশিত হয়। বাইরের কোনো চাপ বা প্রলোভন বা ভয় থেকে কাজ করলে সেই বাধ্যতাকে আমরা নৈতিক বলিনা।

কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে নানা কর্ম, বাধ্যতা ও নির্দেশের কথা জীবনে ওঠে। যেমন সমাজে কোনো একটি নির্দেশ বা কর্তব্যের সঙ্গে অন্য একটি অধিকার দেওয়া হয়। রাষ্ট্র যদি বলে আমার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করো তবে সঙ্গে সঙ্গেই জানায় তার বদলে পাবে ধনপ্রাণের নিরাপত্তা। সমাজে তাই যথোচিত কাজ, কর্তব্য ও অধিকার একসঙ্গে চলে। যথাবিহিত কর্ম হচ্ছে সেগুলো যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে যা তার করা উচিত। এই উচিতটির যোগ কিন্তু ওই নির্দিষ্ট মুহূর্তের সঙ্গে,

সমাজেই কর্তব্য, অধিকার ও বাধ্যতার প্রশ্ন

জীবনের অন্য কিছুর সঙ্গে নয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটুকু সিদ্ধ হলেই কাজ শেষ হবে। এটা হলো সামাজিক কর্তব্য। নৈতিক কর্তব্যের ধারা কিন্তু সমস্ত জীবন ব্যাপী চলতে থাকে। নৈতিক কর্তব্য কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের নির্দিষ্ট কর্মেই শেষ হয় না। প্রতিটি কর্মকেই জীবনের পরিপূর্ণতার কথা স্মরণ রেখে তদনুযায়ী চলতে হয়। অর্থাৎ নৈতিক কর্তব্য সমগ্র জীবনের কর্তব্য এবং তার দায়িত্ব জীবনকে প্রতি মুহূর্তে এবং সামগ্রিক ভাবে পরিণত করা, কল্পনার সিদ্ধিতে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু কর্তব্যকে সামাজিকভাবেও বিচার করা যায়। অন্যান্য ব্যক্তি এবং সংগঠনাদির সম্পর্কে ব্যক্তিদের কর্তব্য থাকে। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে অন্যরা যা আশা করে। তাদের আশা মেটাবার কিছুটা দায়িত্ব আমার থাকে। এই দায়িত্বকেই কর্তব্য বলা হয়। আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করি কারণ আমিও একই রকমে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু ফিরে পাবার আশা রাখি, জীবন ধারণের জন্য তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি। একক ভাবে বাঁচা সম্ভব হলে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে কিছু থাকতো না। অধ্যাপক লিলি তাই কর্তব্যকে সামাজিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন 'A duty may thus be defined as the obligation of an individual to satisfy a claim made upon him by the community or some other individual member or members of that community in the name of common good.' অধ্যাপক লিলি সামাজিক মঙ্গলের নামে সমাজের যে-কোনো দাবিকেই ব্যক্তির কর্তব্য বলছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠবে (ক) সমাজের যে-কোনো দাবিই কি নৈতিক? (খ) সমাজ দাবি করলেই ব্যক্তি মানবে? প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে সমাজের যে-কোনো দাবিই নৈতিক নয়। নৈতিকতা ব্যক্তি বিচার করে দেখে। তার বিচারের মানদণ্ড নিশ্চয়ই নিছক ব্যক্তিগত নয়, তার মনে সামান্য নীতির ধারণা থাকে। সমাজের দাবির পেছনে তাই শক্তি থাকে, জোর জবরদস্তিতে মানিয়ে নেবার কথা থাকে। তাই বলা যায়, সমাজের বহু ক্ষেত্রে প্রধানত যথোচিত কর্মের কথা থাকে, নৈতিকতার দাবি অনেক কম থাকে। সুতরাং ব্যক্তি সমাজের সব কথা মানবেই এমন দাবি করা যায় না। সমাজ যদিও যথোচিত কর্মের দাবি করে এবং প্রয়োজন মতো জোরের সঙ্গে তা মানিয়ে নেয় তবু সমাজের ভিত্তি নৈতিক কারণ নৈতিকতার জন্যেই

সমাজের যে কোনো দাবিই নৈতিক নয়

ব্যক্তিদের জীবন সমাজে সংগঠিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে জন্মে তার কিছু কিছু অংশ স্বীকার করে নেয় যদিও তাকে বারবার সমাজের নৈতিকতা নিজের অভিজ্ঞতায় জানতে হয়। অধ্যাপক লিলি অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ নৈতিকতার কথা জানাচ্ছেন না, কেবলমাত্র সামাজিক মঙ্গল বলেই সমাজের দাবিকে মানাতে চাচ্ছেন। আসলে প্রাথমিক কর্তব্য নিজের কাছে এবং সেই সূত্রেই অন্যদের কাছে।

কর্তব্যের সঙ্গে আসে অধিকার। অধিকার শব্দটির সঙ্গে আইনের সম্বন্ধ আছে। সমাজ বা রাষ্ট্র আইনের মধ্যে অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়াও নৈতিক আইন আছে। নৈতিক আইন যদিও কোনো প্রাকৃতিক বা সামাজিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয় তবু নিজের স্বার্থেই আমরা তা মানি। সুতরাং নৈতিক কর্তব্যের সঙ্গেই অধিকারের কথা থাকে যেহেতু অধিকারেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সচেতনতার শুরু। অধিকার কর্তব্যপালনের প্রতিদানই শুধু নয়, অধিকার মূলত স্বাধীন কর্মের ভিত্তি। কারণ আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি এই ভাবনা থেকেই কর্মের প্রেরণা জাগে। সমাজে অবশ্য অধিকারগুলো নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পারস্পরিক সমর্থন ও আদান প্রদানের সঙ্গে অধিকারগুলো স্থির হয় কারণ ব্যক্তিদের পারস্পরিক স্বীকৃতিই কর্তব্য স্থির করে দেয়। আমার অধিকার থাকে বলেই আমি অন্যদের অধিকার মানি। প্রত্যেক কর্তব্যের সঙ্গেই তাই অধিকার থাকে যেমন অধিকারের সঙ্গে থাকে কর্তব্য। তবে অধিকারাদি প্রধানতই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্তব্যও তাই সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার যেমন বলেছেন 'Duties are the conduct…by which institutions are maintained.' তবে সমস্ত কর্তব্যই যে সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয় তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। নিজের প্রতি কর্তব্যে সংগঠনের প্রশ্ন ওঠে না।

অধিকারের সঙ্গে আইন ও সংগঠনের যোগ

কর্তব্যের নির্দেশ (Some Fundamental Commandments)

আমরা কয়েকটি প্রধান কর্তব্যকে তালিকাবদ্ধ করতে পারি। এই কর্তব্যগুলো নির্দেশের আকারে প্রচলিত। নির্দেশগুলির অধিকাংশই যদিও রাষ্ট্রীয় আইনে স্বীকৃত কিন্তু তাদের নৈতিক মূল্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে না। স্বকীয় নৈতিক মূল্যেই তাদের গুরুত্ব। (ক) জীবনের প্রতি মমতা। এই মমতাকে আমরা প্রকাশ করি 'কাহাকেও হত্যা করিবে না' নির্দেশটিতে। এই

নির্দেশটি কেবল হত্যা থেকে বিরত হতেই বলছে না। যার যার নিজস্ব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে বলছে। হর্বর্ট স্পেনসর এই নির্দেশটিকে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। (খ) স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা। 'অন্যের জীবনে বাধা হবে না'। কাণ্ট এই বক্তব্যটিকেই লেখেন যে মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে, উপায় হিসেবে নয়। অন্যের জীবনে বাধা হবোনা ধারণা থেকেই নিজের জীবনের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি মমতা তৈরি হয়। কারণ অন্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে আমার স্বাধীন সত্তাও সমর্থিত হচ্ছে। (গ) চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। 'অন্যের চরিত্রকে সর্বদা শ্রদ্ধা করিবে' নির্দেশটি একটি হাঁ-ধর্মী বক্তব্য অর্থাৎ এখানে করণীয়টি বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলা হচ্ছে। সন্ত পল চমৎকার বলেছিলেন যে 'আমার কাছে সব কিছুই আইনী, কিন্তু সমস্ত কিছুই করণীয় নয়'। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রকে সর্বদাই পরিপূর্ণ মূল্য দিতে হয়। তাদের মূল্য দিতে পারলেই নিজেকেও মল্য দেওয়া হয়। যেমন হেগেল বলেন 'Be a person, and respect others as persons'. (ঘ) সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা। এই নির্দেশটি হলো 'তুমি পরস্বাপহরণ করিবে না'। যা কিছুই অন্যের প্রয়োজনে লাগে তাকে নিয়ে নেওয়ার অর্থই হলো তার চরিত্র ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয়ত, অন্যের সম্পদ অপহরণ করে নিজের উপকারের কথা ভাবলে নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বর্জন করা হচ্ছে। (ঙ) সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে সামাজিক শৃঙ্খলা তার বাঁচার প্রধান অবলম্বন। তাই প্রতি ব্যক্তিকেই সতর্ক থাকতে হয় যেনো তার কোনো কর্মে সামাজিক সংহতি নষ্ট না হয়। (চ) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। নির্দেশটি হলো 'মিথ্যা কথা বলিবে না, সদা সত্যকথা বলিবে।' এই নির্দেশটির দুটি অর্থ। একটিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা চলে 'মন-মুখ এক করো', আর একটি হলো, নিজের কথা রক্ষা করতে হয়। এই দুটি ব্যাখ্যার সঙ্গেই ব্যক্তির চরিত্র ও স্বাধীনতার তাৎপর্য জড়িত। কারণ মিথ্যাতে তার আশু লাভ হতে পারে কিন্তু একটা মিথ্যা থেকেই অন্ত অসংখ্য মিথ্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া নিজের কাছেও মিথ্যার পর মিথ্যা এমন অবস্থাতে পৌঁছে দেয় যে নিজের কথাও সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে অর্থাৎ তার চরিত্রের পরিণতি সংশয়াকুল হয়ে ওঠে। (ছ) প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা। এই নির্দেশটি মনীষী কার্লাইনের ভাষায় 'Know what thou canst work at, and work at it, like a Hercules.' এই নির্দেশটির অর্থ হচ্ছে নিজের চেষ্টাতেই মানুষের মুক্তি। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকরই উচিত

তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী কর্ম করা, না করলে সামাজিক প্রগতি ও মঙ্গলের সম্ভাবনা তৈরি হয় না।

৩। কর্তব্যবিরোধ ও বিবেক চিন্তা (Conflict of Duties and Casuistry)

কর্তব্যের তালিকা তৈরি হলেই বোঝা যায় যে কখনো কর্তব্যের বিরোধও উপস্থিত হতে পারে। যেমন ধরা যাক, সন্তানের মৃত্যু সংবাদ মাকে দেওয়া উচিত অথচ দিলেই মার অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে আমি কি করবো? সত্যের খাতিরে সংবাদটি নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। মানবতার খাতিরে দেওয়া উচিত নয়। এমন বিরোধে কর্তব্যের নির্দেশ দেয় 'বিবেকচিন্তা'। বিবেকচিন্তা অর্থাৎ বিবেকী কর্তব্য, যা আমার বিভিন্ন বিরোধী অবস্থায় করা উচিত।

বিবেকচিন্তা কার্যত ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ। ক অবস্থায় আমি কি করবো বা খ অবস্থায় কি করা উচিত। নির্দিষ্ট অবস্থায় যা একমাত্র বিবেকী কর্তব্য তা একটি প্রতিবাদী নির্দেশ। অর্থাৎ ক অবস্থায় জানতাম খ-ই একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু দেখা গেলো গ বর্তমানে খ-র বিরোধী। বিবেক চিন্তা জানালো 'গ' বর্তমানের কর্তব্য।

বিবেক চিন্তা নিয়ম ভাঙার নিয়ম

ফলে আমরা বর্তমানের বিবেকী কর্তব্য যেমন জানতে পারলাম তেমনি বুঝলাম যে বিবেকচিন্তা **নিয়মভাঙার নিয়মকে জানায়**। নির্দিষ্ট নিয়মটি ভেঙে অন্য একটি নির্দেশ তৈরি করাই বিবেকচিন্তার কাজ। এই তত্ত্বটির জন্ম দেন জেসুইটরা। তাঁদের মতে এই তত্ত্বটি হচ্ছে 'cases of conscience' অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিবেকের প্রমাণ।

দার্শনিক গ্রীন কর্তব্যের বিরোধ বলে কিছু মানতে রাজী হননি। ওঁর মতে নির্দিষ্ট অবস্থায় মাত্র একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য থাকে, বিভিন্ন কর্তব্য থাকে না। কাজেই কর্তব্যের বিরোধ শব্দটি অর্থহীন। যেমন, যে লোকটি ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করছে তার হাত থেকে ছুরিটি কেড়ে নেওয়াই একমাত্র কর্তব্য। অবশ্য এমন হতেই পারে যে ঘটনার জটিলতায় কর্তব্যটি অস্পষ্ট। সেক্ষেত্রে ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করে কর্তব্য স্থির করতে হবে। ওঁর মতে 'There is no such thing really as a conflict of duties. A man's duty under any particular set of circumstances is always one, though the condition of the case may be so complicated and obscure as to make it difficult to decide

what the duty really is.' আমাদের কাছে বিভিন্ন কর্তব্যের বিরোধ আছে মনে হয় কারণ আমাদের নৈতিকবোধ দুর্বল। এই দুর্বলতা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট নির্দেশে দূর হতে পারেনা। কারণ সেক্ষেত্রে অনন্ত নির্দেশের প্রয়োজন হবে। আসলে ব্যক্তি বিশেষকেই তার **অন্তর্দৃষ্টিতে কর্তব্য চিনতে হয়।** কোনো নির্দিষ্ট নীতির পাঠ থেকে সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি-হয় মাত্র।

বিবেকচিন্তার বিষয়ে প্রধান আপত্তি এই যে **এই তত্ত্বটি নিয়ম ভাঙতে শেখায়।** নীতিশাস্ত্রে নিয়মের চেয়ে নিয়ম ভাঙার মহত্ত্বটি বেশি স্বীকৃত হলে বিপদ দেখা দেবে। বিবেকচিন্তা অসংখ্য নির্দেশ তৈরি করে নিয়মভাঙার জন্যে, কারণ তার চর্চা নির্দিষ্টক্ষেত্রের কর্তব্য বিষয়ে। ফলে, সাময়িক প্রয়োজনে, আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা নৈতিক সামান্য নীতি বদলে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সাময়িক নির্দেশ গুলিই গ্রহণ করতে থাকবো এবং তখন কোনো সামান্য নীতির অর্থ থাকবেনা।

বিবেকচিন্তায় **নৈতিকতার প্রধান অবলম্বনটিই নষ্ট হয়ে যায়।** নৈতিকতার ভিত্তি ব্যক্তির স্বাধীন সঙ্কল্প ও মনুষ্যত্বের আদর্শ। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে চলতে গেলেই মনুষ্যত্বের সামান্য নীতি প্রয়োজন। এই সামান্য নীতিকে আমরা বলেছি আত্ম-আবিষ্কাব। আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসে যে যেমন খুশি কেবলমাত্র প্রয়োজনটিকেই অনুসরণ করলে যথেচ্ছাচার দেখা দেবে। বিবেকচিন্তা সামান্য নীতির বদলে এই স্বেচ্ছাচারিতাকে বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গেই এ-কথাও মনে রাখতে হয় যে **কর্মের নৈতিকতা আদর্শের সঙ্গে জড়িত। যথোচিত কর্মের সঙ্গে নয়।** যথোচিত কর্মে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় কিন্তু তাতে নৈতিকতা নাও থাকতে পারে। বিবেকচিন্তা যেহেতু নির্দিষ্ট অবস্থার কর্মকে নির্দেশ দেয় সেহেতু বলা চলে যে বিবেকচিন্তা কর্মের নৈতিকতা বিষয়ে তেমন চিন্তিত নয়। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে যথোচিত কর্মের সম্পর্ক-না থাকলে বিবেকচিন্তা আমাদের কোনো সাহায্যই করতে পারবে না।

বিবেকচিন্তা সমস্ত কর্মের নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করে ব্যক্তির স্বাধীন কর্মকে নষ্ট করে। কারণ ব্যক্তি-তখন প্রতিটি সম্ভাব্য কর্মের জন্যই একটি নির্দেশ তৈরি অবস্থায় পায়। তার বিচার বিবেচনা ও সঙ্কল্পের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

বিবেকচিন্তা বিষয়ে দার্শনিকদের প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। ব্র্যাডলী বিবেকচিন্তাকে অস্বীকার করেন আর মূর, র‍্যাশডাল প্রমুখরা সমর্থন করেন।

ব্র্যাডলীর মতে 'Just as Logic has been perverted into the art of reasoning, so Ethics has been perverted into the art of morality. They are twin delusions we shall consign, if we were wise, to a common grave.' ব্র্যাডলীর মতে নীতিশাস্ত্র কোনো রকমেই ব্যবহারিক হতে পারবে না। সুতরাং বিবেকচিন্তা যেহেতু কেবলমাত্র প্রায়োগিক কর্ম-নির্দেশ বিষয়ে চিন্তিত, ব্র্যাডলী এই তত্ত্বটি স্বীকার করেন না। আর মূর বলেন 'Casuistry is the goal of ethical investigation. It cannot be safely attempted at the begining of our studies, but only at the end.' মূরের বক্তব্যের মূল্য এই, যে নীতিশাস্ত্র কর্মের নির্দেশ নিশ্চয়ই দেবে কারণ ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ তার কর্মেই ঘটে। সুতরাং কর্ম-বিচারের মানদণ্ড প্রয়োজন। বিবেকচিন্তা বিভিন্ন কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে আমাদের একটি মানদণ্ড তৈরি করে দেয়।

ব্র্যাডলী বিবেকচিন্তা মানেন না, মূর মানেন

ব্র্যাডলী ও মূরের পার্থক্য থেকে বলা চলে যে ওঁরা দুটি প্রান্তিক বক্তব্য উপস্থিত করছেন। ব্র্যাডলী কর্মের ক্ষেত্রে নির্দেশই মানেন না অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রকে প্রয়োগের বাইরে রাখছেন আর মূর নীতিশাস্ত্রকে কতগুলো নির্দেশের তালিকা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই বিরোধী সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে ওঁদের দুটি বক্তব্যেই সত্য আছে। ব্র্যাডলীর মতকে সমর্থন করে জানানো যায় যে নীতিশাস্ত্র প্রাথমিকভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতির চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করে, কার্যকরী প্রয়োগ বা কর্মবিষয়ে চিন্তা করেনা। অথচ শ্রেষ্ঠ নীতি জানবার পর তাকে জীবনে প্রতিফলিত না করলে মানুষের জ্ঞানের কোনো অর্থই থাকেনা। তাই এক্ষেত্রে আমরা মূরের কথা মানতে বাধ্য। মূরের ত্রুটি এই যে তিনি মৌলিক চিন্তার কথা বলছেন না। কেবলমাত্র বিভিন্ন নির্দেশের কথা বলছেন। কিন্তু বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যে ব্যক্তির চরিত্রের মূল্য ও বিবর্তনকে বোঝা যায় না। আর নির্দেশেরও পরিপূর্ণতা বলতে কিছু নেই যেহেতু মানুষের কর্মের শেষ নেই। তার জন্যে প্রয়োজন কর্মবিচারের মানদণ্ড। অর্থাৎ কোনো মৌলিক নীতি বা বক্তব্য।

আমাদের উদাহরণে সমস্যা ছিলো মাকে সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দেবো কি দেবো না। এখানে বিবেকচিন্তা যে নির্দেশটি জানাবে তা হবে নিছক তৎকালীন প্রয়োজনের বিবেচনা। কিন্তু আমাদের মতে কর্ম বাছাইয়ের

সমস্ত লক্ষ্যটাই মৌল নীতির সঙ্গে জড়িত থাকবে। মাকে সংবাদটি নিশ্চয় দিতে হবে যদি তখনই তা মার আত্মপ্রকাশের পক্ষে অনুকূল হয়। তা না হলেই তখনকার নৈতিক কর্তব্য ভিন্ন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি যে জীবনে কর্মের সূত্রে ব্যতিক্রমের প্রশ্ন ওঠে। যেমন মাকে সত্য সংবাদটি না-দেওয়া।

সত্য কথা বলাটা হলো মূল নিয়ম আর মার জীবনরক্ষার প্রয়োজনে তখনকার অসত্যটুকু ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রমের কোনো অর্থই নেই মুল নিয়মটি ছাড়া। এখানে ব্র্যাডলী মূল নীতির কথা বলেছেন আর মুর ব্যতিক্রমকেই নীতি বলছেন।

বিবেকচিন্তার কথাটা তখনই ওঠে যখন কাণ্টের মতো দার্শনিকরা নৈতিক সূত্রকে এমন বাধ্যতামূলক পর্যায়ে আনেন যে তার অনিবার্যতা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। অর্থাৎ নৈতিক সূত্রের বাধ্যবাধকতা কোনো রকম পরিবর্তন বা ব্যতিক্রমকে মানতে রাজী হয় না। অথচ প্রত্যক্ষ জীবনে আমরা সর্বদাই দেখছি যে হুবহু কোনো তত্ত্ব মেলেনা, কর্মের সূত্রে তার ব্যবহারে নানা রূপান্তর ঘটে। প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই দার্শনিকরা জানান যে নৈতিক সূত্রের অনিবার্যতা ও বাধ্য-বাধকতাকে বিবেকচিন্তা অনেক সুসহ ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। কারণ বিবেকচিন্তা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগের অর্থ বোঝে এবং প্রয়োগের প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ব্যবস্থা শেখায়।

হেনরী সিজউইক ও ডান র‍্যাশডাল এ-বিষয়ে একটি চমৎকার তর্ক করেছিলেন। বিবেকচিন্তার ক্ষেত্রে দুটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন থাকে। (ক) নৈতিকতত্ত্ব থেকে কি প্রতিটি বিশিষ্ট কর্তব্যকে জানা যায়? (খ) প্রতিটি মৌল তত্ত্বের সীমা কতটুকু? সাধারণ ভাবেই আমরা জানি যে যে-কোনো ব্যক্তির যে কোনো প্রশ্নই নৈতিক তত্ত্ব থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তের কর্তব্যে তাকে খুঁজে নিতে হয়। নীতিশাস্ত্র বড়ো জোর বলতে পারে যে মহত্তম সুখ বা আত্মসচেতন প্রকাশই জীবনের লক্ষ্য।

কোন্ পথে সুখ আসবে সেটাই প্রশ্ন

কিন্তু কোন পথে এই সুখ আসবে তা যার যার চচার বিষয়। আর দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব যদি জানাও থাকে তবু তত্ত্বের সীমা ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনের বাইরে নয়। মানুষ তার ব্যবহারের সঙ্গে মিলিয়েই তার স্বাধীনতা, সত্য ইত্যাদিকে বুঝতে চেষ্টা করে এবং দেখে এই প্রত্যয়গুলি প্রতিনিয়ত সামাজিক

জীবনযাত্রায় নানাভাবে সীমাবদ্ধ ব্যবহারিক রূপ পাচ্ছে। সিজউইক এ-প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন যে ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ অন্যায়। ডীন র‍্যাশডালের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান যে 'চর্চ অব ইংলণ্ডে' ধর্মযাজক হিসেবে র‍্যাশডালকে অনেক অসত্য ভাষণ করতে হয়। কারণ ওই গীর্জার অনেক বিশ্বাস যুক্তি বিচারের কথা শুনতে রাজী নয়। যেমন র‍্যাশডাল বাইবেল কথিত যীশুর জন্মকে মানতেন না বা ঈশ্বরকে সর্ব শক্তিমান মনে করতেন না অথচ এই অসত্যের কথা জেনেও তিনি ওই গীর্জা ত্যাগ করেন নি যেমন সিজউইক ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ র‍্যাশডাল নিজেই অসত্যের সমর্থক হয়ে গেছেন।

সিজউইকের জবাবে র‍্যাশডাল লেখেন যে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শব্দাবলী সর্বদাই আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। শুধু মাত্র নৈতিকভাবে জটিল অবস্থাতেই নয়, সাধারণ শিষ্টাচারের ক্ষেত্রেও এমন সব কথা বলতে হয় যা কেউ মনে মনে বিশ্বাস করে না। যেমন অত্যন্ত অভদ্র লোককে চিঠি লিখলেও 'প্রিয় মহাশয়' বা 'প্রীতিভাজনেষু' লিখতে হয়। আমার মনে বিনয় না থাকলেও সম্বোধন করি 'সবিনয় নিবেদন' বলে। সুতরাং অবস্থা বিশেষের ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গ্রহণ করতে হয় এবং তাই হলো নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য।

র‍্যাশডালের এই বক্তব্য অনুযায়ী ধরতে হবে যে নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য বিবেকচিন্তার সংবিধান। কিন্তু নীতিশাস্ত্র একটি শাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র নৈতিকতার মূল চরিত্র ও দার্শনিকতা বিষয়ে চর্চা করে. বিশেষ অবস্থায় বিশেষ নীতির কথা বলে না। তাছাড়া বিশেষ নীতির কথা উঠলে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সমাজ ও মানুষের এমন অসংখ্য সব নীতি তৈরি হবে যে তা কখনোই তালিকাবদ্ধ করা যাবে না ও নীতি তত্ত্বের কোনো সামান্য সিদ্ধান্ত বা প্রত্যয় গড়া যাবে না। অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র বলতে কোনো শাস্ত্রই সম্ভব হবেনা। অথচ নীতিশাস্ত্রের মৌল তত্ত্ব না জানলে কোনো একটি বিশেষ নীতির চরিত্র কি ভাবে জানা যাবে? কখনোই তা জানা যাবে না। বিভিন্ন কর্মে আমরা নিজেদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে পারবো কিন্তু কর্মের উচিত অনুচিত বিষয়ে অন্ধ থাকবো। কাজেই নীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব আমাদের জানতেই হয়। তেমনি তত্ত্বকে ব্যবহারিক কর্মে প্রয়োগের সময় তার সীমাবদ্ধতা ও পরিবর্তনের স্বরূপটিও জানতে হয়। আমাদের তত্ত্ব ও ব্যতিক্রম তাই সমস্যাটির দার্শনিক সমাধানের ইঙ্গিত দেয়।

আমাদের সিদ্ধান্তে তাই নীতিকে মেনে তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সম্পর্কিত করতে পারলেই বিবেকচিন্তা ও কর্তব্যধিয়োধের সমস্যা মেটে।

৪। কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ—

কর্তব্যের আলোচনায় আমরা দুটি সিদ্ধান্ত করেছি। প্রথমত, একধরণের কর্তব্য নির্দেশমূলক, যা আইনের মারফৎ পরিচালিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, নিজস্ব বিবেচনার বিষয়। এই বক্তব্য অনুযায়ী কর্তব্যের একটি শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। একটিকে বলা যায় **নির্দিষ্ট** ও অন্যটি **অনির্দিষ্ট**। নির্দিষ্ট কর্তব্য হচ্ছে নির্দিষ্ট নির্দেশ, যা আমাদের স্পষ্ট জানা আছে এবং যা না জানলে আইন আমাদের মানিয়ে নেবে, আমরা জেনে শুনেই তা রক্ষা করি বা না করি। যেমন ধরা যাক, চুক্তি বা কথা দিয়ে কথা রাখার দায়। চুক্তির ক্ষেত্রে জানি যে তা আইনের সীমায় পড়ছে। চুক্তি রক্ষার কর্তব্য ভঙ্গ হলে আদালত তার দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু কথা দিয়ে কথা রক্ষার দায় নিজের কাছেই। এই কর্তব্যের বোঝাপড়া সম্পূর্ণ নিজস্ব বিচার বিবেচনার বিষয়। কারণ কেউ তার জন্যে আমাকে শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু কার্যত আমরা জানি এই কর্তব্য দুটির পেছনে সমাজ উপস্থিত থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে তৎকালীন ফলাফল অস্পষ্ট থাকলেও সামাজিক ক্ষতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। আমি কথা রক্ষা না করলে ক্রমশ অন্যরাও আমার সঙ্গে কথা রক্ষার দায়িত্ব নেবে না।

অনির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পূর্ণই আমাদের নিজস্ব বিবেচনার বিষয়। কারণ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে নৈতিক কর্তব্যটি বিষয়ে কোনো নির্দেশ নেই, সেখানে নিজের বিচার বিবেচনাই একমাত্র সম্বল। আমার সামনে দুর্ঘটনা ঘটলে আহত ব্যক্তিটিকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাবো কি যাবো না আমাকে ভেবে স্থির করতে হবে।

কর্তব্য অন্যভাবেও ভাগ করা যায়। এই ভাগে তিনটি ক্ষেত্র আছে। (ক) আত্মকর্তব্য, (খ) পরকর্তব্য ও (গ) আধ্যাত্মিক বা ঈশ্বর সম্পর্কিত কর্তব্য।

আত্ম-কর্তব্য (Duties to self)—নীতিশাস্ত্রের বিচারে নৈতিকতা থাকে কর্মে। কর্ম নানা জাতের। কিছু কর্ম সম্পূর্ণ আত্মগত অর্থাৎ সম্পূর্ণই নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপার। আর বাকি সব কর্ম সামাজিক অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। নিজের প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব সমধিক যেহেতু কর্মের লক্ষ্যই আত্মপ্রকাশ করা। এই কর্তব্যের তালিকায় আছে (ক) দৈহিক, (খ) অর্থ-নৈতিক, (গ) সাংস্কৃতিক ও (ঘ) নৈতিক কর্তব্য। দৈহিক কর্তব্য

আত্মকর্তব্য বাঁচাও ভালোভাবে বাঁচা

বাঁচামরার সঙ্গে জড়িত। নৈতিককর্মের জন্যই নীরোগ ও সুস্থ দেহের প্রয়োজন। ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন বলা হতো, শরীর সুস্থ রেখেই ধর্মের সাধনা করতে হয়। কারণ দেহের কেন্দ্রেই চৈতন্যের স্থিতি এবং দেহধারী মানুষ ছাড়া নৈতিক কর্মের কোনো ক্ষেত্র নেই। অর্থনৈতিক কর্তব্য এই বাঁচামরার সূত্রেই আসছে। অর্থনীতি জীবন সংগঠন করে। জীবন সংগঠিত না হলে কর্মের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। নিছক বাঁচার পর অন্য কর্তব্য তৈরি হয়। এরিস্টটল যেমন বলেছেন শুধু বাঁচাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়, ভালোভাবে বাঁচার জন্যে সাংস্কৃতিক নৈতিক কর্তব্য থাকে। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক কর্মেই মনুষ্যত্বের ছাপ পড়তে থাকে কারণ তখনকার মূল কথাই হচ্ছে **বাছাই** এবং **রুচি অনুযায়ী বাছাই**। রুচিতেই মনুষ্যত্বের ক্রম-বিবর্তিত চরিত্রের ছাপ পড়তে থাকে। আসলে আত্মশুদ্ধি ও শ্রেয়বোধের জন্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার সর্বপ্রধান প্রস্তুতি ও পরীক্ষা ঘটে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করায়। নিজের প্রতি কর্তব্যে এই নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ ঘটে।

পর কর্তব্য (Duties to others)—নিজের মঙ্গলের ভাবনা থেকেই অন্যদের মঙ্গলামঙ্গলের কথা আসে। কারণ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষ সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। কোনো একটি কর্ম এমন অসংখ্য কর্মের সূত্রপাত করে যে তারই বন্ধনের অদৃশ্য জালে কম বেশি সবাই গ্রথিত থাকে।

নিজের সঙ্গেই অন্যব্যক্তি জড়িত

পর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে (ক) পরিবারের প্রতি কর্তব্য (খ) দেশের প্রতি কর্তব্য, (গ) মানুষের প্রতি কর্তব্য, (ঘ) প্রাণীজগতের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি।

ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য (Duties to God)—বস্তুবাদী দার্শনিকরা কর্তব্য স্বীকার করেন না। তারা একমাত্র মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যের কথাই বলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মতে মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কিত কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্তব্যে থাকে বিশ্বজগতে প্রবহমান চৈতন্যধারার বোধ ও বিশ্বাসের আত্মসমর্পন। আত্ম সম্পর্কেই একমাত্র নিজের দীর্ঘ জীবনের সার্থকতা। কারণ মানুষকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন সংসারের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদার মধ্যে ঈশ্বরের জন্যও একটু কাঁদতে হয়।

৫। ধর্ম (Virtue)—ইংরেজি 'ভার্চু' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন 'ভির্' শব্দটি থেকে। ল্যাটিনে শব্দটির অর্থ পুরুষত্ব বা শৌর্য। গ্রীক ভাষায় বলা হতো 'এরেটে'। সংস্কৃত ও বাঙলায় আমরা বলি 'ধর্ম'। এই 'ধর্ম' শব্দটির সঙ্গে

ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনো যোগ নেই। ধর্মের অর্থ-যা বিশিষ্ট বস্তু, দ্রব্য বা জীবের অন্তর্নিহিত মৌলিক গুণ। মানুষের ধর্ম বলতে তাই মনুষ্যত্ব প্রকাশক গুণকে বোঝায়। ধর্ম আসলে তাই মানুষের ক্ষেত্রে তার চরিত্রের নিজস্বতা বা বিশিষ্ট প্রকাশ

মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব

এই ধর্ম স্বতই অর্থাৎ আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। জলের ধর্ম যেমন সমুচ্চশীলতা বা নিম্নতলে গড়িয়ে যাওয়া। অনুকূল অবস্থাতেই তা প্রকাশ পাবে। মানুষেরও তেমনি অনুকূল পরিবেশেই তার ধর্ম (অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পরিচয়) প্রকাশিত হয়। কর্তব্যের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য আছে। কর্তব্য কর্মের নির্দেশক, যেমন আমরা বলি, এই কাজটা করা উচিত বা উচিত নয়। কিন্তু ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত; তার স্বভাবে, আচরণে ও কর্মে ধর্ম আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে। যেমন দুর্জনের ধর্ম তার স্বভাব ও কর্মে পরিস্ফুট বা সৎব্যক্তি সর্বত্রই তার সততার ছাপ পেলেন। সুতরাং কর্তব্যের সঙ্গে নির্দেশের যোগ আর ধর্মের সঙ্গে স্বাধীন সঙ্কল্পজাত কর্মের।

মনুষ্যত্বের ধর্ম বললেই একটা প্রশ্ন ওঠে যে মানুষ বলতে স্থির, নির্দিষ্ট কোনো কিছু পৃথিবীতে আছে কি? অর্থাৎ জানতে চাওয়া যায়, পরিবর্তনশীল বিশেষ মানুষের কোনো একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে কি? বিভিন্ন দেশে কালে বিভক্ত মানুষ নানাভাবে তার প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। কিন্তু আমরা কি তার চরিত্রের বা ধর্মের কোনো ঐক্যরূপ স্থির করতে পারি? বহু

মানুষের নির্দিষ্ট রূপ আছে কি?

দার্শনিকের মতে মনুষ্যত্বের কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম স্থির করা যায় না। কারণ মনুষ্যত্ব ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়। ইতিহাসের বিবর্তনে তার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। আবার প্রতিপক্ষ দার্শনিকরা বলেন যে মনুষ্যত্বের একটি সামান্য সংজ্ঞা সম্ভব। কারণ মনুষ্যত্বের সামান্য সংজ্ঞা ও ধর্ম ব্যতিরেকে মানুষ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার বস্তু মাত্র, তার সম্পর্কে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বক্তব্য ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার বিষয় হলে আমরা কোনো একটি লোক সম্পর্কে নানা ধরণের কথা বলতে পারি। কেউ ক সময়ে খ করেছেন', 'গ খুশিতে ঙ করেছে', 'চ হঠাৎ ছ নাচ নেচেছে'। এখানে প্রত্যেকটিই আলাদা কাজ এবং যে করছে তাকে একটি নির্দিষ্ট লোক বলে ধরা যাবে না। এমন কি 'নাচ' ইত্যাদি কোনো সামান্য শব্দও ব্যবহার করতে পারবোনা কারণ অভিজ্ঞতার কোনো ঐক্যরূপ বা সামান্যধর্ম পাওয়া যায় না। এমন কি যার

অভিজ্ঞতা হচ্ছে তারও কোনো স্থিরতা থাকে না। অথচ মানুষকে সর্বদাই সমগ্রভাবে দেখবার থাকে এবং সমগ্র ধারণা ছাড়া মানুষের বিষয়ে কোনো কিছুই ধারণা করা যায় না।

এরিস্টটল লিখেছেন 'Virtue is a permanent state of mind, formed with the concurrence of the will and based upon an ideal will of what is best in actual life—an ideal fired by reeson.' এরিস্টটল সংজ্ঞায় স্পষ্টই নির্দেশ দিচ্ছেন যে ধর্ম মনের একটি স্থায়ী অবস্থা যাকে যুক্তির দ্বারা স্থির করা যায়। নৈতিক নিয়মের সঙ্গে মিলিয়েই ধর্মের পরিচয়। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে মানুষের ধর্ম বা মনুষ্যত্ব নৈতিক কর্মেই প্রকাশিত হয়, যেহেতু নৈতিক কর্মেই মানুষ একমাত্র সচেতনভাবে স্বাধীন সঙ্কল্প অনুযায়ী আচরণ করে। স্বাধীন আচরণেই তার স্বকীয়তার প্রকাশ। প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই তার উদ্দেশ্যকে সজ্ঞানে অনুসরণ করতে পারে, কারণ মানুষ প্রকৃতির নিয়মের অধীন নয় এবং শুভকর্মেই তার পরিণতির সম্ভাবনা নির্দিষ্ট। সৎ এবং শুভ কর্মের জগতে অধিষ্ঠিত থাকাই মানুষের ধর্ম।

সুতরাং ধর্মের সঙ্গে সামাজিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এরিস্টটল ধর্মকে এ কারণেই সঙ্কল্পজাত ইচ্ছার সচেতন প্রকাশ মনে করেন এবং এই প্রকাশ তার চরিত্র ও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হলেই তবে ধর্মের পরিপূর্ণতা। কারণ তখনই একমাত্র ব্যক্তি নিজে যা তা প্রকাশ করতে পারবে। এরিস্টটলের সংজ্ঞা থেকে আমরা ধর্মের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারি। (ক) ধর্ম চরিত্রের মৌলিক গুণ যা মানসিকতায় প্রকাশ পায় ও (খ) ধর্ম এই প্রবণতা অনুযায়ী প্রকৃষ্ট কর্ম। নৈতিকতার সার্থক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারেন বলেই এরিস্টটল সঠিক বলেন যে ধর্ম কেবলমাত্র নির্দিষ্ট একটি স্থিতিশীল মানসিকতাই নয়, প্রতি দিনকার কর্মেই তার পরীক্ষা। কর্মের কষ্টিপাথরে মানসিকতা নিজের বৈশিষ্ট্যকে যাচাই করে।

এরিস্টটল : ধর্ম প্রকৃষ্ট কর্ম

কিন্তু যাদের মতে মনুষ্যত্বের সামান্য ধারণা নেই তাঁরা বলেন যে মনুষ্যত্বের স্থির প্রত্যয় ছাড়াও প্রতিটি কর্মের তাৎপর্য বোঝা যায়। কারণ, সামাজিক মানুষকে তার সামাজিক ভারসাম্যটি রক্ষা করতে হয় সুতরাং পারস্পরিক প্রয়োজনেই তারা তৎকালীন একটি বৈশিষ্ট্য তৈরি করে যা প্রতিটি মানুষ কমবেশি স্বীকার করে। কাজেই মনুষ্যত্ব নামক অন্তর্নিহিত প্রত্যয় ছাড়াও

মানুষকে চেনা যায় এবং সামাজিক বিভিন্ন প্রত্যয় দ্বারা তার কর্মের ভালোমন্দ বিচার করা যায়।

কিন্তু এই মতটির দুর্বলতা মানুষকে অংশত খণ্ড খণ্ড করে দেখায়। সভ্যতার সূত্রপাতেই মানুষ তার স্বাধীন সচেতন কর্মে কয়েকটি মৌল বৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে।

৬। ধর্ম ও কর্তব্য (**Virtue and Duty**)

ধর্ম মানুষের মৌলিক সত্তার পরিচায়ক। অন্তর্নিহিত বৃত্তি মানুষের কর্মে প্রকাশিত হয়। কর্মের চারিত্র নির্ভর করে জীবনের মৌলিক লক্ষ্য ও গতির ওপর। মানুষের প্রথম পরিচয় আমরা বলি মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব বা মনুষ্য-ধর্ম তাকে নিম্ন প্রাণীজগত থেকে তফাৎ করেছে। প্রাথমিকভাবে তার মনুষ্যধর্মে

কর্মের চরিত্র নির্ভর করে জীবনের লক্ষ্য ও গতির ওপর

নিশ্চয়ই প্রকৃতির ছাপ থাকে কারণ মানুষ প্রকৃতির নিয়মের বাইরে যেতে পারেনা। প্রকৃতির নিয়ম নিম্ন প্রাণীজগতেও কার্যকরী। প্রকৃতির নিয়মে মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। মানুষ তার সত্তার ছাপ ফেলে স্বাধীন কর্মে অর্থাৎ যখন সে প্রকৃতির নিয়মকে নিজের মতো ব্যবহার করতে থাকে। নিজের মতো ব্যবহারের সূত্রপাত হয় তার কল্পনায়। কল্পনায় থাকে তার অগ্রগমনের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য প্রকাশিত হয় ইচ্ছামূলক কর্মে। মানুষের কর্ম সর্বদাই স্বাধীন। কারণ সে নিজের কর্মকে সঙ্কল্প অনুযায়ী বাছাই করে। বাছাইয়ে তার বিবেচনা, বোধ ও সংযমের ছাপ থাকে। কারণ তার কাছে একটিই লক্ষ্য জীবনের। তাকে পরিপূর্ণ হতে হবে। পূর্ণতার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তাকে কেউ দেয়নি। একটি কল্পনা বা লক্ষ্যেই সে চলে। কল্পনা বা লক্ষ্য তৈরি হয় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের মাপে নিজের আগামী সম্ভাবনাকে গড়ে। তাই বলা হয় সে অমৃতের পুত্র এবং তার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অনন্ত।

এই হয়ে ওঠা বা পূর্ণ পরিণতির পরিচয় প্রকাশিত হয় তার দৈনন্দিন কর্মে। কারণ হয়ে ওঠাতে স্থাণুতার স্থান নেই। কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে মানুষ পূর্ণ নয় অথচ প্রতিমুহূর্তেই তার পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। তাই তার কর্মের শেষ নেই এবং একটি কর্ম থেকে আরো অসংখ্য কর্মের মধ্যে সে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হতে থাকে। এই নিরন্তর কর্মপ্রবাহে কেউ মনুষ্যত্বের দিকে এগোয়, কেউ এগোয় না। যে পরিণতির আদর্শ জানে ও সেই আদর্শ অনুযায়ী কর্ম করে, তারই জীবনে পরিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা। অথচ যে নিছক

জীবন প্রবাহে গা ভাসায় কিন্তু সচেতন সঙ্কল্প ও লক্ষ্য অনুযায়ী চলতে চায় না অর্থাৎ যে সচেতন বোধে কর্মে প্রবৃত্ত হয়না, সে মনুষ্যত্বে পৌঁছোতে পারেনা।

হয়ে ওঠার সচেতন কর্মেই কর্তব্যের প্রসঙ্গ থাকে। কর্তব্য তার আত্মপ্রকাশের, কর্তব্য তার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার। কাজেই প্রতিটি কর্মকেই কর্তব্য বিষয়ে অবহিত থাকতে হয়, যেমন কর্তব্যকে কর্মে প্রকাশিত করতে হয়। কর্তব্য ও ধর্ম একই সঙ্গে তাই আত্মগত ও পরগত। আত্মগত কর্মে কর্তব্য কেবল নিজের প্রতি আর পরগত কর্মে অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি। মনু যেমন ধর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করে বলেছেন 'সাধারণ ধর্ম' ও 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। কিন্তু আত্মগত ও পরগত এই বিভাগটিতে কর্তব্য ও ধর্মকে যদিও কর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তবু একটি মারাত্মক ত্রুটি আছে। ধর্ম ও কর্তব্যের নিছক কোনো ব্যক্তিগত ও পরগত দিক নেই। কারণ ব্যক্তি সামাজিক জীব এবং সমাজই তার মহত্তম মঙ্গলের ধারক। ব্যক্তির শ্রেয়বোধ ও প্রেয়বোধ সর্বদাই সামাজিক শ্রেয় ও প্রেয় বোধের দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তির কর্তব্যে একটিই উল্লেখযোগ্য কথা থাকে যে কর্ম সর্বদাই ব্যক্তিগত। অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি একা। সে তার নিজের মতো নিজেকে কর্মে প্রকাশ করে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তার পেছনে সামাজিক কর্তব্যের ধারণা লুকিয়ে থাকে।

হয়ে ওঠার সচেতন কর্মেই কর্তব্য

কর্তব্য যদিও সামাজিক এবং ব্যক্তির কর্ম সামাজিক ধর্মেরই প্রকাশ তবু ব্যক্তির কর্তব্য কোনো বাহ্য নির্দেশে পরিচালিত নয়। সে তার নিজস্ব আবেগ ও বোধেই কর্তব্য স্থির করে এবং কর্মে-প্রবৃত্ত হয়। কারণ, বাধ্যবাধকতায় ও জবরদস্তিতে নৈতিক আচরণের চরিত্রই নষ্ট হয়। নৈতিক কর্তব্য তাই বাহ্য সংগঠনের নির্দেশ নয়, তার বিবেকের নির্দেশ। এই নির্দেশ সে গ্রহণ করতে পারে আবার নাও পারে। কিন্তু তার আত্মপ্রকাশের পথ বিবেকের নির্দেশেই একমাত্র পরিচালিত হবে। ব্যক্তির কর্ম তাই তার নিজের কাছে। সমাজের জন্য বা অন্য কারো জন্যে নয়। তৎসত্ত্বেও আমরা বলি যে ব্যক্তির পরগত কর্তব্য আছে। বক্তব্যটির অর্থ তখন এই যে, প্রতিটি ব্যক্তিই যদি নিজের প্রতিটি কর্ম নিষ্কামভাবে করতে শেখে তবে কারো অনিষ্টের কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যক্তির বিবেচনায় নানাবিধ গোলোযোগ থাকতে পারে বা কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে পারে। তাই সামাজিক বিবেকের নির্দেশ হিসেবে কিছু

কর্তব্য বাহ্য নির্দেশে চলে না

পরগত কর্তব্যের নির্দেশ থাকে। যদিও আত্মগত কর্তব্য ও পরগত কর্তব্যে কোনো মৌল তফাৎ নেই।

কর্তব্যের নিষ্ঠাতে মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকে কারণ কর্তব্য ধর্মের প্রেরণাতেই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়।

৭। **ধর্ম ও সমাজ (Virtue & Society)**

জ্ঞানী সক্রাটেস বলেছিলেন 'ধর্মই জ্ঞান'। সক্রাটেসের মনে হয়েছিলো মানুষ জ্ঞানত অন্যায় করেনা। সুতরাং একবার সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারলেই তারা সৎপথে চলবে। ন্যায়-অন্যায়ের চরিত্র জ্ঞানেই প্রতিভাত হবে। কাজেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির চর্চায় জ্ঞানকে জনসাধারণের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

সক্রাটেস : ধর্মই জ্ঞান

সক্রাটেসের বক্তব্যকে এরিস্টটল গ্রীক সামাজিক পরিবেশে ব্যাখ্যা করে জানান যে তা একটি মধ্যপন্থা। মধ্যপন্থার কথা তিনি বলেন কারণ অন্য দুটি পথ ওঁর মতে সর্বদাই প্রান্তিক। আর যা কিছুই প্রান্তিক তাই নিতান্ত বাড়াবাড়ি। সমাজের ভারসাম্য প্রান্তিক পথে চললে বিচ্যুত হয়। তাই মধ্যপন্থায় ব্যক্তিগত কর্ম ও সামাজিক কর্মকে মেলাবার চেষ্টা তিনি করেন। ওঁর মতে 'Virtue is a habit of choice, the character of which lies in moderation or observance of the **mean** relative to the abilities and circumstances of the each person, as determined by reason. ....And it is a moderation ; firstly, in as much as it, comes in the middle or **mean** between two vices, one on the side of excess, the other on the side of defect' ; প্রান্তিক সীমার একদিকে থাকে বাড়াবাড়ি ও অন্যদিকে ত্রুটি। ব্যক্তিকে এই দুটিই বর্জন করে মধ্যপথে চলতে হবে।

গ্রীক চিন্তায় যুক্তির ওপর অত্যধিক আস্থা থাকায় সক্রাটেস এবং তাঁর শিষ্যরা আবেগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। যুরোপে খৃষ্টধর্ম আবেগকে প্রতিষ্ঠা করে এবং জানায় যে মানুষ যুক্তিতে জানলেও আবেগেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ধর্মের প্রকাশ যুক্তি ও কর্মের সংমিশ্রণেই ঘটবে। যুক্তি ও আবেগের প্রকাশ কর্মে এবং কর্ম সর্বদাই সামাজিক পরিবেশে সংঘটিত হয়। সুতরাং ধর্মের পরীক্ষা কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব কর্মেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক কর্মেও তার প্রকাশ।

সামাজিক কর্মে ব্যক্তির ধর্মের বিষয়ে জর্মান দার্শনিক হেগেল বলেন যে ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিকে তাই সমাজের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। সমাজ ব্যক্তির পরিপূর্ণতার আদর্শকে তৈরি করে এবং ব্যক্তি সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজের কর্মকে সংগঠিত করে। ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলী হেগেলীয় এই প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করে দেখান যে ব্যক্তি তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী কর্ম করলেই একদিকে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে ও অন্যদিকে সামাজিক আদর্শ সার্থক হবে। ওঁর মতে অবস্থানের সঙ্গেই ব্যক্তির ভূমিকা জড়িত এবং ব্যক্তি এককভাবে কোনো কাজই করতে পারেনা। তার ধর্ম ও সততার অর্থ প্রতিমুহূর্তেই সমগ্র সমাজের ধর্ম ও সততা। গ্রীন যেমন লিখেছেন 'They are all determined by relation to social wellbeing (which is included in the supreme good) as their final cause, and they all rest on a dominant interest in some form or other of that wellbeing.' কারণ ব্যক্তি এককভাবে কখনোই ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেনা। শুধু বাঁচাই নয়, ভালোভাবে বাঁচবার জন্যেই তার একটি সহযোগী পৃথিবীর দরকার করে। **এই সহযোগী পৃথিবীটিই সমাজ** যেখানে সবার মঙ্গলের আদর্শই প্রস্তুত থাকে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রেও একই ভাবে বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি ও সমাজে কোনো বিরোধ নেই। ব্যক্তিকেও যেমন চারটি অপবর্গ লাভ করতে হয় তেমনি সমাজকে একই রকমে ক্রমশ উদ্বর্তিত হতে হয়। যেহেতু সৎ সমাজেই একমাত্র সৎ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং নিজস্ব কর্মে যেমন তার ধর্মের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তেমনি সমাজ তার ধর্মীয় পরিবেশে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল জানায় বা শ্রেয়বোধের পরিমণ্ডল জোগায়।

হেগেল ও ব্র্যাডলি : ব্যক্তি সমাজেই পূর্ণ হয়

৮। ধর্মের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Virtues)

ব্যক্তি ও সমাজে যেহেতু বিরোধ নেই ব্যক্তির কর্মেই ব্যক্তিগত ধর্ম ও সামাজিক ধর্মের প্রকাশ ঘটবে। ব্যক্তি তার ধর্মকে প্রকাশ করে দুভাবে। (ক) আত্মগত ধর্ম ও (খ) পরগত ধর্মের কর্তব্যে।

আত্মগত ধর্মের মধ্যে আমরা খোঁজ করি সাহসিকতা, সংযম ও শ্রমশীলতা আর পরগত ধর্মে দেখি ন্যায়পরায়ণতা ও পরহিতৈষণা।

ধর্মকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের নীতি হলো

কর্তব্যের লক্ষ্য। অর্থাৎ কার প্রতি নজর রেখে ধর্মের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যদি ধর্মাচরণের লক্ষ্য ব্যক্তি নিজেই হয় তবে তাকে বলা হয় আত্মগত (self-regarding) লক্ষ্য, অন্য ব্যক্তিরা হলে বলা হয় পরগত (other-regarding) ও নিছক আদর্শ লক্ষ্য হলে তাকে বলা হয় আদর্শগত (Ideal-regarding)। এই বিভাগটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমাজে কর্মরত ব্যক্তিকে এই তিনটি লক্ষ্যকেই জানতে হয়। সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে যতো কাজ করা হয় তা এই তিনটির যে-কোনো একটিতে পড়বেই পড়বে, যেহেতু কর্মের প্রাথমিক কেন্দ্র ব্যক্তি নিজে অর্থাৎ যিনি কাজটি করেন। কর্মের সূত্রে অন্য ব্যক্তিরা তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় সুতরাং অন্যদের সহযোগিতা ব্যতীত ব্যক্তি চলতেই পারে না। ব্যক্তি নিঃসীম শূন্যে বসবাস করেনা, তার ব্যক্তিত্বের মৌল উপাদানই হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক। অস্তিত্বের জন্যেই ব্যক্তিরা সমাজে অন্য ব্যক্তিদেরও স্বীকার করতে বাধ্য। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের চারপাশে থাকে আদর্শের ও কল্পনার পরিমণ্ডল। মানুষের মনুষ্যত্ব যেহেতু ক্রম-বিবর্তিত কর্মের ওপর নির্ভরশীল, মানুষ নিজের সম্ভাবনার মাপে কর্মের উদ্দেশ্য গড়ে। কল্পনার মধ্যে নিহিত থাকে সেই স্বপ্ন যা সে হবে, যা সে হতে পারে এবং যা তার হওয়া উচিত। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনায় দেখেছি যে মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাৎ হয় সচেতন উদ্দেশ্যমূলক কর্মে। মানুষ কেবলমাত্র সাহজিক বা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার নিয়মে চলে না, সে প্রতি কর্মেই তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তার সাহায্যে চলে। নিছক মনস্তাত্ত্বিক-প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণের ওপর সে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকে তৈরি করে। যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রাকৃতিক কারণেই জীবনে সত্য কিন্তু মানুষ যেমন তেমন ভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার কথা ভাবেনা, তাকেও নিজের কল্পনায় রূপ দেয়। যে পাত্রে পানাহার করে সেই পাত্রটি সুন্দর করে গড়ে, ছবি আঁকে ও নক্সা তৈরি করে। ভোজ্য বস্তুকে রন্ধন কৌশলে লোভনীয় করে তোলে। বাঁচার চেষ্টাতেই যদি মানুষ এমনভাবে ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলে তবে সামাজিক কর্মে তার সামাজিক স্বাধীন মন তো কাজ করবেই করবে।

আত্মগত, পরগত ও আদর্শগত কর্ম

ব্যক্তির সামাজিক মন যুগসঞ্চিত ধারণা ও আদর্শকে ধরে রাখে। একটি ব্যক্তির কল্পনায় নিহিত মূল্যকে পরবর্তী কালের জন্য জমা করে ও বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই কল্পনা তার বাঁচবার প্রেরণা হয়, সেই প্রেরণায় মানুষ নিজের বৃহত্তর মাপের পরিচয় পায়। যেমন সমাজে মানুষের সত্য, শিব ও

সুন্দরের কল্পনা। কম বেশি প্রতিটি ব্যক্তিতেই এই কল্পনা সুপ্ত থাকে এবং অধিকার ও সামর্থ্যভেদে বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্ট এক একটি সমাজেও তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি বা সমাজ নেই যেখানে সত্য, শিব ও সুন্দরের পরিচয় মেলে না। এমন কি দশহাজার বছর আগেও মানুষ, বর্তমানের সুসভ্য জীবনযাত্রা ব্যতিরেকেও, গুহাচিত্রে, উৎপাদন যন্ত্রে ও জীবনযাত্রার উপকরণে তার সত্য, শিব ও সুন্দরের বোধকে পরিস্ফুট করে রেখেছে। আলটামিরার গুহাচিত্র তার অত্যাশ্চর্য প্রমাণ। মহেনজদড়োর খেলনা ও পাত্র তার প্রমাণ। কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে একটি ব্যক্তির প্রাথমিক কর্ম থেকে আমরা পাই অন্যান্য ব্যক্তির কর্ম এবং সবার কর্ম থেকে সমাজের আদর্শ কল্পনা ও লক্ষ্য।

সামাজিক মন যুগসঞ্চিত ধারণাকে ধরে রাখে

আত্মগত কর্ম—(ক) সাহস বা বীর্য—মানুষকে শুধু কর্মই করতে হয়না, কর্মের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়। বাধ্য হয়ে কর্ম বা নিছক অভ্যাসের কর্মই নয়, সচেতনভাবে দুঃখ সুখকে দূরে ঠেলে আত্মপ্রকাশের অনুকূল কর্মকে গড়তে হয়। তার জন্য প্রয়োজন সাহস ও বীর্য। কারণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষ মানুষ হয়।

(খ) সংযম—ব্যক্তির 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি' সর্বদাই পারস্পরিক অধিকারের জন্য মনে সংগ্রাম করে। সংযমের শিক্ষায় ব্যক্তি তার হীনতা বর্জন করে নির্মোহ নির্লোভ হতে পারে। এরিস্টটল যাকে বলেন মধ্যপন্থা তা সংযমেই একমাত্র লাভ করা যায়। ভারতীয় ঋষিরা তাই ব্রহ্মচর্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্যের শিক্ষাই হলো নিজ অধিকার বুঝবার শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা অনুযায়ী কর্মের মাত্রা খুঁজে পাওয়া। যা খুশি করা নয়, যেমন খুশি গা ভাসানো নয়, আত্মপ্রকাশের জন্য শম দম তিতিক্ষার শিক্ষা। উপনিষদে প্রজাপতি ব্রহ্মা যে-কারণে দেবতা, দানব ও মানুষকে বিদ্যুতের 'দ' হরফের মধ্যে দম্যত, দত্ত ও দয়ধ্বম—এই তিনটি বিখ্যাত উপদেশ দিয়েছিলেন।

(গ) শ্রম ও অধ্যবসায়—ব্রহ্মচর্যের সঙ্গেই শ্রমের কথা আসে। কারণ ব্রহ্মচর্যের শিক্ষাতেই ব্যক্তি জানতে পারে যে ফললাভ একমাত্র নিজের পুরুষকারেই সম্ভব। তার জন্যে প্রয়োজন যথোচিত কর্ম ও কর্মের সহিষ্ণুতা। ভারতীয় শাস্ত্রে তাকেই 'তিতিক্ষা' বলা হয়েছে। গীতায় একথাই বলা হয়েছে যে কর্ম সাধ্যমতো করবে এবং কর্মের ফলের জন্য অসহিষ্ণু ও চঞ্চল হবে না।

(ঘ) মিতব্যয়—সংযম চর্চার জন্তেই মিতব্যয়ের প্রয়োজন।

(ঙ) সংস্কৃতি—সংস্কৃতির অর্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মসংস্কার। আত্মসংস্কারের অর্থ নিজেকে কর্মের জন্য প্রস্তুত করা। এই প্রস্তুতিতে ব্যক্তি দুভাবে নিজেকে গড়বে। প্রথমত, কর্মের দায়িত্ব নেবার জন্য নিজের মানসিক প্রস্তুতি ও দ্বিতীয়ত সামাজিক জীবনে অন্তের সঙ্গে মিলবার শিক্ষা। ভারতীয় ঋষিদের মতে গুরুগৃহে ব্যক্তি এই শিক্ষাই লাভ করতো, ব্যক্তি হিসেবে ও সামাজিক মানুষ হিসেবে। মনুর ভাষায় আত্মসংস্কারেই ব্যক্তির 'চিত্তশুদ্ধি' তৈরি হয়। মনু আত্ম-সংস্কারের জন্য দশটি নিদান দিয়েছেন। ধৃতি, ক্ষমা, দম, শৌচ, চৌর্যাভাব ইত্যাদি।

পরগত কর্ম—(ক) ন্যায়—যথাবিহিত স্বীকৃতিই ন্যায়। নিজের কর্মকে গ্রহণ করা যেমন ন্যায় তেমনি অন্যের ক্ষেত্রকে মেনে নেওয়াও একই ভাবে ন্যায়। কাণ্ট যেমন বলেছেন যে মানুষকে উদ্দেশ্য বলে ধরতে হবে, তাকে কোনো ক্রমেই অপর কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ মনে করা চলবে না। কারণ, মানুষে মানুষে ভেদ একমাত্র বাহ্য আকৃতি ও অন্তর্নিহিত গুণের, কিন্তু অমৃতের সন্তান হিসেবে তারা সবাই তুল্যমূল্য। কেউ ছোট বা বড়ো নয়। সবাই শিব এবং সবাই অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না, তাদের কর্মের প্রতিবন্ধক হবে না এবং নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের সহযোগী হবে।

(খ) পরহিতৈষণা—ন্যায় ও পরহিতৈষণা যদিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় তবু ন্যায়ের সূত্রেই পরহিতৈষণা তৈরি হয়। প্রতি ব্যক্তিই যদি সমাজে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একক (unit) হয় তবে তারা নিজের নিজের কর্মেই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু আমরা জানি যে সমাজ উপযোগিতাবাদীদের নিয়মে চলেনা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিদের সমাহারটিই সমাজ নয়। সমান কার্যত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক। সুতরাং ব্যক্তিরা নিজেদের কর্মের সূত্রেই পরস্পর সম্পর্কিত হয়। সম্পর্ক দু জাতের, সহযোগিতা ও বিরোধ। বিরোধের সম্পর্ক একমাত্র সত্য হলে সমাজ স্থায়ী হতে পারতো না। তখন সমাজের চিত্রটি হতো দার্শনিক হব্‌স কথিত একটি বিশৃঙ্খল নৈরাজ্য। নৈরাজ্যে মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজেই নিছক প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে। মানুষ, লাইবনিৎস কথিত 'জানালাহীন মোনাড়ে'র মতো, ছন্নছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়ায় না। সমাজে প্রাথমিকভাবে

প্রকৃতির নিয়মেও সহযোগিতা থাকে

সম্পর্ক থাকে পরিবারে, আত্মীয় ও স্বজনদের মধ্যে। কিন্তু ওইটুকু সীমায় আত্মীয়তা ও হিতৈষণা আবদ্ধ থাকলে চলে না। কারণ তবে সমাজ আবার কয়েকটি আত্ম-নিবদ্ধ পরিবারের সমষ্টি হতো ও পরিবারে পরিবারে বিরোধের সম্ভাবনা তৈরি হতো। আত্মীয়তা ও মমতা পরিবারের সীমার বাইরে ছড়াতে হয় কারণ মানুষ তার অসংখ্য কর্মে অসংখ্য জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই জটিল সম্পর্কের সূত্রটি নিজের বাড়ি থেকে সারা বিশ্বে ছড়ায়। কাজেই ব্যক্তির মনে পরহিতৈষণা তার সামাজিক কর্মের সঙ্গেই জড়িত থাকে। বর্তমানে নীতি-শাস্ত্রের নির্দেশ শুধু এই যে, তাকে সচেতন ভাবেও চর্চা করতে হয়। খৃষ্টধর্ম সে কথা বলে 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো' নির্দেশটিতে এবং ভারতীয় ঋষিরা বলেন 'যেখানেই জীব সেখানেই শিব' অর্থাৎ সবাইকে সমজ্ঞানে শ্রদ্ধা করো, ভক্তি করো ও ভালোবাসো। স্বামী বিবেকানন্দর বিখ্যাত কবিতায় তাই পাই

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

আদর্শগত—(ক) বোধবিহিত—বুদ্ধি আমাদের জানাবে যে জীবনের লক্ষ্য একমাত্র সত্য। সত্যই ধ্রুব। জীবনের যাবতীয় কর্মকেই মানুষের চিরকালীন লক্ষ্য সত্যের কেন্দ্রে নিবদ্ধ করতে হয়। সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই মানুষ জানতে চাচ্ছে জীবনের লক্ষ্য কি? কি এই বিশ্ব প্রকৃতির নিহিত অর্থ? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত ও জগত অন্তরালবর্তী একমাত্র স্থির, নিবাত প্রদীপ শিখার মতো অচঞ্চল সত্যকেই জানার অভিপ্রা মানুষের। সচেতন ভাবে প্রতিটি কর্মেই নেতি নেতি ভাবে শঙ্করাচার্যের মতো সত্যকে খুঁজতে হবে সাধ্য মতো। কারণ সত্যেই জীবনের স্থিতি ও প্রকাশ।

(খ) সৌন্দর্য-বিহিত—সত্যই সুন্দর বা সুন্দরই সত্য। সুন্দর কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় লোভন বস্তু নয়। সৌন্দর্য বস্তু ও জগতের অন্তর্নিহিত কার্য কারণ। সৌন্দর্য জীবনের পারস্পরিক সুষমা ও আদর্শ অবস্থান। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাই সর্বপ্রথম বাহ্যত সৌন্দর্য চিনতে হয় বস্তুর ইন্দ্রিয়-লোভন পরিচয় থেকে। তারপর খুঁজতে হয় সৌন্দর্যের উৎস যা কার্যত সমস্ত কিছুকেই সত্য করে তোলে।

(গ) নীতি-বিহিত—নীতি-বিহিত কর্ম শিব-সংক্রান্ত অর্থাৎ মঙ্গলের দিব্য প্রভায় উজ্জ্বল। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য তাই 'পরহিতায় পরসুখায় চ'—পরের হিত

ও পরের সুখের জন্য হওয়া চাই। নিজেকে ভুলতে পারলেই বিকর্ম থেকে অকর্ম তৈরি হয়। এই অকর্মের সূত্রপাত হয় পরের মঙ্গলের কল্পনা থেকে।

সভ্যতার গোড়া থেকেই দার্শনিকরা মৌলিক ধর্মের একটি তালিকা তৈরি করতে চেষ্টা করছেন। য়ুরোপে সবচেয়ে বিখ্যাত তালিকা বানান প্লেটো ও এরিস্টটল। প্লেটোর মৌলিক ধর্মে চারটি নাম পাই: বিবেচনা ও বোধ (Wisdom or Prudence), বীর্য (Courage), সংযম (Self-restraint) ও ন্যায় (Righteousness)। প্লেটোর এই তালিকার প্রধান ত্রুটি সহজেই নজরে পড়ে। প্লেটো লক্ষ্য করেননি যে তাঁর 'বিবেচনা ও বোধ' প্রত্যয়টিতেই পরবর্তী তিনটি পাওয়া যায়। এই ত্রুটির কারণে এরিস্টটল তালিকাটি বাড়ান। এরিস্টটলের তালিকাটি পুরোপুরিই গ্রীক জীবনযাত্রার নজীরে তৈরি হওয়ায় বর্তমান কালের উপযোগী নয়। ভারতীয় তালিকায় দুটি ধর্মের উল্লেখ পাই, 'সাধারণ ধর্ম' ও 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। প্রথমটি সামাজিক ও সামান্যকর্ম, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত। এই দুটিকে মেলালেই 'চিত্তশুদ্ধি' ঘটে। মনু সাধারণ ধর্মের দশটি নাম দিয়েছেন। ধৃতি, ক্ষমা, দম, চৌর্যাভাব, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ।

মনুর আলোচনার সূত্রেই বোঝা যায় যে আত্মগত ও পরগত ধর্মের বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও ব্যক্তির ধর্ম তার নিজস্ব মঙ্গলের লক্ষ্যে পরিচালিত তবু সমাজের মঙ্গলের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই।

অনুশীলনী

১। Explain the meaning of 'Duties' and 'Virtues'. How are Virtues classified ?

২। Discuss the relation between (a) Duties and Rights and (b) Duties and Virtues

৩। Explain the principles according to which Virtues should be classified.

৪। Write a short critical note on (a) Conflict of Duties and (b) Casuistry.

দ্বাদশ অধ্যায়

নৈতিক আবেগ

১। নৈতিক আবেগ (Moral Sentiment)

সঙ্কল্পজাত স্বেচ্ছামূলক কর্মে নীতিশাস্ত্রের সূত্রপাত। সঙ্কল্পের সঙ্গে আদর্শ ও আদর্শের সঙ্গে বিচার জড়িত। মানুষের কর্মকে শুধুমাত্র বিচারজাত বললে মনে হবে মানুষ বুঝি একটি যন্ত্র, বিচার নামক ক্রিয়া তার নিত্যদিনের কর্ম। কিন্তু মানুষ প্রাণী জগতের অন্যতম হিসেবে কেবলমাত্র যুক্তির অধিকারী নয়, সে প্রবৃত্তিরও দাস। প্রবৃত্তি তাকে আবেগের পথে পরিচালিত করে। কাজেই মানুষের পূর্ণতা তৈরি হয় আবেগ ও বিচারে। নীতিশাস্ত্রে আমরা আবেগটুকু বাদ দিয়ে শুধু বিচারে কেন্দ্রবদ্ধ থাকতে পারি না কারণ মানুষের বহু নৈতিক কর্মই আবেগের পথে চলে। আবেগেই প্রাণের চাঞ্চল্য প্রকাশিত হয়, আবেগই কর্মের বেগ সঞ্চারিত হয়। আবেগকে বিচারে গ্রহণ না করলে নৈতিক কর্মের চরিত্র পরিস্ফুট হয় না।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা তাঁদের নীতিশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় আবেগকে বাদ দিয়েছিলেন। ওঁদের মতে মানুষের প্রকৃত চরিত্র যেহেতু একমাত্র বিচারেই প্রকাশিত হতো সুতরাং মানুষ বিচারজাত ক্রিয়াকর্মেই তার নিজস্ব চরিত্রের ছাপ ফেলে। সক্রাটেস থেকে এরিস্টটল এই ভাবে আলোচনা করেন। বিচার প্রক্রিয়ায় জ্ঞান জন্মালেই মানুষ সৎ হবে, নৈতিক হবে এ-কথা ওঁরা অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তাই ওঁদের মনে হয়েছে যে জ্যামিতির মতো জ্ঞানটিকে ধরিয়ে দিতে পারলেই মানুষেরা যে যার কর্মে জ্ঞানের আলোকেই প্রকাশ করবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো জ্ঞানী ব্যক্তিও অন্যায় কাজ করেন। এই অসঙ্গতির প্রসঙ্গে ধরা পড়লো যে জানা থাকলেও আমরা নানা কারণে সত্য বলি না, সৎ আচরণ করি না বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অন্যায় পথে চলি। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান আছে। এই ব্যবধানটিকে য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম স্পষ্ট করে প্রমাণ করে। খৃষ্টধর্ম আবেগের ওপর জোর দেয় এবং বলে যে জ্ঞানী না হলেও চলবে শুধু শুদ্ধ আবেগে যীশুর কাছে আত্মদান করো। সন্ত ফ্রান্সিসের জীবনযাত্রায় আমরা শুদ্ধ আত্মদানের পরিচয় পাই।

গ্রীক চিন্তায় আবেগ বাদ পড়ে

আমাদের দেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন 'মন মুখ এক কর' অর্থাৎ চিন্তা ও কর্মকে মেশাও এবং ঈশ্বরের জন্য একটু কাঁদো। অর্থাৎ তিনি বলছেন শুধু জ্ঞান নয়। জ্ঞানের সঙ্গে আবেগ মেশাও, তবেই পরিপূর্ণতা লাভের পথে এগোতে পারবে।

আবেগের প্রয়োজন স্বীকৃত হলে আমরা আবেগের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে অবহিত হতে পারি। প্রথমেই আমরা বলবো যে নৈতিক আবেগের সঙ্গে স্বার্থের কোনো যোগ নেই। নৈতিক আবেগ নির্মোহ ও নির্লিপ্ত। কারণ আবেগ স্বার্থ-কেন্দ্রিক হলে কর্মের ন্যায় ও অন্যায় বিষয়ে বিবেচনাটি নষ্ট হয়। তখন কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন ও সুখের জন্যই কর্মের বাসনা থাকে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন নির্মোহ কর্মের কথা বলেন। নির্মোহ কর্মের ভিত্তি নির্মোহ মানস অর্থাৎ নির্মোহ আবেগ।

নৈতিক আবেগে স্বার্থ নেই

নৈতিক আবেগ স্বতই কর্মে প্রকাশিত হয়। গ্রীক ও খৃষ্টধর্মের বিরোধ থেকে দেখানো হয়েছে যে জ্ঞান স্বভাবতই কর্মে পরিণত হয় না কিন্তু আবেগ আমাদের কর্মে প্রবুদ্ধ করে। কাজেই কর্মের ভিত্তি হিসেবে নৈতিক আবেগ সর্বদাই আমাদের সৎ কর্মে অনুপ্রেরিত করে। জ্ঞানত সত্যমিথ্যা না জানলেও, যুগসঞ্চিত শিক্ষায় সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তিও পরোপকারের নৈতিক কর্মে এক মুহূর্তেই অংশ গ্রহণ করে।

কর্মে প্রকাশিত

নৈতিক আবেগ যেহেতু কর্মে প্রকাশিত হয় সেহেতু তা কেবলমাত্র মনেই নিবদ্ধ থাকে না। তার ব্যবহারিক আত্মপ্রকাশ হয়। যেমন এমনিতেই বাহ্য চিহ্ন মিলিয়ে শারীরিকভাবে আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি নৈতিক আবেগও ব্যবহারিকভাবে কর্মে ক্রিয়াশীল হয়।

ব্যবহারিক প্রকাশ

মানুষ সমাজবদ্ধ হওয়ায় তার নৈতিক কর্ম শুধু মাত্র ব্যক্তিগত সীমাতেই আবদ্ধ থাকে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে কর্মের সূত্রে সম্পর্কিত হয়। নৈতিক কর্ম তাই প্রতি ধাপেই সামাজিক কর্ম। নৈতিক কর্মের ভিত্তি হিসেবে নৈতিক আবেগও তাই সামাজিক।

সামাজিক

আবেগ বলতে একটি অনুভূতি বোঝায়। অনুভূতি প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর হয়। নৈতিক বিশেষণটি আবেগের সঙ্গে জুড়ে আমরা বোঝাতে চাই যে, যে-

আবেগ ন্যায় কর্মের প্রতি মনকে আকর্ষণ করে ও অন্যায়ের প্রতি বিরূপ করে তোলে তাকেই নৈতিক আবেগ বলা হবে। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় আমরা প্রমাণ পাই যে কেমনভাবে আমরা আত্মদানের গল্পে, পরোপকারের কাহিনীতে উদ্‌বুদ্ধ হই এবং অন্যায় ও অবিচারের উল্লেখে বিরক্ত হয়ে উঠি। যদিও কিন্তু নিজের কর্মের ক্ষেত্রে এই সৎ আবেগ সর্বদাই প্রকাশিত হয় না। তবু আবেগই প্রমাণ করে যে মানুষ মনুষ্যত্বের পথে চলবে, কোনো একদিন তার আত্মপলব্ধির কথা ভাববে।

২। নৈতিক আবেগের শ্রেণীবিভাগ—
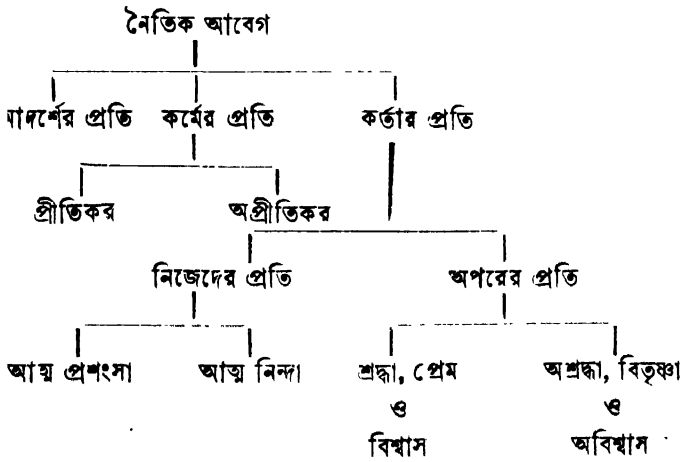
এই শ্রেণী বিভাগ থেকে প্রধানত তিন ধরনের আবেগ পাওয়া যাচ্ছে। (ক) ব্যক্তির সম্পর্কে, (খ) কর্ম সম্পর্কে ও (গ) আদর্শ সম্পর্কে। একটি ছেলে ডুবন্ত একটি ছেলেকে রক্ষা করলো। স্বভাবতই তার এই কর্মটি বিষয়ে আমাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। ব্যক্তির আলোচনায় আমরা কাজের কথা ভাবিনা, লোকটির সম্পর্কেই উৎসাহী হই বেশি। ব্যক্তি কেন্দ্রিক আবেগ দুজাতের। আত্মকেন্দ্রিক ও পরকেন্দ্রিক। নিজের ভালো বা মন্দ কাজের কথা ভেবে আমি যখন বিরক্ত ও উদ্‌বুদ্ধ হই তখন তাকে আত্মকেন্দ্রিক নৈতিক ভাবাবেগ বলা হয়। এই ভাবাবেগটি নৈতিক কারণ আমি আমার আচরণটিকে মনে মনে অসমর্থন করছি এবং অন্যায় বলছি। যখন উদ্‌বুদ্ধ হই তখন আমি কাজের ন্যায় ভেবেই উল্লসিত

ব্যক্তি, কর্ম ও আদর্শ বিষয়ে আবেগ

হই। পরকেন্দ্রিক আবেগের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পরকেন্দ্রিক আবেগে কখনো শ্রদ্ধা ও প্রীতিকর মনোভাব থাকে, কখনো অপ্রীতিকর মনোভাব ও ঘৃণা থাকে। যেমন, জলমগ্ন শিশুটিকে উদ্ধার করায় ছেলেটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকে, তেমনি অন্যায়ভাবে ক্ষতি করায় আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ঘৃণা করতে পারি।

ওপরের দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বস্তু-কেন্দ্রিক, যে-বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর। কিন্তু যখন কোনো আদর্শ বিষয়ে আমরা চিন্তা করি তখন আমাদের চিন্তার বিষয় বিমূর্ত। এই চিন্তার ফলে আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তাকে নৈর্ব্যক্তিক বলা যায় কারণ তার সঙ্গে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির যোগাযোগ থাকে না। যেমন শঙ্করাচার্য ব্রহ্মলাভের জন্য কৈশোরেই গৃহত্যাগ করেন। তিনি ব্রহ্ম বিনা আর কিছুই চাননি।

৩। নৈতিক আবেগ ও নৈতিক বিচার (Moral Sentiment and Moral Judgment)

এবারে প্রশ্ন ওঠে নৈতিক বিচারের সঙ্গে নৈতিক আবেগের সম্পর্ক কি? কোন্‌টি মৌলিক? আবেগেই বিচার তৈরি হয় না আগেই আবেগ? এই বিতর্কে দুটি প্রধান মতবাদ আছে। (ক) নৈতিক বোধতত্ত্ব ও (খ) নৈতিক বিচারতত্ত্ব।

(ক) নৈতিক বোধতত্ত্ব—এই মতে নৈতিক আবেগ বিচারের পূর্ববর্তী। কাজ করবার পর বিবেক বুঝতে পারে কাজের গুণ বুঝবার একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আমাদের আছে। এই ক্ষমতা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতো। এই 'নীতি ইন্দ্রিয়'টি স্বভাবতই কাজের গুণাগুণ বিচারের জন্য মানুষের সহজাত। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে যেমন বস্তুর রঙের একটি বোধ দর্শনেন্দ্রিয়ে ধরা পড়বার পর বিচার করে বলি লাল বা নীল তেমনি কর্মের চরিত্র 'নীতি ইন্দ্রিয়ের' কাছে গোড়াতেই প্রকট হয় এবং পরে কাজটির বিচার করি। বিচারেই যদিও কাজের ভালো বা মন্দ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় তবু আবেগে পূর্বেই তার সত্তা মনে প্রকাশিত হয়। কাজেই নীতি-ইন্দ্রিয় যে-কাজকে প্রীতিকর বলবে সেই কাজটিকেই পরে বিচার মারফৎ আমরা সমর্থন করি বা করি না। সুতরাং বিচার আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, দেখলুম তুমি বাবার পকেট থেকে পয়সা তুলছো, অমনি আমার মন বিষিয়ে গেলো। অর্থাৎ আমি বুঝতে পারলুম তুমি অন্যায় কাজ করছো। মন বিষিয়ে গেলো বলেই পরে বিচার করে কাজটিকে অন্যায় বললাম।

(খ) নৈতিক বিচারতত্ত্ব—এই মতে মানুষের বুদ্ধিই মনুষ্যত্বের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং বিচার ব্যতীত মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয় না। মানুষের জীবনে নৈতিক বিচারই মুখ্য, কোনো ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sense data) মানুষকে তার প্রকৃত পরিচয় জানায় না।

নৈতিক বিচারের জন্য প্রয়োজন আদর্শ বা লক্ষ্য বিষয়ে জ্ঞান, কর্তা বা বিষয়ীর পরিবেশ ও চরিত্র বিষয়ে জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষ জন্মেই পেতে পারেনা বা বুদ্ধি বিচার ছাড়া তার পক্ষে এসব জানাও সম্ভব নয়। কারণ এই দুটি সর্তই ব্যক্তির অন্তরে নিবদ্ধ নয়, তার বাইরে এদের জন্ম ও প্রকাশ। সুতরাং গুপ্ত কোনো সহজাত ক্ষমতার ওপর পরিবেশের জ্ঞান নির্ভর করে না। আমরা গোড়া থেকেই প্রতি ধাপে কর্মের বিচার করি এবং বিচার করে জগত ও জীবন বিষয়ে মতামত স্থির করি। বিচারের ভালো মন্দের ওপর আমাদের মনোভাব ও আবেগ নির্ভর করে। যেমন পুরোনো উদাহরণটিতে বাবার পকেট থেকে চুরি করা নামক ঘটনাটি যদি আমরা বিচারে সৎকর্ম বলতাম তবে আমার মন ঘটনাটি দেখে প্রীত হতো, ক্ষুব্ধ হতো না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে ক্ষুব্ধ হয়েছে তার কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ বিচারে স্থির করেছে এই কর্মটি অন্যায়। কাজেই আমার বিরূপ মনোভাবের পেছনে একটি গুপ্ত বিচার কাজ করছে। ওই বিচারটি ব্যতীত মন এই কাজে কখনোই সাড়া দিত না। আরো একটি উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। বহু আদিম সমাজে নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এই সমাজের নরহত্যাকে নিশ্চয়ই অন্যায় প্রথা বলি কিন্তু তাদের একজনকে আমাদের সমাজে আনলে সে নরহত্যা নেই বলে অবাক হবে ও হয়তো আমাদের অনৈতিক বলবে।

আবেগ বিচার নির্ভর

এই বিতর্কের সমাধান হিসেবে বলতে হবে যে আবেগ ও বিচারে এমন বিরোধের কল্পনা করা যায় না। কারণ মানুষের মন এমন খোপে খোপে বিভক্ত নয় যে কোথাও আবেগের বাসস্থান ও কোথাও বিচারের বাসস্থান। ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে একবার শরীর ও মনকে পৃথক করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ তিনি মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানের চরিত্রকে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। একই মানুষ আবেগে উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং বিচার করে। যখন সে বিচার করে তখন তার মনের তলায় আবেগের স্রোত সঙ্গোপনে থাকে যেহেতু কোনো মানুষই সম্পূর্ণ আবেগ-বিরহিত নয়। এমন কি শঙ্করাচার্যের মতো

ব্রহ্মজ্ঞ বৈদান্তিকও মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি মমতায় আশ্রম খোলেন ও ধর্মশিক্ষা দেন। সম্পূর্ণ বিচারহীন মানুষ বলতেও কিছু হয় না কারণ তখন সে অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণী হয়ে যাবে, মানুষ থাকবে না। আমরা তাকেই মানুষ বলি যার সচেতন বিচার ও বিবেচনা আছে।

মানুষের আবেগ ও বিচার সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে। সংস্কৃতির বক্তব্য অনুযায়ীই বিবেক ও বিচার কাজ করে। বিবেকের পেছনে ঐতিহ্যের প্রকাশ থাকে তাকে আমরা যুগ-সঞ্চিত বিচার বলতে পারি। আবার তেমনি বিচারের পেছনে মনে বোধি কাজ করে যে-বোধি হঠাৎ সত্য থেকে মিথ্যা ও ন্যায় থেকে অন্যায়কে পৃথক করে দেয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মতো নিরক্ষর অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটিও যে-কারণে অসামান্য সরল ভাবে দুরূহ দার্শনিক সমস্যাবলী সমাধান করে দেন। তিনিই তো বলেছেন যে তিনি কিছুই জানেন না, তাঁকে তাঁর মা সমস্ত দেখিয়ে দেন। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে বিচারের পূর্বে মানুষের মনে একটা বোধ কাজ করে যে-বোধ হঠাৎ বিচারের বিষয়টিকে আলোকিত করে।

আবেগ ও বিচার পৃথক নয়, পরস্পর সম্পর্কিত

তাছাড়া একথা সহজেই বোঝা যায় যে জন্মমুহূর্তেই মানুষ বিচার করতে করতে তার মনকে স্থির করেনি। এবং বিচার শেষে আবেগকে করুণা করে ব্যবহৃত হবার ছাড়পত্রও দেয় নি। বিচার যদি আবেগের পূর্ববর্তী হয় তবে আমরা বলতে পারি যে আবেগের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ শুধুমাত্র বিচারেই মানুষের কাজ চললে খামোকা তার আবার আবেগ দরকার করবে কেনো? আরও একটি প্রশ্ন ওঠে আবেগ কোথা থেকে আসছে? মনে তো শুধু বিচার আছে, আবেগ কি তবে বিচার থেকে জন্মায়? যদি বিচার থেকে আবেগ জন্মায় তবে নিশ্চয়ই বিচার ও আবেগে গভীর সংযোগ আছে। অর্থাৎ বিচার গোড়া থেকেই আবেগ বিরহিত নয়। সুতরাং আবেগ ও বিচার সমকালীন। কোথাও আবেগ বিচারকে সত্যে নিয়ে যায় যেমন খৃষ্টধর্ম বলতে চেয়েছে, তেমনি কোথাও বিচার আবেগকে পরিচালিত করে, যেমন বিজ্ঞান। কিন্তু মানুষ কখনো শুধুমাত্র একটিকে নিয়ে চলে না। দুটিই একই সঙ্গে তার জীবনে সত্য।

সুতরাং এই দুটি তত্ত্বেই সত্য ও মিথ্যার প্রকাশ থাকছে।

অনুশীলনী

১। What is moral sentiment? Classify and point out their main traits.

২। Explain the relation between moral judgment and moral sentiment.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কর্তৃত্ব ও নৈতিক মান

১। কর্তৃত্ব বলতে কি বোঝায় (The Problem of Authority)

স্বাধীন মানুষের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট কর্মকেই আমরা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলেছি। শুধু কর্মের প্রসঙ্গই নয়, কার্যত স্বাধীন ক্রিয়াশীল প্রাণবান ব্যক্তিটিই নীতিশাস্ত্রের কেন্দ্র। মানুষ কর্ম করে এবং করে স্বাধীন ভাবে। কর্ম তার স্বাধীন আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। কর্মের চরিত্র ও প্রকাশের ভঙ্গীতে মানুষের নৈতিক জগতটি পরিস্ফুট হয়। স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সূত্রে আমরা জানি যে দৈনন্দিন কর্মের নির্দিষ্ট পরিমাপ কখনোই সম্ভব নয় অর্থাৎ অসংখ্য কর্ম প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই থাকছে। আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যক্তিকে একদিকে যেমন তার লক্ষ্য স্থির করতে হয় তেমনি তার কর্মকেও বাছাই করতে হয়। যে-কোনো কর্মেই তার লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না। কর্মের প্রবাহ থেকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে সচেতন বাছাইতেই ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়। বাছাইয়ে যদিও লক্ষ্য ও স্বাধীনতা প্রকাশিত হচ্ছে তবু প্রশ্ন থাকে কেনো কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ আমি করবো? এই প্রশ্নের সূত্রেই কর্তৃত্বের কথা ওঠে। সাধারণভাবে জবাব দেওয়া যায় যে আমি আমার ভবিষ্যত লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কর্ম নির্বাচন করি। তবু প্রশ্নটির পুরো জবাব পাওয়া যায় না যেহেতু প্রশ্নটি একটু বদলেই আবার জিজ্ঞেস করা যায়, বিশিষ্ট কর্মের পেছনে এমন কি গুরুত্ব থাকে যে তাকেই একমাত্র বাছাই করতে হবে? নৈতিক মানের কথা তখন ওঠে। যে যার মানদণ্ডের সাহায্যেই কর্মকে বাছাই করে এবং বলে যে তার মানদণ্ডেই শ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত সত্য নিহিত আছে। মানদণ্ডই কর্মকে বিশিষ্টতা দিচ্ছে এবং কর্মের আবশ্যিকতা প্রমাণ করছে। যেমন উদাহরণত ধরা থাক উপযোগিতাবাদের কথা। উপযোগিতার মানদণ্ডে সুখের মাত্রাভেদে যখন কর্মকে বাছাই করা হয় তখন উপযোগিতাবাদীরা বলেন যে একমাত্র সুখই কর্মকে নৈতিকতায় ভূষিত করে। সেই কর্মই নৈতিক যা জীবনে চূড়ান্ত সুখকে প্রতিষ্ঠা দেয়। সুখই কর্মের ভিত্তি ও কর্মের লক্ষ্য। সুখ কর্মের পেছনে নিহিত চালক-শক্তি যা কর্মকে ঔচিত্যের

বাছাইয়ের পেছনে যে নিয়ন্ত্রণ থাকে তাকেই কর্তৃত্ব বলে

কর্তৃত্ব দেয়। অর্থাৎ নৈতিক ঔচিত্য তখন আবশ্যিক (must) হয়ে ওঠে। **এই আবশ্যিকতাকেই** আমরা কর্তৃত্ব নাম দিয়েছি।

সাধারণভাবে কর্তৃত্ব বা আবশ্যিকতাকে আমরা তিনটি শব্দের দ্বারা বুঝি। একটি **যা আছে, যা নিশ্চয়ই করতে হবে** এবং যা করা **উচিত**। যা আছে বা আমরা যাকে বলেছি 'অস্তি' (is), যা নিশ্চয়ই করতে হবে বা আমরা করতে বাধ্য (must) ও যা বিবেচনায় আমরা উচিত বলে স্থির করেছি (ought)। এই তিনটি প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরণের বাক্য পাই; (ক) আমার কাজটি করে মন খারাপ হয়েছে, (খ) তোমাকে বাড়ি যেতেই হবে ও (গ) তোমার মঙ্গলবার কথা রক্ষা করা উচিত ছিলো।

নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞায় দেখানো হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'অস্তি'ই প্রধান আলোচ্য কিন্তু ঔচিত্য নীতিশাস্ত্রের নিজস্ব বিচারের ক্ষেত্র। অথচ এখন বলা হচ্ছে 'অস্তি'র পেছনেও কর্তৃত্ব আছে। অস্তির পেছনেও যে কর্তৃত্ব আছে তার প্রমাণ, আমরা স্বাধীন সঙ্কল্প সত্ত্বেও যখন যেমন খুশি কাজ করতে পারিনা। কাজে প্রতিবন্ধকতা থাকে। প্রতিবন্ধকতা বা বাধা ছাড়াও নানা সীমাবদ্ধতা থাকে কাজের। যেমন আমি একটা নদী লাফ দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারিনা। নৌকো দরকার করে পারাপারের জন্য। প্রয়োজনের সময় নৌকো না-থাকাটা প্রতিবন্ধকতা কিন্তু লাফ দিয়ে পেরোবার ক্ষমতা না-থাকাটা আমার সীমাবদ্ধতা। বাধা ও সীমাবদ্ধতা কার্যকরী ঘটনায় উপস্থিত। অথচ আমি যদি সীমাবদ্ধতার চরিত্র না বুঝি তবে আমার মূর্খতা হবে।

অস্তি, নিশ্চয় ও উচিত

নদী লাফ দিয়ে পেরোবার চেষ্টা করলে **নিশ্চয়ই** নদীতে ডুবতে হবে। এই যে সীমাবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা তার জোর অনস্বীকার্য। আমরা যে নদীর ক্ষেত্রে লাফ দিয়ে পেরোবার চেষ্টা করিনা তার কারণ ওটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম নয় যে ওই নিয়মের আকর্ষণেই লাফ দিচ্ছি বা দিচ্ছিনা। মনুষ্যেতর প্রাণী স্বভাবজ প্রাকৃতিক বৃত্তির বলেই কাজ করে বা করেনা। কিন্তু নদী পেরোবার ঘটনায় মানুষ সচেতনভাবেই ফলাফলের চিন্তা করে এগোচ্ছে বা পিছিয়ে আসছে। আমরা নির্দিষ্ট অবস্থার চরিত্র (is) থেকে আমাদের কর্মের নিশ্চয়তা স্থির করি, লাফ দেবো কি দেবো না। অনেক সময় আবার সামাজিক বিরূপতার ভয়ে আমরা কাজ থেকে বিরত হই। বা হতে বাধ্য-হই। সেক্ষেত্রে বাধা আসছে বাইরের অবস্থা থেকে। যেমন ভিক্টোরীয় আমলে ইংলণ্ডে বিবাহ

বিচ্ছেদের সমর্থন ছিলোনা। নরওয়েজীয় নাট্যকার হেনরিক ইবসেন তাঁর 'পুতুলের সংসার' নাটকে নায়িকা নোরাকে স্বামীর গৃহ থেকে সরিয়ে দেন। ইংরেজিতে অনূদিত এই নাটকটি ইংলণ্ডে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা শক্তির দাপটেই সম্ভব হলো। অর্থাৎ এখানে নিশ্চয়তার জোর আইনের।

কিন্তু ইবসেনের নাটকটি যদি আমি নিজেই সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভেবে বন্ধ রাখতাম তবে তাকে আর বাহ্য প্রতিকূলতা বলা চলতো না। আমরা তখন সিদ্ধান্তটিকে নৈতিক কর্ম বলতাম যেহেতু এখানে আমার কর্মটি ঔচিত্য বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নির্দিষ্ট কর্মটির পেছনেও জোর আছে কিন্তু সেই জোর নৈতিক বিবেচনার, ভালোমন্দ যাচাইয়ের। নৈতিক কর্তৃত্বের প্রসঙ্গে ফলপ্রয়োগকারী শক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে। নৈতিক কর্ম আত্মশক্তিতেই তার কর্তৃত্ব আহরণ করে।

কর্মের কর্তৃত্বকে আমরা তিনভাগে দেখতে পারি। প্রথমত, বাহ্য আইনের মানদণ্ডে; দ্বিতীয়ত, অন্তঃস্থ আইনের সূত্রে ও তৃতীয়ত, লক্ষ্যের কল্পনায়। প্রথমটিকে বলা যায় ঈশ্বরের নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম বা রাষ্ট্রীয় আইনাদি। দ্বিতীয়টিকে আমরা বলতে পারি যুক্তি বা বিবেকের নিয়ম। তৃতীয়টির পরিচয় বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতিতে। যেমন উপযোগিতাবাদ বা কাণ্টীয় মতবাদ।

২। নীতিশাস্ত্রে নিয়মের অর্থ (Meaning of Law in Ethics)

নিয়মের ব্যাখ্যা নিয়ে নীতিশাস্ত্রে নানারকম গোলোযোগ দেখা দিয়েছে। দুটো অর্থে নিয়মকে আলোচনা করা যেতে পারে। (ক) কোনো দেশের নিয়ম বা আইন ও (খ) প্রকৃতির নিয়ম। এই দুটি নিয়মের অর্থ ভিন্ন। দেশের নিয়ম বা সমাজের নিয়ম তৈরি করে মানুষেরা বা সমাজপতিরা। দেশের নিয়মের ক্ষেত্রে জানি যে নিয়মের পরিবর্তন সমাজপতিরা করেন অথবা লোকেরা তা নাও মানতে পারে। আবার এক দেশের নিয়ম অন্য দেশে খাটে না। প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু অমোঘ, অপরিবর্তনীয় ও সর্বব্যাপী।

নিয়ম বিচারের দুটি মান

যে কোনো নিয়মকে তাই আমরা পরিবর্তনশীলতার মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন, কোনো নিয়ম পরিবর্তনশীল ও কোনো নিয়ম অপরিবর্তনীয়। কোনো নিয়ম লঙ্ঘনীয় আবার কোনো নিয়ম অলঙ্ঘ্য। কোনো নিয়ম সর্বব্যাপী ও কোনো নিয়ম অংশত কার্যকরী। কার্যত কিন্তু কোনো নিয়ম সামান্য বা সর্বব্যাপী হলে তা স্থায়ী ও অনিবার্য হয়। সুতরাং নিয়মের বিচারে

আমরা দুটি মানদণ্ড প্রয়োগ করবো। (১) নিয়মটি পরিবর্তনশীল কি অপরিবর্তনীয় ও (২) লঙ্ঘনীয় কি অলঙ্ঘ্য।

এই দুটি মানদণ্ডে আমরা চারটি অবস্থা পাই। (১) যে নিয়মগুলো পরিবর্তনশীল ও লঙ্ঘণীয়, (২) যা পরিবর্তনশীল কিন্তু অলঙ্ঘ্য, (৩) যা লঙ্ঘনীয় কিন্তু অপরিবর্তনীয়, ও (৪) যা অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘ্য। মানুষের দেশগত ও সমাজগত নিয়ম প্রথম ভাগে পড়ে। চতুর্থভাগের নিয়ম-গুলো প্রাকৃতিক। দ্বিতীয় ভাগের নিয়মের মধ্যে সর্তাধীনভাবে সৌর জগতের নিয়মগুলি আছে যেমন দিনরাত্রি, ঋতু-পরিবর্তন ইত্যাদিকে ধরা যায়। যতোদিন সূর্য প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় থাকবে ততোদিন দিনরাত্রি ও ঋতুচক্রের নিয়মগুলো অব্যাহত থাকবে। কিন্তু সূর্য নিভে গেলে অর্থাৎ সর্তের পরিবর্তন ঘটলে দিনরাত্রি ইত্যাদিকে আর ঘটতে দেখবো না। যেমন বৈজ্ঞানিক জীন্‌স লিখেছেন যে একদিন সূর্য মরে যাবে আর আমরা উত্তাপের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। রাষ্ট্রনীতির নিয়ম গুলোও এই জাতের। এই নিয়মগুলো বিশেষ রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত। যতোদিন রাষ্ট্রটি অব্যাহত থাকে ততোদিন নিয়মগুলো কার্যকরী কিন্তু রাষ্ট্রটির পরিবর্তন ঘটলে নিয়মগুলিও পরিবর্তিত হয়। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের সময় বিষয়ক ধারণাকে এই ভাগে ফেলেছেন। ওঁর মতে সূর্য-কেন্দ্রিক জগতে সময়ের একরকম ধারণা কিন্তু সৌরজগতের বাইরে সময়ের ধারণা অন্যরকম হতে বাধ্য।

পরিবর্তনশীল কি লঙ্ঘণীয়

নীতিশাস্ত্রের নিয়মকে আমরা তৃতীয় বিভাগটিতে রাখি। নীতিশাস্ত্রের নিয়মকে লঙ্ঘন করা যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে নৈতিকতার বিশেষ সূত্রগুলি দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে পৃথক বা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মৌলিক প্রত্যয়াদি চিরকাল এক এবং সর্বব্যাপী। কারণ নীতিশাস্ত্র মানুষ এবং মানুষের কর্ম-বিষয়ক। স্বাধীন মানুষের নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে আমরা কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয়কে স্বীকার করেছি। ওই প্রত্যয় কটি সর্বযুগে সর্বকালের মানুষের প্রতিই প্রযোজ্য। কারণ ওই কটি প্রত্যয় ছাড়া কোনো কর্মই নৈতিক হতে পারে না। নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ড পৃথক হতে পারে, সে বিষয়ে দার্শনিকদের বিতর্ক অনাগত কাল ধরে চলতে পারে, কিন্তু মানুষকে নৈতিক হবার জন্যে স্বাধীন হতেই হবে এবং তার স্বাধীনতার জন্য 'আত্ম'কে মানতেই হবে। এই দুটি প্রত্যয় বাদ গেলে মানুষের মনুষ্যত্বই থাকে না। মনুষ্যত্ববিহীন মানুষের কোনো কর্মের নৈতিকতার প্রয়োজন হয় না। যেমন

নীতির নিয়ম ভাঙা যায়, বদলায় না

এই দুটি প্রত্যয় কেড়ে নিলে মানুষ যন্ত্র হয়ে যায়। আর আমরা জানি যে যন্ত্রের কোনো নৈতিকতা নেই যেহেতু তার অস্তি ও ঔচিত্যে কোনো তফাৎ থাকে না। যন্ত্রের জগতে অস্তিটুকুই সব, যন্ত্র চিরকাল একভাবে একই কাজ করে যায়। তার ক্রম-উদ্‌বর্তন ঘটে না। নিজে থেকে তাকে নতুন কিছু হয়ে উঠ্‌তে হয় না।

নীতিশাস্ত্রের সূত্রে তাই আমরা অস্তি, নিশ্চয় ও উচিত এই তিনটি শব্দের অর্থকে পৃথক করি। নীতিশাস্ত্র অস্তিকে স্বীকার করে কিন্তু জানায় যে অস্তি ঔচিত্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেই নৈতিকতার সূত্রপাত হয়। শুধুমাত্র অস্তি নিয়ে বিজ্ঞানের চলে কিন্তু নীতিশাস্ত্রের চলে না। নিশ্চিতি বিজ্ঞানের বিষয় যেহেতু তাকে পরিমাণ গত আলোচনা করতে হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করতে হয়। নীতিশাস্ত্রে নিশ্চিতির কোনো প্রসঙ্গ নেই। যেহেতু মানুষের কোনো একটি অবস্থাকে নীতিশাস্ত্র নিশ্চিত বলে স্বীকার করে না। মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাকেই নীতিশাস্ত্র একমাত্র গ্রহণ করে। মানুষের এমন সম্ভাবনা থাকাতেই মানুষ বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতে পরিবর্তনের কথা ভাবে ও আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে জানতে চেষ্টা করে।

৩। নৈতিকতার সমর্থন (Sanctions of Morality)

হেনরী সিজউইক বলেছেন যে 'নৈতিকতার সমর্থন' শব্দটি নীতিশাস্ত্রে এসেছে আইনী আলোচনার সূত্রে। নৈতিক 'সমর্থন' শব্দটির অর্থ স্বীকৃতি বা ছাড়পত্র। অর্থাৎ যা নীতিকে জোর দিচ্ছে। রাষ্ট্রের নীতির ক্ষেত্রে যেমন নীতির দাবি সংগৃহীত হয় ও শক্তি আসে তার পেছনকার রাষ্ট্রযন্ত্রের সঞ্চিত বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতা থেকে। রাষ্ট্রের নীতি না মানলে রাষ্ট্র জোর করে জবরদস্তিতে তা মানিয়ে নেবে। না মানলে চূড়ান্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

উপযোগিতাবাদীরা, শব্দটিকে সম্প্রসারিত করে কর্তব্যের পেছনকার যে-কোনো শক্তিকেই 'সমর্থন' বলছেন। অর্থাৎ 'অভিপ্রায়'ও তাঁদের মতে সমর্থন কারণ কর্মের পেছনে অভিপ্রায়ের চাপ থাকে। উপযোগিতাবাদীদের দ্বৈত অভিপ্রায়টি হলো, সুখের আশা ও দুঃখের প্রতি বিরাগ। সুখদুঃখের ধারণা নানা রূপ নিতে পারে। কর্তব্যচ্যুত হলে শারীরিক যন্ত্রণা হয়, সমাজের বিরাগ থেকে দুঃখ আসে। আবার তেমনি স্বজন-বান্ধবদের সমর্থন পেলে

মন খুশিতে ভরে ওঠে। ইতিহাসের নজীরে যেমন জানি স্বর্গ ও নরকের কল্পনা কর্মের নিয়ন্ত্রক হয়েছে।

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বক্তব্যকে স্বীকার করা যায় না। কারণ, আমরা বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছি যে সমস্ত কর্মের উৎস জীবনের আত্মপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যেই কর্মের অভিপ্রায় ও উদ্দিষ্ট স্থির হয়। অন্য সব আলোচনার তাৎপর্য বড়োজোর ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক হতে পারে কিন্তু নৈতিক নয়। জীবনের ব্যবহারিক দিক থেকে এই সব বিচার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কিন্তু কর্মের উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বাহ্য অভিপ্রায় ও নিয়ন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত নয়।

উপযোগিতাবাদ স্বীকার করলে এবং উপযোগিতার ভিত্তিকে মনস্তাত্ত্বিক বললে জানতে হয় কোন্ অভিপ্রায়ে চালিত হয়ে ব্যক্তি সাধারণ সুখের সন্ধানে চলে। এই মতে ব্যক্তি সর্বদাই নিজের সর্বাধিক সুখ চায়। নিজের সুখ ছেড়ে সে তখনই সবার সর্বাধিক সুখ চাইবে যখন সে জানবে যে শেষ পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠ সুখ অন্য সবার মহত্তম সুখের সঙ্গে জড়িত। উপযোগিতাবাদীরা তাঁদের 'সমর্থন' তত্ত্বেই এই বক্তব্যটিকে উপস্থিত করেন।

জেরেমি বেণ্টাম যেমন বলেছেন মানুষের সর্ববিধ কর্মের চূড়ান্ত কারণ হচ্ছে সাধারণ সুখের কামনা, কিন্তু প্রযোজক কারণটি হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব সুখের বাসনা। বেণ্টাম লিখেছেন 'The happiness of the individuals, of whom a comnunity is composed, that is, their pleasures and their security, is the end and the sole end which the legislator ought to have in view ; the sole standard, in conformity to which each individual ought, as far as depends upon the legislator, to be made to fashion his behaviour. But whether it be this or anything else is to be done, there is nothing by which a man can ultimately be made to do it, but pain or pleasure.' বেণ্টাম মনে করেছিলেন যে সমাজের নৈতিকতা পরিবর্তিত করা যায় আইনের মাধ্যমে। তাই তিনি আইন প্রণয়কারীদের জন্য জনসাধারণের উপযোগিতাতত্ত্বটি উপস্থিত করেন। তাদের তিনি জানান যে আইনের লক্ষ্য হবে সবার সুখবিধান করা, দুঃখকে পরিহার করা। এই

বেণ্টামের চারটি নিয়ন্ত্রক

উপযোগিতার মানের সঙ্গে মিলিয়েই যেমন আইন প্রণয়কারী আইন করবেন তেমনি ব্যক্তিও তার কর্মকে ছকবে। বেণ্টাম এই সাধারণ নির্দেশের পর নানা ধরণের সুখ ও দুঃখকে তালিকাবদ্ধ করেন কারণ ওই তালিকা দেখেই তখন বিভিন্ন অভিপ্রায় ও অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্মকে বোঝা যাবে। এই ধরণের সুখ ও দুঃখকেই তিনি 'সমর্থক' বা নিয়ন্ত্রক বলেন।

বেণ্টামের মতে সমর্থন বা নিয়ন্ত্রণ চার ধরণের। ভৌত (physical), রাজনৈতিক (political), নৈতিক (moral) ও ধর্মীয় (religious)।

(ক) **ভৌত**—সাধারণভাবে প্রাকৃতিক কারণে যদি সুখ বা দুঃখ জীবনে আসে এবং ব্যক্তির স্বাধীন সঙ্কল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ না থাকে তবে তাকে ভৌত সমর্থন বলা হবে। অর্থাৎ ভৌত সুখ বা দুঃখের কার্যকারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় বা সচেতন কোনো কর্মের ওপর তা নির্ভর করে না। যেমন মদ খেয়ে মাতাল হবার যে দুঃখ। মদ খেতে থাকলে মাতাল হতেই হবে। এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে বলতে পারে মদ খাবো কিন্তু মাতাল হবো না। মাতাল তাকে হতেই হবে যেহেতু মদের মাদকতা নামক রাসায়নিক ক্রিয়া মানবদেহের ওপর ক্রিয়াশীল। মানুষ সজ্ঞানে তাকে কখনোই বাধা দিতে পারবে না। একমাত্র মদ না খেলেই সে ওই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারে।

(খ) **রাজনৈতিক**—শাসকের সার্বভৌম ইচ্ছার সঙ্গে যে সমর্থন জড়িত, যার নির্দেশে আমাদের বাহ্য কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে তাকে বেণ্টাম রাজনৈতিক বলেন। পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই শক্তি বা নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ হয়।

(গ) **নৈতিক**—অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন না থেকে ব্যক্তি যদি সচেতনভাবে নিজেই কর্ম স্থির করে তবে তাকে নৈতিক সমর্থন বলা হবে অর্থাৎ সে নীতির সমর্থনেই ভেবে নিজে কাজটি করছে।

তবে সবক্ষেত্রেই যে কর্তৃত্বের চরিত্র ও মানদণ্ডের চরিত্র মিলবে তার কোনো কারণ নেই। যেমন আমরা ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ড এক রকম করলাম অথচ সেই ভালোমন্দ অনুযায়ী কর্মের প্রেরণা এলো অন্য উৎস থেকে। যেমন অধ্যাপক প্যালি সুখকে সমস্ত কর্মের লক্ষ্য বলেছেন কিন্তু ঈশ্বরকেই সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা বলেছেন। ফলে ঈশ্বর ও সুখের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছেনা। আমরা জানতে পারছিনা সুখের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ কি ?'

বাহ্য আইনের ওপর নির্ভরশীল কর্তৃত্বের প্রসঙ্গ আছে রাষ্ট্রীয় নির্দেশের ক্ষেত্রে। বর্তমান কালে কোনো দার্শনিকই রাষ্ট্রীয় আইনের নির্দেশকে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলবেন না। ইংরেজ দার্শনিকরা অবশ্য অনেকে আইনের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্রকে গড়তে চেয়েছেন। যেমন উপযোগিতাবাদীরা। তাঁদের কাছেই নীতির 'সমর্থন' শব্দটি অত্যধিক প্রিয়। মিল ও বেণ্টামের আলোচনায় নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ আমরা পাচ্ছি অ-নৈতিক কার্যক্রমের ওপর। সুতরাং তাকে আমরা বলবো আবশ্যিকতা (must)। কখনোই ঔচিত্য বলতে পারবো না।

ধর্মীয়—অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়ন্ত্রণে কর্ম পরিচালিত হলে তাকে ধর্মীয় সমর্থন বলা হবে। যেমন স্বর্গ ও নরকের ভয়ে ব্যক্তির কর্ম পরিচালিত হতো। ক্যাথলিক চার্চের নির্দেশে অসংখ্য নরনারীর জীবনযাত্রা যেমন বর্তমানেও নির্ধারিত হয়। বেণ্টামের উদাহরণে জানি একটি লোক বাতি নেভাতে ভুলে গেলে যদি অগ্নিকাণ্ড হয় তবে অগ্নিকাণ্ডজাত শাস্তিকে বলা হবে ভৌত, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে শাস্তি পেলে হয় রাজনৈতিক, প্রতিবেশিরা যদি কোনো ব্যক্তির ওপর বীতরাগ হওয়ায় বিপদে সাহায্য না করে তবে সেই শাস্তিটি হবে নৈতিক এবং ঈশ্বরের ভয়ে যদি কোনো অন্যায় করে ফেলা হয় তবে তাকে বলা হবে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ।

জন স্টুঅর্ট মিল বেণ্টামের এই চারিটি সমর্থনকেই স্বীকার করেন কিন্তু তাদের নামকরণ করেন 'বাহ্য সমর্থন' এবং জানান এই কটির সঙ্গে বিবেকের অন্তঃস্থ নিয়ন্ত্রণও মানতে হবে। মিলই জানান যে বেণ্টামের 'সমর্থন' কটি প্রধানতই ভৌত। স্বয়ং বেণ্টামই স্বীকার করেন 'Of these four sanctions the physical is altogether, we may observe, the groundwork of the political and the moral ; so it is also of the religious, in as far as the latter bears relations to the present life. It is included in each of those other three. This may operate in any case (that is, any of the pains or pleasures belonging to it may operate) independently of **them** : none of **them** can operate by means of this. In a word the powers of nature may operate of them selves but

মিল বেণ্টামের নিয়ন্ত্রণকে বলেন বাহ্য'। সঙ্গে অন্তরকে জোড়েন

neither the magistrate, nor men at large, can operate, nor is God in the case in question supposed to operate but through the powers of nature." বেণ্টামের মতে সমস্ত কর্মই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মকেই একমাত্র মৌলিক নিয়ন্ত্রণ বলতে হয়।

মিল বাহ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যে অন্তঃস্থ সমর্থনকে জোড়েন তা হলো সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া। মিল একথা অবশ্য জানেন যে, কোনো নির্দিষ্ট মানস প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রাকৃতিক কার্যকারণ জড়িত, কিন্তু মানসিক ঘটনা নিছক প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। হেনরী সিজউইক বলেছেন যে বেণ্টামেরও মনে স্বাধীন নৈতিক সমর্থনের কথা উঠেছিলো। তিনি সেজন্যই একটা চিঠিতে 'sympathetic ও unsympathetic sactions' এর কথা বলেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা মানতে পারি না যে মিলের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি বেণ্টামেও পাওয়া যায়। তিনি কার্যত মিলের মত মনকে সক্রিয় ভূমিকা দিতে রাজী ছিলেন না। মিলের সমর্থনে মানসিক প্রক্রিয়ার কথা তুললেও এ-কথা সবার জানা যে মিলের প্রত্যয়গুলিও আসলে বাহ্য। কারণ আমরা যে-কোনো প্রত্যয়কেই মানসিক বলতে পারি যেহেতু দুঃখ বা সুখ মনেই ক্রিয়াশীল। এই অর্থে সব কর্মই মানসিক কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার উদ্দীপক কর্ম হিসেবে সর্বত্রই তা বাহ্য ঘটনা অর্থাৎ জীবনের নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য বিবেককে আমাদের সত্তার ধারক ও নিয়ামক বললে বিবেক কেবলমাত্র সমর্থক বা নিয়ন্ত্রক থাকে না, প্রকৃতই সত্তার ভিত্তি হয়। তারই নির্দেশে তখন সমস্ত কর্ম পরিচালিত হয়। এই অর্থেই বিশপ বাটলার বিবেককে ব্যাখ্যা করেন। শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিবেক কেবলমাত্র একটি শক্তি বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে কাজ করায়। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্যে, বিবেক ভয় দেখায় না, সত্তার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করে।

সমালোচনা—মানুষের নৈতিক কর্ম বিষয়ে মৌলিক ভ্রান্তির জন্যই বেণ্টাম ও মিল মনে করেছেন যে নৈতিক কর্মে কোনো শক্তির ছাড়পত্র প্রয়োজন করে। বেণ্টাম ও মিলের ছাড়পত্রে পার্থক্য থাকলেও কার্যত তাঁরা একই কথা বলেন যে শাস্তির ভয় ছাড়া কর্মের নৈতিকতা নেই। হুবহু এই কথাই প্রায় বলেছিলো এডিম্যানটাস সক্রাটেসকে যে মানুষ সামাজিকতা মানে কারণ তারা প্রলোভন বা ভয়ের কাছে মাথা নিচু করে। এই দুটোই অনুপস্থিত থাকলে

তারা আর সামাজিক হবে না। বেণ্টাম ও মিলের কর্মরত ব্যক্তিটিও তাই বাধ্যবাধকতায়, শাস্তির ভয়ে যদিও নৈতিক কিন্তু প্রথম সুযোগেই সে (শাস্তির ভয় মুছে গেলে) নৈতিকতা ত্যাগ করবে। বেণ্টাম ও মিলের এই বক্তব্য শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য হিসেবেই ভুল নয়, এঁরা মানুষের মৌল স্বরূপকেই বুঝতে পারেন নি এবং বিকৃত করেছেন।

মানুষ তার স্বাধীন সঙ্কল্প ও কর্মেই মানুষ। কোনো নিয়ন্ত্রণ বা শক্তির কাছে নতি স্বীকার করলে মানুষ প্রাণহীণ যন্ত্রে পরিণত হয়। মানুষের এই স্বাধীনতা প্রকাশিত হয় তার স্বাধীন কর্মে। সুতরাং স্বাধীন কর্মেই তাঁর সত্তা প্রকাশিত হয়। সত্তার আত্মপ্রকাশের সূত্রেই তার কর্ম নৈতিক হয়। যতই কর্ম তার সত্তাকে প্রকাশ করে ততোই ব্যক্তি পরিণত হতে থাকে এবং পরিণত ব্যক্তি যোগীর মত ক্রমশ সমস্ত রকম বন্ধনের সীমা পেরুতে থাকেন। অধ্যাপক মুরহেড বেশ বলেছেন যে 'Conduct which issues from regard for these sanctions is not morality, if by that we mean conduct which is morally approved.' অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য মতো কোনো রকম চাপ বা বাধ্যবাধকতাতেই নৈতিকতার ভিত্তিটি নষ্ট হয়। নিয়ন্ত্রণাধীন, পরিচালিত অন্ধ কর্মরত মানুষকেও যদি নৈতিক বলা হয় তবে স্বয়ংক্রিয় রোবটকেও নৈতিক যন্ত্র বলতে হবে। সুতরাং বেণ্টাম-মিলের নৈতিক 'সমর্থন' তত্ত্বটি সম্পূর্ণ স্ববিরোধী। কর্ম নৈতিক হলে তার কোনো সমর্থনের প্রয়োজন নেই, আর সমর্থিত নিয়ন্ত্রিত কর্ম হলে তাকে নৈতিক বলা হবে না।

মিল বিবেকের কথা তুলেছেন কিন্তু তার চরিত্র একটুও বুঝতে পারেন নি। বিবেক যদি মিলের অর্থে নিয়ন্ত্রক হয় তবে তার সঙ্গে সত্তার কোনো অন্তর্নিহিত যোগ নেই। কারণ, সে ভয় দেখিয়ে অবাধ্য ব্যক্তিকে 'নৈতিক' কাজ করাচ্ছে। ভয় প্রদর্শন করাই যদি বিবেকের কাজ হয় তবে বিবেক বাহ্য বস্তু যেহেতু মানুষের সত্তায় কেবলমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারে না। না পারার প্রাকৃতিক কারণ যাই হোক, দার্শনিক কারণটি এই যে সেক্ষেত্রে সত্তার কর্ম তার নিজস্ব আত্মপ্রকাশের রূপ পায় না। ভয়ে ভয়ে নিয়ন্ত্রণের ছক অনুসরণ করে মাত্র। এবং মনে মনে জানে যে এই নিয়ন্ত্রণটি তাকে জবরদস্তিতে পরিচালিত করছে। অর্থাৎ অবস্থাটি দাঁড়িয়েছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। বিবেক প্রভু ও ব্যক্তিটি তার দৈহিক মানসিক সত্তায় একটি পদানত দাস।

বিবেকের চরিত্র বোঝেন নি

বিবেক ও আত্মার দ্বৈতে বা বিরোধে ব্যক্তির সমস্ত কর্মই দ্বিধা বিভক্ত হয়। কারণ যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণেই জানা যাচ্ছে না কেনো সত্তা-বিরোধী এমন একটি 'বিবেক' ব্যক্তির জীবনে স্থান পাবে এবং ব্যক্তির উপর তার অখণ্ড নিয়ন্ত্রণ থাকবে। যদি সত্যই বিরোধ থাকে তবে সেই বিরোধে নিশ্চয়ই কখনো কখনো ব্যক্তির সত্তা বিবেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। মানুষের জীবনে সেই অবস্থাটি কি? বেণ্টাম ও মিল সে প্রশ্নের জবাব দেন না। কারণ অনুষঙ্গের নকীয় মনস্তত্ত্বে জারিত বেণ্টাম-মিল অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো মনকে কোনো সক্রিয় ভূমিকা দিতে নারাজ। তাই বিবেক স্বীকার করেও মিল বিবেক ও সত্তার সংযোগের কথা বুঝতে পারেন না। অথচ কর্মে বিবেকের স্থান একেবারে অস্বীকারও করতে পারেন না যেহেতু অভিজ্ঞতাবাদে মন সক্রিয় না হলেও অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আধার। এই সমস্ত দার্শনিক ভ্রান্তির জন্যই ওঁরা বাহ্য নির্দেশ ও শক্তির কথা তুলেছেন। ম্যাকেঞ্জি তাই চমৎকার বিদ্রূপ করেছেন যে মিলের কাছে বিবেকের শক্তি আছে 'in its string, in its power of making itself a nuisance'। অর্থাৎ পায়ে শিকল জড়াতে ও নোংরামি করতেই বিবেক আছে। বিশপ বাটলার বিবেক বিষয়ে মিলদের বিরোধের সমাধান জানান 'man by his nature is a law to himself' তত্ত্বে। তাই মানুষ যে নীতি অনুযায়ী চলে তার কারণ সে তার নিজের সত্তার জন্যেই চিন্তিত। তার সত্তার অংশ বিবেক তাকে প্রকৃত পরিণতির খোঁজ দেয়। বাটলারের মতে 'Your obligation to obey the law is its being the law of your nature····Conscience does not only offer itself to shew us the way we should walk in, but it is likewise carries its own authority with it, that it is our natural guide.'

মিল-বেণ্টাম মনকে সক্রিয় ভূমিকা দেন না

অনুশীলনী

১। What is meant by the sanctions of morality? Are they needed? (C. U. 1959)

২। What is meant by the sanction of morality? What would you accept as the ultimate sanction in moral life? Give reasons for your answer. (C. U. 1957

৩। What is a moral sanction? Are they necessary in Ethical life?

৪। What is a law? Discuss the nature of moral law.

চতুর্দশ অধ্যায়

নৈতিকতার মৌল প্রত্যয়

১। নৈতিকতার মৌল প্রত্যয় (Fundamental Postulates of Morality)।

প্রত্যেক শাস্ত্রের নিজস্ব আলোচনার বিষয় ও পদ্ধতি আছে। এই বিষয় ও পদ্ধতি আবার কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে। ওই প্রত্যয়গুলি স্ব-নির্ভর ও স্বাধীন। অন্য কোনো প্রত্যয়ের ওপর তাদের মূল্য বিচার নির্ভর করেনা। দার্শনিক কলিংউড তাদের নাম দিয়েছেন 'প্রি-সাপোজিশ্যন' বা প্রাক্-সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা, বিশেষ শাস্ত্রটির যাবতীয় সিদ্ধান্ত ওই প্রাক্ সিদ্ধান্তের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, পদার্থবিদ্যা প্রাকৃতিক শক্তির বিষয়ে চর্চা করে। কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের ভৌত রহস্য আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যাকে শুরুতেই আলোচনার কয়েকটি মূল সূত্র স্বীকার করে নিতে হয়। পদার্থবিদ্যার জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিকে মানা দরকার। প্রকৃতি আমাদের আলোচ্য অর্থাৎ যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ প্রকৃতি বললেই চলেনা, বলতে হয় প্রকৃতিতে নিয়মানুবর্তিতা আছে। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নামক প্রত্যয়টির বিশ্বাস থেকেই বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির বিশেষ নিয়ম খুঁজতে যান। আলোচনার আদিতেই এই নিয়মানুবর্তিতা স্বীকার না করলে কোনো চর্চা সম্ভব নয় যেহেতু বিশ্বজগত বিশৃঙ্খল হলে তাতে নিয়মের সন্ধান অবান্তর। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নামক বিশ্বাসটি কোথায় পেলাম? এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। ওটা সম্পূর্ণই আমাদের বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বরং বলা যায় প্রকৃতি বিষয়ক সমস্ত যুক্তিই নিয়মানুবর্তিতা থেকে আসছে।

নীতি যার ওপর নির্ভর করে কিন্তু যা প্রমাণ করা যায় না

প্রকৃতি যে সত্যিই নিয়ম মতো চলবে বা আমাদের ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করবে তার কোনো কারণ নেই। অথচ আমরা ধরে নিই যে প্রকৃতি নিয়মের বিরোধিতা করবেনা। পদার্থবিদ্যা এই নিয়মের রাজত্বকে আবার দেখে কার্যকারণের সূত্রে। কিন্তু কার্য-কারণ তত্ত্বটিও আমাদের ধারণা। অবশ্য এ-কথা বলা যায় যে বিশেষ ঘটনায় আমরা কার্যকারণের পরিচয় পেয়েছি।

কিন্তু তার জবাবে বলবো বিশেষ ঘটনা থেকে নির্বিশেষ নিয়মটি পাওয়া যায় না যেহেতু আমরা কোনো কালেই সমস্ত ঘটনাকে জানতে পারবো না। দার্শনিক হিউম কার্যকারণ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে তাই বলেছিলেন কার্যত কার্যকারণ বলে কিছু নেই, আমরা ওই কথাটা ধরে নিই মাত্র। হিউমের দার্শনিক তত্ত্ব যাই হোক আমরা পদার্থবিদ্যার জন্য প্রকৃতিকে অখণ্ড ও নিয়মাধীন মনে করি। সুতরাং বলা যায় পদার্থবিদ্যার আদি বিশ্বাসটি পদার্থবিদ্যার মৌল প্রত্যয়, যার ওপর পরবর্তী সমস্ত সূত্র প্রতিষ্ঠিত। আদি বা মৌল প্রত্যয়টিকে প্রমাণ করা যায় না কিন্তু না মানলে চিন্তাই সম্ভব নয়।

পদার্থবিদ্যা বা অন্য যে কোনো সংঘবদ্ধ জ্ঞানের জন্যেই যদি মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় তবে নীতিশাস্ত্রেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কাণ্ট তাই নৈতিকতার মৌল প্রত্যয়ের (postulates) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। ওঁর মতে নীতিশাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তিটি তৈরি হয়েছে ওই স্বীকৃত ধারণাগুলির ওপর। কাণ্ট তিনটি মৌল প্রত্যয়ের কথা বলেছিলেন, **স্বাধীনতা, ঈশ্বর** ও **অমরত্ব**। বর্তমান কালের আলোচনায় কাণ্টের মৌল প্রত্যয়কটির সবই মানা হচ্ছেনা, কিন্তু মৌল প্রত্যয় ব্যতীত কোনো আলোচনাও সম্পূর্ণ হচ্ছেনা। আলোচনার জন্য আমরা অন্য কয়েকটি প্রত্যয় তুলছি, নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞাতেই যাদের পরিচয় উহ্য আছে। আমরা নীতিশাস্ত্রকে স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্কল্পজাত উদ্দেশ্যমূলক কর্ম বলেছি। সুতরাং এই সংজ্ঞাতেই প্রধান কথা হচ্ছে 'স্বাধীন ব্যক্তি' শব্দ দুটি, তারপর আসছে 'সঙ্কল্পজাত ও উদ্দেশ্যমূলক কর্ম'। অর্থাৎ কর্মছাড়া নৈতিকতা যেমন সম্ভব নয় তেমনি কর্মকে বিচার করবার মানদণ্ডেরও প্রয়োজন। কর্মের উৎস হিসেবে তাই সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যর সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কিত। কারণ, ব্যক্তি যে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হয়না। সে তার পক্ষে অনুকূল ও প্রয়োজনীয় কর্মেরই কথা ভাবে। এই ভাবনা অনুযায়ী তাকে বাছাই করতে হয়। বাছাইয়ে তার অভিজ্ঞতা ও বোধ যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি তার স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়। স্বাধীনতাহীন বাছাইয়ের কোনো অর্থ নেই। কর্ম 'বাছাই ও স্বাধীনতার নিয়ন্তা হিসেবে আমরা ব্যক্তিকে ধরেছি। সুতরাং ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রের প্রধান অবলম্বন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তাই নীতিশাস্ত্রের সূত্রপাত যেহেতু কর্ম সবদাই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

কাণ্ট বলেন ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও অমরত্ব

আমরা তাই কাণ্টের মতোই তিনটি মৌল প্রত্যয়ের কথা তুলতে পারি। (ক) ব্যক্তি (খ) সঙ্কল্প ও (গ) স্বাধীনতা। প্রত্যয় তিনটি একটির সঙ্গে আর একটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

(ক) ব্যক্তিসত্তা (Personality of the Self)

নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তি প্রত্যয়টি দু ভাবে জড়িত। প্রথমত কর্তা হিসেবে ও দ্বিতীয়ত কর্মের লক্ষ্য হিসেবে। দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যয়টির ভিত্তি ঐক্যবোধ। ঐক্যের প্রয়োজন জ্ঞানের সুসংবদ্ধতার জন্য। সাধারণভাবে দৈনন্দিন অভি-জ্ঞতাতেই আমরা জানি যে পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুর প্রয়োজন। লক্ষ্যবিন্দুটির সঙ্গে মিলিয়েই বস্তুর স্থান, অবস্থান, গতি ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়। যেমন ধরা থাক, পথ চলতে চলতে আমরা কোনো একদিককে বলি বাঁদিক ও অন্যটিকে ডানদিক। অথচ আমরা জানি যে বাঁ বা ডানের কোনো নির্দিষ্ট ছাপ লাগানো নেই। আমাদের অবস্থান ও গতির সঙ্গে তার যোগ। অথবা যেমন সূর্যকে স্থিরবিন্দু হিসেবে ধরার ফলেই আমরা সময়ের হিসেব করতে পারি। বাস্তব পৃথিবীতে প্রবাহিত ঘটনা সমূহের জন্যই এই ব্যবস্থা।

নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। জীবনে অসংখ্য মানুষ অসংখ্য কাজ করছে, প্রতিমুহূর্তেই করছে। বলা চলে কর্মের প্রবাহ চলছে একটানা। আমরা এই কর্মপ্রবাহ থেকে কিছু কর্ম তুলে নিয়েই বিচার করি, ন্যায় অন্যায়ের ছাড়পত্র দিই। উচিত-অনুচিতের প্রসঙ্গে দেখেছি যে কর্মকে আমরা প্রধানত দু ভাবে দেখতে পারি। একটি পদ্ধতিতে কর্মের ফল কর্মের তাৎপর্যকে স্থির করে এবং অন্য পদ্ধতিতে কর্ম আপন স্বভাবেই ভালো বা মন্দ। আমরা এই দুটি বক্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করেও সিদ্ধান্ত করেছি যে শুধুমাত্র ফল বা শুধুমাত্র আত্মগত স্বভাব দ্বারা কর্মের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কারণ এই দুটি বিচারে কর্মকর্তাকে উহ্য রাখা হচ্ছে। উপযোগিতাবাদ অবশ্য অভিপ্রায়ের প্রশ্ন তোলে কিন্তু অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে দেখা যায় কর্মকর্তার নিজস্বতা বলে কিছু নেই, তিনি প্রধানতই প্রাকৃতিক কার্যকারণের অধীন।

সুতরাং ফল এবং কর্মের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য কর্মকর্তাকে বিচারের কেন্দ্রে বসাতে হয়। কারণ যিনি কর্ম করেন তাঁর জীবনেই ফলের প্রশ্ন। অর্থাৎ তিনি সুখবাদী হলে তাঁর সুখ তাঁরই কল্পনা মতো হবে। রামশ্যামের সঙ্গে তা মিলবে না। তিনি বোধিবাদী হলে কর্মের চরিত্র নিজেই বিচার করবেন। অর্থাৎ স্বভাবতই কর্ম যদিও ভালো বা মন্দ, কর্মস্তূপ থেকে তিনি

নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো ন্যায় বা অন্যায় কর্মকে বেছে নেবেন। ব্যক্তির ক্রম-বর্ধমান পরিণতির তাৎপর্য বিচার করেই কর্মের চরিত্র নির্ধারিত হয়। কাজেই **নৈতিক কর্মের অধিষ্ঠান হিসেবে ব্যক্তিকে কেন্দ্রস্থ প্রত্যয় গণ্য করতে হয়।**

এবারে প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তি কি? আমরা দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতায় নামচিহ্নটি দিয়ে এক একটি দেহধারী পুরুষ বা নারীকে ব্যক্তি বলে উল্লেখ করি। রাম একটি ব্যক্তি, সীতা একটি ব্যক্তি। নামচিহ্নটি ওই দেহধারীর শারীরিক ও মানসিক ঐক্যবদ্ধতা বোঝায়। রাম বলতে একটি নির্দিষ্ট মানুষকেই বোঝাবে। তাকে যথেচ্ছা পরিবর্তিত হলে চলবে না। অথচ এ-কথাও আমরা জানি যে বাহ্যত ঐক্যবদ্ধতা বলতে বস্তুর ক্ষেত্রে একটিমাত্র স্থির নির্দিষ্টতা কিছু নেই। কারণ জগতে যাবতীয় বস্তুনিচয় পরিবর্তনের অধীন। নির্দিষ্ট রাম তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা একই চেহারায় যেমন থাকে না, তেমনি একই মনেরও থাকেনা। অথচ তাকেই আমরা নির্দিষ্ট ঐক্যরূপ বা ঐক্যবদ্ধতা বলছি। সে নিজেই এই ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় দেয় 'আমি' শব্দটির দ্বারা। শত পরিবর্তনের মধ্যেও, আমৃত্যু সে প্রতিটি কর্মকেই 'আমার কর্ম' বলে। ফলে আলোচনার সূত্রে আমরা বর্তমানে একটি বিরোধী অবস্থায় এসে পড়ি। একবার বলছি নীতিশাস্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন আবার বলছি কর্মস্রোতে নির্দিষ্ট ঐক্যবদ্ধতা বলতে কিছু নেই।

ব্যক্তিত্ব একটি ঐক্য রূপ

দার্শনিক হিউম এই স্ববিরোধের কারণে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে আমি নামক প্রত্যয়টি একটি কার্যকরী ব্যবস্থা মাত্র। অভিজ্ঞতায় আমিকে পাওয়া যায় না। বাহ্য জগতের মতো মনেও ঘটনার জন্ম হচ্ছে এবং পরমুহূর্তেই তার লয় হচ্ছে। ঘটনার জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আমাদের অভিজ্ঞতায় কোনো অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট ঐক্যরূপ নজরে পড়েনা। অথচ 'আমি'কে অপরিবর্তনীয় হতে হয় কারণ 'আমি'ই একটি বিবর্তনশীল দেহে সমস্ত কর্মের কেন্দ্র। শৈশবের কর্মও যেমন আমার, তেমনি বার্ধক্যের শেষ কর্মটিও আমার। হিউম অভিজ্ঞতার নজীরে নিশ্চয়ই 'আমি'কে খুঁজে পাননা কিন্তু কাণ্ট দেখান যে সমস্ত ঘটনার মূলে 'আমি'কে না ধরলে কোনো ঘটনার তাৎপর্যই বোঝা যায় না। কাণ্ট এই স্বীকৃত 'আমি'কে বলেন 'Transcendental Principle of Apperception'।

হিউম আত্মকে মানেন না

হিউমের অজ্ঞেয়তাবাদ আমরা স্বীকার করতে পারি না কারণ 'আমি' প্রত্যয়টি না থাকলে প্রথমত বাহ্যতই কোনো ব্যক্তিকে অপর একটি ব্যক্তি থেকে তফাৎ করা যেতো না। দ্বিতীয়ত, স্মৃতির রহস্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, আত্মবিকাশের, পূর্ণ হবার চেষ্টা ও যন্ত্রণার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। প্রতিমুহূর্তেই আমি যদি পৃথক ব্যক্তি হই তবে পূর্ববর্তী কর্মের দায়িত্ব যেমন আমার থাকে না, তেমনি পরবর্তীর প্রয়োজনও কিছু নেই। সে ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কেনো ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হন বা রবীন্দ্রনাথ আরো ভালো কবিতা লিখতে চান—সে প্রশ্নের জবাব মেলে না। কাজেই ব্যক্তি প্রত্যয়টি বা **'আমি' পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংহত ঐক্যবদ্ধ সত্তা।**

এই সংহত ঐক্যবদ্ধ সত্তাকে ব্যক্তি বলছি। কিন্তু তাকে চিনবো কেমন করে? জড়বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক জগতের সব কিছুই ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন। জড়জগতের অংশ হিসেবে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাই কিন্তু তার সবটুকুই জড়ের নিয়মে চলে না। বাড়তি চৈতন্যের একটি নিয়মও তার মধ্যে কার্যকরী। চৈতন্যের প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে সমস্ত চৈতন্যবান প্রাণীই ব্যক্তি নয় কারণ নিম্নশ্রেণীর চৈতন্য নিজেকে পৃথক করে চিনতে পারেনা বা সমস্ত কর্মকেই নিজের বিচার বিবেচনার আলোকে স্থির করতে পারে না। সুতরাং চৈতন্যের পর্ববিভাগ করে আমরা বলবো ব্যক্তি আত্ম-সচেতন। অর্থাৎ **ব্যক্তির সচেতনতা কেবলমাত্র জগত-বিষয়ক নয়, তার সচেতনতা আত্মবিষয়ক।** ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাইরে তাকায় কিন্তু তার প্রধান কথাই নিজের ভেতরে তাকাবার বক্তব্য। ভেতরে তাকিয়ে সে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা জানে এবং সেই লক্ষ্য মতোই সচেতন ভাবে কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) **সঙ্কল্প (will)**—ব্যক্তি যদি নীতিশাস্ত্রের কেন্দ্র হয় তবে ব্যক্তির সঙ্কল্প তার ব্যক্তিত্বের প্রধান ভিত্তি। ব্যক্তিকে আমরা হিউমের মতো যেমন অস্বীকার করিনি তেমনি কাণ্টের মতো শুধুই একটি নৈয়ায়িক প্রয়োজন বলেও ধরছি না। হিউমে ব্যক্তির অস্তিত্বই তাই আর কাণ্টে তার অস্তিত্ব রক্ত মাংসের নয়, নিছক একটি প্রত্যয়ের। আমরা বলেছি ব্যক্তি জড় ও চেতন জগতের শ্রেষ্ঠ ফল কারণ তাতেই উভয় নিয়মের অধিষ্ঠান হয়েছে। **জড়ের নিয়মে সে প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর চৈতন্যের নিয়মে নিজস্বতায় মণ্ডিত।** তার চৈতন্য আত্ম-চৈতন্য। আত্ম চৈতন্যের প্রকাশ তার কর্মে। অনেক দার্শনিক বলতে

চেয়েছেন যে চৈতন্যের কোনো কর্ম নেই, চৈতন্য আপনাতে আত্মস্থ। কিন্তু আমরা জানি যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেতেই আত্মস্থ নয়, তাকে প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, প্রতি দণ্ডে পলে অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করতে হয়।

আমরা বলেছি যে ব্যক্তির কর্ম তার আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশ। ব্যক্তি তার কর্মে তার স্বকীয়তাই আরোপ করে যেহেতু তার কর্ম তার নিজের প্রয়োজনেই। যে কোনো ছোট-খাটো কর্ম থেকেই আমরা বিভিন্ন মানুষের পরিচয় পাই। ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যই সচেতন, সে যদি কর্মে তার আত্মকেই প্রকাশ করে তবে সে নিশ্চয়ই ভাবনা-চিন্তা অনুযায়ীই করবে। তার নিজস্ব, **বিবেচনা-প্রসূত চিন্তা যখন আত্মপ্রত্যয়ের স্তরে আসে তখন তাকে সঙ্কল্প বলা হয়।** ব্যক্তি সঙ্কল্পেই তার কর্মকে পরিচালিত করে। কর্মের সঙ্কল্পের প্রয়োজন কারণ নিছক বাসনা বা ইচ্ছার তেমন শক্তি নেই। ইচ্ছার জন্ম মৃত্যু ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কিন্তু ইচ্ছা যখন ব্যক্তির স্বীকৃত প্রত্যয় হয়, যখন তাকে কর্মে প্রকাশ না-করে আর উপায় থাকে না, তখনই সঙ্কল্পের জন্ম। ব্যক্তি তার সচেতন সঙ্কল্পেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। যেমন জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বহু ভারতীয় দেশপ্রেমিক, রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজকর্মী মর্মাহত হলেও সেই মর্মপীড়া প্রকাশের কথা বিশেষ ভাবেন নি, কিন্তু জাতীয় কবি শুধু মাত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্যেই তার খেতাব ত্যাগ করতে পারেন। বা দাঙ্গার সময় মহাত্মা গান্ধী অকুতোভয়ে নোয়াখালী যাবার কথা ভাবতে পারেন এবং চলে যেতে পারেন। এই যে **অকুতোভয় ও নিঃসংশয় মতিস্থিরতা তাকেই সঙ্কল্প বলে।** সঙ্কল্পের চরিত্র অনুযায়ী আমরা রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই।

ব্যক্তির কর্ম আত্ম-সচেতনতার প্রকাশ

স্বাধীনতা (Freedom)—সঙ্কল্পের সূত্রেই স্বাধীনতা আসে। স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তি সঙ্কল্পের কোনো প্রয়োজনই দেখবে না যেহেতু স্বাধীনতাহীন অবস্থায় তার কর্ম অন্য কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সে তখন পুতুল নাচের পুতুলের মতো নাচে। নাচবার জন্যে তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন করে না।

নীতিশাস্ত্রের কেন্দ্র ব্যক্তি আর ব্যক্তির তাৎপর্যই হলো তার **আত্মমুখীনতা।** আত্মমুখীনতা তার নিজস্ব রীতিতেই সম্ভব এবং তার রীতিটি থাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণে, অন্যের হাতে নয়। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত নীতিশাস্ত্রই সম্ভব নয়।

নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কর্মের ঔচিত্য। 'ঔচিত্য'কে আমরা পূর্বেই উপস্থিত দেখিনা, ঔচিত্যকে আবিষ্কার করতে হয়। এই আবিষ্কার হয় কর্মে। সুতরাং যে কর্ম কখনো সংঘটিত হয়নি ঔচিত্যের সম্পর্ক তার সঙ্গে। ঔচিত্য আবার নির্দিষ্ট একটি প্রস্তুত বস্তু নয় যে টুপ করে তুলে নেওয়া যায়। ঔচিত্য কর্মের চরিত্র ; কর্মের বিচার হয় আদর্শের দ্বারা। যদি নীতিশাস্ত্রে 'অস্তি' থেকে 'ঔচিত্যে' যাওয়া হয় তবে গোড়াতেই স্বীকার করতে হবে যে মানুষের ঔচিত্যে যাবার সামর্থ্য আছে অর্থাৎ ব্যক্তির বিভিন্ন কাজ করার ক্ষমতা আছে। আর ক্ষমতা স্বীকার করলে সঙ্কল্পকে মানতেই হবে।

তাছাড়া আদর্শকে আমরা বলেছি ব্যক্তির 'হয়ে ওঠা'। বর্তমানে ব্যক্তি যা নেই, তাকে তাই হতে হবে। যেহেতু তাকে হতে হবে সেহেতু তার হবার সম্ভাবনা ও শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং ঔচিত্য বিচার ও হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা মূল অবলম্বন। অন্যের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো ছাঁচের রূপ নিতে পারে কিন্তু তা অন্যের ছাঁচ, ব্যক্তির নিজস্ব প্রকাশ নয়। কর্মেই ব্যক্তি হয়ে ওঠে এবং ঔচিত্য বিচার তার হয়ে ওঠার পূর্ণতাতেই। প্রতিটি কর্মের বিচার তাই ব্যক্তির নিজস্ব এবং নিজস্বতা প্রকাশ পায় বাছাইয়ের স্বাধীনতায়। স্বাধীনতার অর্থ ব্যক্তির স্বাধীন সঙ্কল্প। মার্টিন্যু তাই সঠিক বলের যে 'Either Free will is a fact or moral judgment is a delusion.'

আদর্শ ব্যক্তির হয়ে ওঠা

২। সঙ্কল্পের স্বাধীনতা ও নির্বন্ধ (Freedom of will and Determinism)

সঙ্কল্পের 'স্বাধীনতা'র কথা বলেও আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করি, আমরা বলি 'কি করবো, এ আমার নির্বন্ধ'। সঙ্কল্পের স্বাধীনতা প্রকাশ করি এই জাতীয় বাক্যে যে 'আমার ইচ্ছে তাই করছি'। অথচ দেখা যাচ্ছে 'নির্বন্ধ' ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী দুটি প্রত্যয়। একটি মানলে অন্যটি সম্পূর্ণ অস্বীকৃত না হোক, তাদের সম্পর্ক স্থির করতে হয়। জানতে হয় কতোটুকু স্বাধীনতার সীমা ও কতোটুকু তার ওপর নির্বন্ধের প্রভাব। নির্বন্ধ তাকেই বলা হয় যা মানুষের ইচ্ছার ওপর কার্যকরী। নির্বন্ধকে দুভাবে দেখা যায়। একটি প্রাকৃতিক কার্য-কারণ ও অন্যটি অতি-প্রাকৃত কার্য-কারণ। নির্বন্ধবাদীদের মতে এই দুটোই মানুষের ইচ্ছা-শক্তিকে খর্ব করে। নির্বন্ধবাদের মতে ইচ্ছার যেহেতু স্বাধীনতা নেই, আমরা আমাদের কর্মের জন্যেও দায়িত্বশীল

নই। আমাদের কাজের প্রশংসা বা নিন্দা অর্থহীন কারণ উভয়তই আমি ও আমার কর্ম যেমন নিয়ন্ত্রিত, তেমনি নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারীও নিয়ন্ত্রিত। অথচ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি প্রশংসা ও নিন্দা। আমি যদি কোনো কাজকে উচিত বিবেচনা করতে না পারি, কেউ সেই কাজটি না করলে নিন্দা করতে না পারি তবে জীবনে কোনো নৈতিক বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু যদি বলি সে কেবল ক কাজটিই করতে পারে, তবে 'তার খ কাজটি করা উচিত ছিলো'—বাক্যটি একেবারেই অর্থহীন। অর্থহীন, কারণ আমরা যদি বলি, 'গাছের পাকা আমগুলো নিচে না পড়ে আকাশে উড়ে গেলে আর না-খাবার দুঃখ ছিলোনা' তবে বাক্যটির তাৎপর্য কি? প্রাকৃতিক নিয়মেই আম মাটিতে পড়বে। প্রকৃতির নিয়মের কোনো ভালোমন্দ ও উচিত অনুচিত নেই। নির্বন্ধবাদে নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজন ঘুচে যাচ্ছে।

অধিকাংশ দার্শনিক স্বাধীনতা ও নির্বন্ধের তর্কে দুটো গোষ্ঠীতে পৃথক হয়ে গেছেন।

স্বাধীনতার বিরোধী বক্তব্য (A Case against Free will)

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুক্তি আনা হয়।

(ক) **মহাজাগতিক যুক্তি (Cosmic Arguments)**—দার্শনিকভাবে প্রস্তাবনা করা হচ্ছে যে প্রত্যেক ঘটনার একটি নির্ধারক কারণ থাকবে। পরাবিদ্যার ভিত্তিতে দার্শনিকরা বলতে চান কারণহীন ঘটনা পৃথিবীতে নেই। সঙ্কল্পজাত প্রতিটি কর্মই ঘটনা সুতরাং তাদের কেউ না কেউ ঘটিয়েছে বা ঘটনার যথাবিহিত কারণ আছে। সুতরাং তাদের **সত্তা তাদের কারণের ওপরেই নির্ভর করে** যেহেতু কারণ ওই ঘটনার পূর্ণতাকে প্রকাশ করেছে। সুতরাং তারা মোটেই মুক্ত ও স্বাধীন নয়। ইংরেজ এক দার্শনিক যেমন লিখেছেন 'Acts of will are events; therefore they must have been caused; therefore they cannot be other than they are, their causes being what they are; therefore they are not free,'

এই বক্তব্যটি কার্যত জড়বাদী যান্ত্রিক বক্তব্যের উপসিদ্ধান্ত। যন্ত্রবিদ্যার মতে বিশ্বজগত একটি বৃহৎ যন্ত্রের মতো এবং জড়বাদ বলে জগতে যা কিছুই আছে তার চরিত্র এক টুক্‌রো বস্তু খণ্ডের মতো। সুতরাং জগতে সমস্ত ঘটনাই যদি যন্ত্রবৎ হয় তবে মানুষের, একমাত্র মানুষেরই ক্ষেত্রে সঙ্কল্পের স্বাধীনতা থাকবে এমন উক্তিটির নিছক অর্থহীন। কারণ সেক্ষেত্রে জগতে দুটি স্তরের

নিয়ম কল্পনা করতে হচ্ছে, একটি জড়ের জন্য ও অন্যটি প্রাণের জন্য। প্রথমটিকে বলতে হবে নিয়ন্ত্রিত (caused) বা সংঘঠিত ও অন্যটি অনিয়ন্ত্রিত বা অসংঘঠিত (uncaused)। এই দুটি স্তরের নিয়ম কল্পনা করলেই ভাবা যায় যে অসংঘঠিত স্তর কোনো একদিন সংঘঠিত স্তরকে প্রভাবান্বিত করবে এবং জগতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বৈজ্ঞানিকরা নিঃসন্দেহেই এমন অবস্থা কল্পনা করেন না। সুতরাং মানতে হবে যে সঙ্কল্পজাত কর্মও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রিত ঘটনার অনুরূপ।

(খ) **দেহ-মনের সম্পর্কের যুক্তি (Arguments from the relation between Mind and Body)**—জড়বাদী প্রত্যয়ে দেহ-মনের সমস্যা বিশেষ ভাবে মীমাংসিত হয়। ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহের ক্রিয়া নির্ধারিত। জড়বস্তুর মতো দেহের কার্য কারণ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, ভেষজশাস্ত্র তার প্রমাণ। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে মনের কি ব্যাখ্যা ? শারীরিক ভাবে জড়ের নিয়ম অনুযায়ী আমার মনে দেহের প্রভাব পড়ে। আঘাতে যেমন যন্ত্রনা পাই। অর্থাৎ শরীর ও মনের সমান্তরালবর্তিতা আছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই যে ঘুঁষির জোরে বা পিন ফুটিয়ে কি সর্বত্র ইচ্ছাকে ভাঙা যায় ? ইচ্ছাকে 'অজড়' ভাবলে তা কখনোই সম্ভব নয়। যেহেতু সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, কেমন করে জড় অ-জড়কে প্রভাবান্বিত করে ? অবশ্য আমরা ধরতে পারি যে, মন ও শরীরের গঠনে সমজাতীয় কিছু আছে এবং তা নিশ্চয়ই জড় বা জড়ধর্মী। সুতরাং মন অ-জড় হতে পারে না বা তাকে জড়েরই একটি রূপান্তর বলা যায়। বস্তুজগতে ঘটনা পরম্পর একটি সংঘঠিত অবস্থা থেকে আর একটি সংঘঠিত অবস্থায় চলে। জড়বাদীদের মতে মন এই ঘটনা পরম্পরা একটি সূত্র মাত্র। এই সূত্রটি তৈরি হয় স্নায়ু ও মস্তিষ্কে বাহ্য জগতের চাপে। দেহটি জড় সুতরাং বলতে হবে দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ হয়েছে দেহের নিয়ম মেনেই। সঙ্কল্পের কর্ম মানসিক ঘটনা সুতরাং তারা স্বাধীন নয়।

(গ) **মনস্তাত্ত্বিক ও দেহধর্মীয় যুক্তি (Psychological and Physiological reasons)**—পূর্ববর্তী বক্তব্যের একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানুষের চারপাশে বিস্তৃত জড়ের নিয়ম কার্যকরী। সুতরাং কর্মের সূত্রে মানুষ এই জড়জগতের অধীন। মানুষের সঙ্কল্প তাই তার বাইরের ঘটনা, এবং তার থেকে পৃথক ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত।

দ্বিতীয়ত, মানুষের সঙ্কল্প তাঁর অন্তঃস্থ ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত। জীববিদ্যার নজীরে বলা হচ্ছে যে মানুষের চরিত্র পূর্ব-নির্দিষ্ট। দেহতত্ত্ব বলে দৈহিক সংগঠনের সঙ্গে চরিত্রের যোগ। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড বা কোষ থেকে নানাধরণের রস-ক্ষরণ হয়ে আমাদের বিভিন্ন ঝোঁককে তৈরি করে। 'এনডোক্রিনোলজি' এ-বিষয়ে চর্চা করে।

প্রজননবিদ্যা তেমনি জানিয়েছে যে কোষের অন্তর্ভুক্ত জিন উত্তরাধিকারকে বহন করে এবং জিনের খেয়ালেই আমাদের দৈহিক রূপ থেকে মানসিক গঠন সবই স্থিরীকৃত হয়।

ফ্রয়ডীয় আবিষ্কারে ফলে মনস্তত্ত্ব বলতে চাচ্ছে যে অধিকাংশ মানসিক কার্য-কারণই অচেতন ও অবচেতন মনের খেলা, তুলনায় সচেতনতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অচেতন ও অবচেতন নানা বৃত্তির সংঘাত ও মিলনের ক্ষেত্র। ইতিপূর্বেই বলা হতো যে মানুষের চরিত্র নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর কারণ মানুষ পশু জগতের ঐতিহ্য বহন করছে। ফ্রয়ডের নেতৃত্বে মনস্তত্ত্ব ঘোষণা করলো মন চলে অচেতন ও অবচেতনের চালে। অর্থাৎ দর্শনের সচেতনতা ও আত্মসচেতনতা নিছক মনস্তাত্ত্বিক আদি বৃত্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মনস্তত্ত্বে সঙ্কল্পের অর্থ বড়োজোর 'Sublimated form of desire' অর্থাৎ বাসনার ভদ্র রূপ। এবং যুক্তিও বাসনারই একটি মার্জিত প্রকাশ।

অনেক দার্শনিক বলেছেন যে আমাদের কর্ম-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। হব্‌স, গ্রীণ ও জেমস প্রমুখ দার্শনিকদের বক্তব্য থেকে এমন ধারণা হয় যে আমার বর্তমান কর্ম প্রধানতই অতীত কর্ম দ্বারা নির্ধারিত। অর্থাৎ আমি যদি বিভিন্ন কাজের মধ্যে কোনো একটিকে বাছাই করি তবে আমার বাছাইটি, এই সব দার্শনিকের মতে, মোটেই সচেতন বিবেচনাপ্রসূত নির্ধারণ নয়। আমি কেবল অতীত জের টেনে চলেছি। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা নিয়ম মেনে চলি এবং নিয়মটি হচ্ছে আমাদের চরিত্রের। চরিত্র আবার গড়েছে পরিবেশ ও আমার প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক বৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক মিলে। এই নিয়মকে আমরা পুরোপুরি জানিনা এবং নিয়মটি যথেষ্ট জটিল। তবু নিয়মটি আছে এবং আমার কর্মে প্রকাশ পাচ্ছে। এই বক্তব্যটির নাম 'আত্মনির্ধারক' তত্ত্ব (self-deterministic theory)। অধ্যাপক টেলর খুব সুন্দর ভাবে এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে 'there is a formula which adequately describes my own personal moral

character, and that knowledge of this formula would make it possible to calculate the line of action I shall take in a difficult situation, exactly as the astronomer calculates an eclipse or a transit of Venus.' আমার চরিত্রের কার্যকারণকে এই তত্ত্ব এতোই স্পষ্টভাবে নির্ধারিত অবস্থায় জানতে পারছে যে গ্রহাদির পথ যেমন অঙ্ক কষে বলে দেওয়া সম্ভব তেমনি ভাবে আমার ভবিষ্যত কর্মকে ছকে দেওয়া যায়।

৩। স্বাধীন সঙ্কল্পের সমর্থন (A Case for Free will)

সঙ্কল্পের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দার্শনিকরা বিরোধীদের প্রতিটি মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা দেখান যে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে নিয়ন্ত্রণের অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিরা নিজেদের বিবেচনা প্রসূত ইচ্ছায় বাছাই করতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মাদিকে স্বীকার করেও মানুষের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) **মহাজাগতিক যুক্তির বিরুদ্ধে**—মহাজাগতিক যুক্তির বিরুদ্ধ বক্তব্যও বিশ্ব বিষয়ে একটি দার্শনিক মনোভাব। মহাজাগতিক যুক্তিতে বিশ্বকে একটি যন্ত্র মনে করা হয়েছে কিন্তু তার বিরোধী মতে জগতকে চৈতন্যের প্রকাশ বলা হচ্ছে। মহাজাগতিক মতে কোনো ঘটনাই কারণহীন নয়। কিন্তু দার্শনিক হিউম দেখিয়েছেন যে যুক্তিতে কার্যকারণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কার্যকারণের ধারণা আমাদের বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। কার্যকারণতত্ত্বে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন কল্পনা করা হয় অথচ এমন বন্ধনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন বলি ক হচ্ছে খ-এর কারণ তখন আমরা বোঝাতে চাই যে অতীতে ক ও খ কে সন্নিবর্তী (contiguous) হিসেবে দেখা গেছে মাত্র। কেনো যে ক ঘটনা ঘটলেই খ ঘটবে তার যুক্তি আজ পর্যন্ত কেউ পুরো দিতে পারেন নি। সুতরাং মহাজাগতিক যুক্তির প্রধান প্রতিপাদ্যটি যে জগত যন্ত্রবৎ কার্য-কারণ অর্থাৎ অতীত ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বীকার করা যাচ্ছে না।

(খ) **মনস্তাত্ত্বিক ও দেহধর্মীয় যুক্তির বিরুদ্ধে**—দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ে নির্বন্ধের যুক্তিটিও একটি গুপ্ত দার্শনিক বক্তব্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, সমস্ত বস্তুই তার অংশের দ্বারা গঠিত এবং তাদের যোগফলের চাইতে বেশি নয়; দ্বিতীয়ত, উৎপত্তির দ্বারা পরিণতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই

দুটি প্রসঙ্গ বর্তমান বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তি। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য বিজ্ঞান আলোচ্য বস্তুটিকে টুকরোটুকরো করে এবং জানতে চায় তার গড়নের রূপটি কি। ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যই বিজ্ঞান ধরে নেয় যে বস্তুর উৎপত্তিতেই তার পূর্ণ কারণটি নিশ্চিত আছে অর্থাৎ কারণটি অংশে অংশে দেখতে পেলেই বস্তুর সত্তাকে জানা যাবে। বিজ্ঞান মানুষকে একই ভাবে দেখতে চায়। কিন্তু দার্শনিকরা বলছেন যে মানুষ বিজ্ঞানের অর্থে বস্তু নয়। মানুষকে পুরো জানতে হলে তার ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হয় কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তার ব্যক্তিত্ব জানা যায় না। কারণ ব্যক্তির প্রতিটি সম্বন্ধ এক একটি নতুন সৃষ্টি' তাকে গোড়া থেকেই জানা যায় না। যেমন একটি উদাহরণ নিলে আমরা দেখতে চাই, ক পরের উপকারের জন্য কাজ করে কিন্তু খ কেবল মাত্র নিজের স্বার্থকেই দেখে। নির্বন্ধের যুক্তি অনুসারে ক ও খ জাগতিক কার্যকারণেই আগে থেকেই নির্ধারিত। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে ক ও খ বিভিন্ন কাজ করে কেনো? কি এমন নির্বন্ধ যে খ নিজের স্বার্থ দেখবে ও ক পরের স্বার্থ দেখবে? ঘটনার সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় এক এক ব্যক্তি এক এক রকম ব্যবহার করে ও কর্মকে বাছে। যদি বলা হয় যে এটাই তাদের চরিত্রের নির্বন্ধ তবে দেখা যাবে পৃথিবীতে যতোগুলো লোক আছে তাদের ততোগুলো চরিত্র ও নির্বন্ধ। সুতরাং সেক্ষেত্রে নির্বন্ধের অর্থ কি? আমরা বরং বলতে পারি যে কর্ম বাছাইয়ে ব্যক্তি তার বিবেচনা মতোই কাজ করছে।

মনস্তত্ত্বের ফ্রয়ডীয় প্রসঙ্গ বিষয়ে বলা যায় যে মানুষ সত্যিই অবচেতনের লীলা নয়। ফ্রয়ড নিজেই জানেন যে মানসিক ভাবে অসুস্থ লোককে তার রোগের কারণ বিষয়ে সচেতন করে দিলেই সে সুস্থ হয়। এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় মনের কাজ সচেতনতা ও বিবেচনা বিষয়ে। মনস্তত্ত্ব কার্যত অচেতন অজ্ঞাত কার্য-কারণকে সচেতন ও জ্ঞাত করবার শাস্ত্র। নির্বন্ধের বিরুদ্ধে আর একটি প্রতিবাদ এই যে নির্বন্ধ সত্ত্বেও এতো স্বাধীনতার ধারণা মানুষের মনে আছে কেনো? ধরা যাক নির্বন্ধের বক্তব্যটি পুরো সত্য। সুতরাং স্বাধীনতার ধারণাটিই নিছক মায়া মাত্র। এবারে প্রশ্ন উঠবে, স্বাধীনতার ধারণা তৈরি হচ্ছে কেনো? নির্বন্ধের যুক্তিতে এই প্রশ্নের জবাব নেই। কারণ নির্বন্ধের জগতে কোনো কিছুই নতুন কিছু তৈরি করতে পারে না যেহেতু সমস্ত ঘটনাই পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত। যাকে আমরা নতুন বলবো তা আগেই পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকছে। অথচ আমরা জানি জগতে নতুন

ঘটনা আছে এবং তা কখনোই আগেকার ঘটনায় স্থির থাকে না। যেমন ধরা যাক আমি একটি উপন্যাস লিখেছি। নির্বন্ধের জগতে নিশ্চয়ই উপন্যাসটি নতুন নয়। কিন্তু উপন্যাস সত্যই কি কেউ আগে লিখেছে? উপন্যাসটি কি আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, উপন্যাসটি লেখা হবার আগে তা কখনোই নির্ধারিত থাকে না যেহেতু লেখা শেষ হবার আগে পর্যন্ত লেখক জানেন না সত্যই কি লেখা হবে।

কাজেই স্বাধীনতার প্রত্যয়টি অস্বীকার করা যায় না এবং সব কিছু নির্বন্ধ দ্বারা নির্দিষ্ট এ-কথাও বলা চলে না। সঙ্কল্পের স্বাধীনতা ও নির্বন্ধের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে মানুষ যেমন পুরোপুরি স্বাধীন নয় তেমনি তার সমস্ত কর্মও পূর্ব-নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ যে পুরোপুরি স্বাধীন নয় তার প্রমাণ সে যা খুশি আচরণ করতে পারেনা। প্রথমত তাকে প্রকৃতির নিয়ম মানতে হয়; দ্বিতীয়ত, তাকে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বাঁচতে হয় বলে সে সামাজিক নিয়মকানুনকেও মানে। স্পিনোজা ও লাইবনিৎজ তাই বলেন যে অবাধ স্বাধীনতা শব্দটি অর্থহীন। তাঁদের মতে স্বাধীনতার সীমা জানতে পারলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীন আচরণ করতে পারে। যেমন, মানুষ হঠাৎ একদিন উড়বে ভাবলেই উড়তে পারেনা। কিন্তু যদি সে উড়তে না পারার কারণগুলো জানে তবে নিজের বুদ্ধিতে ক্রমশ সেই বাধাগুলো কাটিয়ে উড়বার চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং উড়তে না পারার কারণগুলো অজ্ঞাত থাকলে সে কখনোই উড়বার ব্যবস্থা করতে পারবে না। অর্থাৎ বাধা বিষয়ে জ্ঞান থেকেই স্বাধীনতার সূত্রপাত হয়। তাই স্পিনোজা চমৎকার বলেছেন যে স্বাধীনতার অর্থ হলো প্রয়োজনকে (অর্থাৎ বাধ্যবাধকতাকে) স্বীকার করা (Freedom is the recognition of necessity)

মানুষ পুরো স্বাধীন বা পুরো নিয়ন্ত্রিত নয়

পুরোপুরি নির্বন্ধ বলতেও তেমনি পৃথিবীতে কিছু নেই। এমনকি সমস্ত কিছুই ঈশ্বর ছকে রেখেছেন বলাও অর্থহীন কারণ ঈশ্বর সব ছকে রাখলেও মানুষকে তার কর্ম করতে হয়। গীতায় অর্জুনকে যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তোমার আত্মীয়রা দেখো আগে থেকেই নিহত হয়ে আছেন তবু তিনি বোঝান যে অর্জুনকেই তাদের মারতে হবে। কারণ ঈশ্বর নিজের হাতে কাজ করেন না, আমাদের কর্মের মধ্যেই তাঁর ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। কাজেই আমরা কাজ ফেলে বসে থাকলে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' শব্দটির কোনো অর্থ থাকেনা। যেমন ধরা

থাক, আমি ঈশ্বরের ভক্ত সুতরাং পরীক্ষার জন্য তৈরি না হয়ে তাঁর ভরসায় রইলাম যে পরীক্ষায় প্রথম হবো। আমি সত্যিই প্রথম হবো কি? নিশ্চয়ই হবোনা যেহেতু ঈশ্বর এসে পরীক্ষা দেবেন না। পরীক্ষা দেওয়াটা আমার কর্ম। সেই কর্মটি অসমাপ্ত থাকলে ফলটিও অসম্পূর্ণ থাকবে। কাজেই কর্ম করতেই হয়। কর্মের সূত্রেই বুঝতে পারা যায় যে মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। যে যার মতো কর্ম করে এবং সেই মতো ফল পায়। ঈশ্বর নিশ্চয় সবার মধ্যে আছেন কিন্তু সবাই একরকম লোক নয় বা একইভাবে কর্ম করেনা। কর্মের সঙ্গে তাই নৈতিকতার যোগ যেহেতু নৈতিকতায় প্রথমে বাছাই থাকে এবং বাছাইটি শেষ পর্যন্ত ভালো বা মন্দ হয় আদর্শের চরিত্র অনুযায়ী। কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বদলাতে থাকে। বদলটা তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। নইলে ব্যক্তিরা যে যা ছিলো তাই থাকবে। নির্বন্ধের সঙ্গে যোগ 'অস্তি'র অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা আছি। আর স্বাধীনতার সঙ্গে যোগ 'ঔচিত্যে'র। অস্তি থেকে ঔচিত্যে আসাটা তাই নৈতিক এবং সেই পরিবর্তনটিকেই নীতিশাস্ত্রে স্বাধীনতা বলা হয়। সুতরাং নৈতিক কর্মের আরম্ভে যেমন স্বাধীনতা থাকে তেমনি পরিণতিতেও স্বাধীনতা উপস্থিত। নির্বন্ধকে মেনেই স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রকাশ হতে থাকে এবং স্বাধীনতা প্রকাশের অর্থই হচ্ছে কর্মের মধ্যে তার বদলে যাওয়া।

বাছাইয়ের কারণে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা থাকে

অনুশীলনী

১। Explain the concept of Freedom as a postulate of morality.

২। What are the postulates of moral judgement? Why are they so called?

৩। Is freedom of the will essential to morality?

৪। What do you know about determinism as a philosophical concept? What should be the ideal relation' between freedom and determinism?

পঞ্চদশ অধ্যায়

শাস্তি

১। প্রাকৃতিক ও নৈতিক অনিষ্ট (Natural and Moral Evil)

অনিষ্ট শব্দটির ব্যাসবাক্য ভাঙলে পাই 'যা ইষ্ট নয়'। ইষ্ট শব্দটির সঙ্গে লক্ষ্য ও মঙ্গল জড়িত। মানুষের লক্ষ্য তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে শ্রেয়বোধ জড়িত। ইতিপূর্বেই আলোচনায় আমরা জেনেছি যে মানুষের লক্ষ্য দুটি: প্রেয় ও শ্রেয়। প্রেয় তার জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষার দ্রব্যাদি। শ্রেয় তার চূড়ান্ত লক্ষ্য, যা না হলে তার ব্যবহারিক জীবন খুশি থাকতে পারে কিন্তু আত্মা প্রীত হবে না। যেমন ধরা যাক, জীবনে বাঁচবার জন্যে আমার একটি ভালো চাকরীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটি সিদ্ধ হলে আমি খুশি হই এবং ভালোভাবে থাকতে পারি। কিন্তু ভালো চাকরী জুটলেই আমি ভালো মানুষ বা সৎ মানুষ হই না। চাকরীটি আমার প্রেয়। তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ সামান্য। চাকরী পাবার পরে আমি সৎ থাকতে পারি নাও পারি। কিন্তু শ্রেয় হচ্ছে মনুষ্যত্বের কথা। শ্রেয় আমাকে খাঁটি মানুষ (মানহুঁশ) হতে বলে, সৎ থাকতে বলে। সৎ না হলে আমার আত্মার বিকাশ হয় না। অথচ সততার সঙ্গে চাকরীটি বা প্রেয়র কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। চাকরী পাবার পরেও যেমন, তেমনি আগেও আমি সৎ বা অসৎ থাকতে পারি। যদি সৎ থাকি তবে বোঝা যাবে আমি শ্রেয় লক্ষ্যেই জীবন চালাচ্ছি। যেমন বুনো রামনাথ তেঁতুল পাতা খেয়েও সুখে জ্ঞানচর্চা করেছেন, সৎ মানুষ থেকেছেন। প্রেয় বস্তুর অপেক্ষায় সৎ থাকবার চেষ্টাকে থামিয়ে রাখেন নি। রামনাথের ইষ্ট ছিলো নির্মোহ নির্লোভ জীবনযাত্রা। তিনি অজস্র অভাবের মধ্যেও তাকে ত্যাগ করেন নি। অথচ প্রেয়র সন্ধানে ব্যস্ত অসংখ্য লোক অনায়াসে ইষ্টকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেনা, যেমন তেমন ভাবে প্রেয়কে নিয়েই খুশি থাকে।

কর্মে ইষ্ট বা আদর্শ থাকে

ইষ্ট বিষয়ক আলোচনায় অবশ্য মনে রাখতে হয় যে শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রেয়কে শ্রেয়র সঙ্গে মেলানো যায়। সেজন্যেই

ভারতীয় ঋষিরা নির্দেশ দিয়েছিলেন জীবনের অপবর্গকে ধর্মের দ্বারা পরিচালিত করতে হয়। ধর্মই শ্রেয় ও প্রেয়কে এক করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে লোভ ইত্যাদি ষড়রিপুর বশবর্তী হয়েই মানুষেরা শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে বিরোধ তৈরি করে।

ইষ্টকে ত্যাগ করলেই জীবন নীতিভ্রষ্ট হয়। নীতিভ্রষ্টতার অনিষ্ট প্রকাশিত হয় মানুষের কর্মে। তখন আর মানুষ ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিভাগ করেনা। নিজের স্বার্থে অন্যায় ও অনুচিত কর্মে মাতে। নীতিভ্রষ্টতা সর্বদাই মানুষের ইচ্ছাধীন। কারণ, মানুষ নিজের সঙ্কল্পেই সৎ বা অসৎ হতে পারে। সহজেই ষড়রিপুর দাস হতে পারে, আবার শত লোভের মধ্যেও জিতেন্দ্রিয় থাকতে পারে। মানুষ কী হবে তা সম্পূর্ণই তার হাতে। ইচ্ছেতেই সে দেবতা বা দানব হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা মেরে জাপানের দুটি জনবহুল নগর হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস করা হয়। বৈজ্ঞানিকরা মারণাস্ত্রটি বানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু বোমা ব্যবহার করা হবে কি হবেনা তা স্থির করেছেন ব্যবহার-কারীরা। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি তাঁরা সচেতনভাবে বিবেচনা করেই স্থির করেছেন। তাঁরা সঠিক জানতেন এই মারণাস্ত্রটির ধ্বংসক্ষমতা কতোটুকু ও কী পরিমাণ অসহায় নরনারীশিশু তাতে নিহত হবে এবং বংশ পরম্পরায় তার জের টানবে। অথচ যখন তাঁরা বোমা ফেলবার সিদ্ধান্তটি নিলেন তখন নৈতিক বিচারের সীমায় পা রেখে সচেতনভাবেই মানুষের চূড়ান্ত অনিষ্টকারী একটি কর্ম করলেন। সুতরাং জ্ঞানতই তাঁরা অন্যায় করলেন প্রেয়র জন্য। অথচ চূড়ান্ত ভোগলিপ্সু লালাবাবু একদিন বেলা পড়ে আসার সংবাদে একমুহূর্তে সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। তিনি প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়র খোঁজেই সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর কাছে শ্রেয় ও প্রেয়তে তখন কোনো তফাৎ থাকে না।

ইষ্টকে ত্যাগ করলেই জীবন ভ্রষ্ট হয়

নৈতিক অনিষ্টর সঙ্গে প্রাকৃতিক অনিষ্টের কথা ওঠে। প্রাকৃতিক অনিষ্টের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। যেমন জলপ্লাবন বা ভূমিকম্পে মানুষ মারা যেতে পারে। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনাজাত অনিষ্টের পেছনে যেহেতু সচেতন কোনো ভাবনা নেই, আমরা তাকে নৈতিক অনিষ্ট বলি না।

২। ভ্রান্তি (Error)

সাধারণভাবে ভ্রান্তি নৈতিক নয়। নিয়ম বিরোধী ঘটনাকেই ভ্রান্তি বলে। যেমন দুই আর দুইয়ের যোগফল হওয়া উচিত চার। আমি তিন বা পাঁচ

বললে যোগ ক্রিয়ার নিয়মটি নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত হয় না। কাজেই নিয়মের ভ্রান্তি ঘটে। এই ভ্রান্তিটি নিছক বুদ্ধি বিচারের বিষয়। কিন্তু তার সঙ্গে কর্মের ঔচিত্য জড়িত নেই।

অনেক সময় নৈতিক বিচারেও ভ্রান্তি ঘটতে পারে। যেমন ভালো ভেবে কাজটি করে দেখলুম ফলটি খারাপ হয়েছে।

এই ভ্রান্তিটি নৈতিক নয় কারণ আমি স্বেচ্ছায় তা করিনি। দুভাবে আমার ভ্রান্তি ঘটতে পারে। আমি না-জেনে কাজটি করেছি বা সিদ্ধান্ত নেবার সময় আমার অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সাধু ছিলো। এই দুটির কোনো ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিকে নৈতিক বলা হবেনা। নৈতিক অনিষ্টর সঙ্গে সজ্ঞান বিবেচনা জড়িত। সচেতন অন্যায় কর্মই একমাত্র নৈতিকভাবে দুষ্য।

সক্রাটেস সেজন্যেই বলতেন 'সততাই জ্ঞান' অর্থাৎ জানলে আর কেউ অন্যায় কাজ করে না। সক্রাটেস ধরে নিয়েছিলেন যে মানুষ অনিষ্ট পথে চলে না-জেনে। তাকে বুঝিয়ে দিলেই সে আর সেই পথে চলবেনা। সক্রাটেস এই বক্তব্যে নৈতিকতার চরিত্র ও অন্যায়ের চরিত্রকে ভুল বুঝেছিলেন। কারণ নৈতিকতা সর্বদাই স্বেচ্ছামূলক। জ্ঞানত অসংখ্য লোক অন্যায় কাজ করে বলেই নৈতিকতার কথা তোলা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে নৈতিক অনিষ্ট সর্বদাই ঘটছে।

পাপ প্রবণতা (Vice)

ধর্মভাবের বিরোধী মনোভাবকে অধর্মভাব বা পাপ-প্রবণতা বলে। পাপ-প্রবণতাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক কার্য-কারণ সম্ভূত বলছি না। কারণ সেক্ষেত্রে পাপ প্রবণতা ব্যক্তির সচেতন ঝোঁক বলে আর স্বীকৃত হবেনা এবং আমরা তাকে প্রকৃতি-জাত বৃত্তি হিসেবে বিচার করতে থাকবো। নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তি যেহেতু সচেতন স্বেচ্ছামূলক কর্ম, আমরা স্পষ্টই বলছি যে, পাপ-প্রবণতা ব্যক্তির সচেতন মানসিক ঝোঁক। এই ঝোঁকটি জেনেশুনেই প্রয়োজনের জন্য তৈরি করা হয়। সেজন্যেই পাপ-প্রবণতা নৈতিক ভাবে আলোচ্য। অথচ যে-ব্যক্তি মানসিক কার্য-কারণে পাপ-প্রবণ তাকে আমরা 'অসুস্থ' বলি এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই। অনেকের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে চুরি করাটা একটা অভ্যাস। তারা জানেও না কখন চুরি করছে বা কেনো চুরি করছে। চিকিৎসা করলেই তারা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আর কখনো এই অভ্যাসের দাস হয় না। এই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চুরিকে আমরা অনৈতিক কর্ম বলি না।

পাপাচার (Sin)

পাপ-প্রবণতা আচরণে প্রকাশিত হলে পাপাচার হয়। স্বেচ্ছায় অন্যায় কাজে লিপ্ত হলেই পাপাচার ঘটে। পাপ-প্রবণতা মানসিক অবস্থা আর পাপাচার কার্যকরী অবস্থা। প্রথমটি সুপ্ত কর্ম আর দ্বিতীয়টি ব্যক্ত কর্ম। পাপাচার কখনোই সচেতন পাপ-প্রবণতা ব্যতীত ঘটতে পারে না।

সুপ্ত অভিপ্রায় হিসাবে পাপ-প্রবণতা ও ধর্ম-প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য আছে। কাণ্ট যদিও শুভ সংকল্পকেই নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলেন তবু আমাদের মতে শুভ সঙ্কল্প ও শুভকর্মে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে সঙ্কল্প ব্যতীত কর্ম হয় না তবু সমস্ত সঙ্কল্পও কর্মে রূপান্তরিত হয় না। ইংরেজি প্রবচনটি এক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য যে 'there is many a slip between the cup and the lip' অর্থাৎ পাণপাত্র ঠোঁটে লাগবার আগেই অসংখ্য স্খলন হতে পারে। সুতরাং শুভ সঙ্কল্পের চাইতে তুলনায় শুভকর্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পাপ-প্রবণতার চাইতে পাপাচার মারাত্মকভাবে অনিষ্টকর। যেহেতু মানসিক বাসনাটি এক্ষেত্রে কার্যকরী ভাবে জীবনে প্রয়োগ করা হয়েছে।

অপরাধ (Crime)

অপরাধ পাপাচারেরই একটি অংশ। সচেতন যাবতীয় অন্যায় কাজকেই নীতিশাস্ত্রে পাপাচার বলা হয়। কিন্তু অপরাধ বলতে একমাত্র সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কর্মকেই বোঝায়। কার্যত অপরাধ তাই পাপাচারের তুলনায় অনেক বেশি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সমাজ বা রাষ্ট্র সমস্ত পাপাচারকেই শাস্তি দেয় না। যে-সমস্ত পাপাচারকে সমাজ শাস্তি দেয় তাকেই আমরা অপরাধ বলবো। উদাহরণত যেমন বলা যায় আমরা এমন অনেক অন্যায় কাজ করতে পারি যা আমার ইষ্টকে নষ্ট করছে, আত্মজ্ঞানের সমস্ত পথকে রুদ্ধ করছে কিন্তু সে-বিষয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের কিছু বলবার নেই। তখন তাকে পাপাচার বলা হবে কিন্তু অপরাধ বলা হবে না। ইন্দ্রিয় ভোগ সুখে কালাতিপাত করবো কি করবো না আমার স্বেচ্ছাধীন কর্ম। যদি সত্যিই তা করি তবে মহাপুরুষদের মতে আমার ইষ্টনাশ ঘটবে। সুতরাং এটা আমার পাপাচার। কিন্তু এ-বিষয়ে সমাজ সক্রিয়ভাবে কিছু করতে পারে না যেহেতু এটা নিষিদ্ধ কর্ম নয়।

৩। শাস্তি (Punishment)

শাস্তি বলতে বোঝা হয় নির্দিষ্ট কর্মের ফল। আমরা কথায় বলি 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। এই প্রবচনটির পেছনে মানুষের বিচিত্র একটি মানসিকতা কাজ

করে। তা হলো এই যে আমরা প্রতিটি কর্মের একটি নির্দিষ্ট ফল চাই। নিষ্কাম কর্ম নয়, কর্ম অনুযায়ী সামাজিক স্বীকৃতি ও সুযোগ। সৎকাজ করলে পুরস্কার ও অসৎ কাজে সমুচিত প্রতিদান। এই মানসিকতার সঙ্গেই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা জড়িত থাকে। অর্থাৎ অনেকটাই প্রলোভন জড়ানো হচ্ছে কর্মের সঙ্গে। এমনভাবে ভাবা হয় যে, অন্তত স্বর্গের প্রলোভনেও যদি লোকেরা সৎপথে চলতে থাকে। প্রাচীন ইহুদীদের ধর্মে এমন দান-প্রতিদানের উল্লেখ আছে। তাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একটি চোখের বদলে আর একটি চোখ দিতে হবে, দাঁতের বদলে দাঁত বা বাঙলা প্রবাদ মতো 'ইঁটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে'। খৃষ্টভক্তরা যেমন বলেন যীশু একদিন সমগ্র জগতের বিচারে বসবেন ও সেদিন সবাইকে কর্মের সমুচিত ফল দেবেন।

শাস্তি দুরকমের হতে পারে। একটি অপরাধরত ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়া ও অন্যটি সামাজিক প্রতিফল। অপরাধী যদি নিজের অপরাধ বুঝতে পারে তবে সে নিজেই অন্তর্দহনে পুড়তে থাকে। আমাদের শাস্ত্রে যার মহত্তম প্রমাণ দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণত হবার কাহিনী। এটাও একধরণের শাস্তি কারণ দস্যু রত্নাকর নিজের অপরাধের গ্লানি দূর করবার জন্য তিলে তিলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আত্মদহনের অধুনাতন শ্রেষ্ঠ কাহিনী পাওয়া যায় পৃথিবীর মহত্তম ঔপন্যাসিকদের অন্যতম ডস্টএভস্কির 'অপরাধ ও শাস্তি' গ্রন্থে।

অন্তর্দহন বা অপরাধীর আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে আমরা কি তবে অপরাধীর সামাজিক শাস্তি চাইবো না? এই প্রশ্নের সূত্রেই সামাজিকভাবে বাহ্য শাস্তির ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। কারণ অনেকেই বলেছেন অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে তারা দুজনেই সমভাবে অপরাধী। রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছেন:

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

সামাজিক বা বাহ্য শাস্তির কথা ওঠে এ-কারণেই যে মানুষ সামাজিক জীব এবং তার সমস্ত কর্মই সমাজের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ব্যক্তির কর্মই অন্য অসংখ্য ব্যক্তির জীবনকে জড়ায় ও তাদের কর্মকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং একটি অন্যায় থেকে সহস্র অন্যায়ের সূত্রপাত হয়। সমাজে অন্যায়কে যদি বন্ধ করতে হয় তবে অন্যায়ের উৎসেই আঘাত হানা দরকার। অর্থাৎ দুষ্কৃতিকারীকে অন্যায়ের সঙ্গেসঙ্গেই থামিয়ে দিতে হবে। তাকে থামানো সম্ভব হয় যদি সে

অপরাধকে নিজেই বর্জন করে। কিন্তু মানুষ যেহেতু অধিকাংশতই সচেতনভাবে অন্যায় করে সুতরাং সে নিজে থেকেই সর্বদা পাপাচার বন্ধ করে না। তখন তাকে সামাজিকভাবে শাস্তি দিতে হয়।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে সামাজিক সমস্ত পাপাচারই স্বেচ্ছা-মূলক নয়। অনেক সময় অপরাধী ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে অন্যদের সহযোগী করে নিতে পারে। বা দলের মধ্যে বিবেচক ব্যক্তিও অনেক সময় অপরাধ করে বসে। তখন প্রকৃত অপরাধী ও সহযোগীদের মধ্যে পার্থক্য করতে হয় বা ভিড়ের চরিত্র বিষয়ে অবহিত হতে হয়। আমরা তাই একমাত্র সচেতন বিবেচনাপ্রসূত পাপাচারকেই নৈতিকভাবে বিচার করবো এবং শাস্তির কথা বলবো।

৪। শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদ (Theories of Punishment)

অপরাধীর শাস্তি বিষয়ে তিনটি নীতি প্রচলিত। (১) প্রতিরোধাত্মক, (২) সংশোধনাত্মক ও (৩) প্রতিশোধাত্মক।

(ক) **প্রতিরোধাত্মক (Preventive or Deterrent):** এই মতে প্রকৃত অপরাধীর চেয়ে সম্ভাব্য অপরাধীরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই শাস্তির লক্ষ্য প্রকৃত অপরাধী নয়। অপরাধীকে তো নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে যেহেতু সে পাপাচার করেছে কিন্তু এমন ভাবে শাস্তি দিতে হবে যেনো ভবিষ্যতে অন্য কেউ আর এমন অপরাধ করতে না পারে। শাস্তি দেবার অর্থ তাই সম্ভাব্য অপরাধ নিবৃত্ত করা।

এই বক্তব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত এই যে এই মতে অপরাধী কোনোদিনই বিনা শাস্তিতে ছাড়া পাবে না। কারণ সে নিছক উপলক্ষ মাত্র। তাই উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্যে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। অপরাধ যতোই লঘু হোক না কেনো সে শাস্তি না পেলে অন্যরা এ বিষয়ে কোনো সংবাদই পাবে না।

এই বক্তব্যে মানুষের স্বকৃত অপরাধ স্খলন অপেক্ষা শাস্তি বা বাধ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি।

সমালোচনা—(ক) এই মতের সমর্থকরা কাণ্টের মানুষ বিষয়ক বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা মানছেন না। কাণ্ট মানুষকে একটি পরিপূর্ণ সত্তা হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছিলেন, নিছক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে ভাবতে বলেন নি। কারণ মানুষই একমাত্র স্বাধীন শুভ সঙ্কল্পের অধিকারী এবং তার কর্মে শুভ

সঙ্কল্পের প্রেরণা থাকে। অথচ অন্যদের অপরাধ থেকে বিরত করবার জন্য শাস্তি দেবার কথা তুললে মানুষকে হাতিয়ার বা যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মানুষ যন্ত্র নয়, সে নিজের কর্মেই নিজের আত্মাকে প্রকাশ করে। সুতরাং তার কৃতকর্মের শাস্তি সে নিজের জন্যেই নেবে, অন্যের জন্য নয়।

(খ) অন্য কোনো উদ্দেশ্যের বাহন হিসেবে অপরাধীকে যদি শাস্তি গ্রহণ করতে হয় তবে কোনোদিনই সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। অর্থাৎ এমন অনেক অপরাধ আছে যা শাস্তি ছাড়াই দূর করা যায়। অথচ অন্যদের শিক্ষা দেবার কথা থাকলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সে ক্ষেত্রে সামান্য অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ায় অপরাধী মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এমন আঘাত পাবে যে তার উপকারের চাইতে অপকার হবে বেশি। সে হয়তো পরিবর্তিত হবার বদলে আরো দাগী হয়ে উঠবে। কার্যত এমন ঘটনা আমরা অসংখ্য ঘটতে দেখি।

কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন যে লঘু অপরাধের লঘু শাস্তি দেওয়া হবে সুতরাং আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু তারা লক্ষ্য করছেন না যে প্রথম অপরাধে বহু ক্ষেত্রেই অপরাধী নিজেই মর্মপীড়িত থাকে। সেই মর্মপীড়ার ওপর সামাজিক লজ্জা ও গ্লানি চাপালে তার মনুষ্যত্বের এতোই অবমাননা ঘটতে পারে যে সে আর চরিত্র পরিবর্তনের কথা ভাবতে রাজী হয় না। সমাজের ওপর প্রতিরোধ স্পৃহা থেকেই আরো অপরাধী হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর মশায় তাই বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বালবিধবাদের মানুষের মতো বাঁচবার সুযোগ না দিয়ে সমাজ এমন শাস্তি দিচ্ছে যে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

এই মতের সমর্থকরা যে এমনভাবে ভাবছেন তার কারণ তারা মানুষের চরিত্রের ওপর নির্ভর না করে বাহ্য অবস্থার ওপর নির্ভর করছেন বেশি। অথচ মানুষ যন্ত্র নয় যে একটি কাজ একই রকমে চিরকাল করবে। মানুষ বরং নিজের মনেই অপরাধ বুঝতে পারলে সঙ্কুচিত হয়, লজ্জিত হয় ও আত্মদহনে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। নতুন অপরাধে আর কখনো মাতে না। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর, তার মনুষ্যত্বের ওপর নির্ভর করলে আমরা হৃদয় পরিবর্তনের কথাই ভাববো, তাকে শাস্তির জবরদস্তিতে বাধ্য করাবার কথা ভাববো না। প্রতি-রোধাত্মক মতবাদ দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হয়ে ওঠার গল্পের চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাস করছে দণ্ড ও গারদকে। আচার্য বিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষায় তাই দুঃখ করে বলেছেন যে মধ্যপ্রদেশের চম্বলনদীর ডাকাতদের হৃদয়পরিবর্তনের জন্য তিনি গিয়েছিলেন কিন্তু সরকার তার বদলে তাদের

গারদে পুরে দিয়েছে। তাদের মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন করার বদলে আরো বেশি অমানুষ হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হিংসা কেবল হিংসারই জন্ম দেয়। মনুষ্যত্বের জন্য মনুষ্যত্বের প্রয়োজন।

(খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ (Reformative Theory)

সংশোধনাত্মক মতবাদ বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। এই মতবাদে মানুষকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তি বিশেষ মনে করা হয় এবং তার কর্মকে তারই আত্মপ্রকাশের মাধ্যম মনে করা হয়। কর্মে যদি বিচ্যুতি ঘটে, যদি সচেতন ভাবে ব্যক্তি অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয় তবে নীতিশাস্ত্রকে এই লোকটি বিষয়ে চিন্তিত হতে হবে। কারণ কর্মের উৎস ওই ব্যক্তিটি। কর্মের গুরুত্ব বা লঘুত্ব বিচার যাই হোক, লোকটির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হবে তাকে সংশোধনের জন্য। সুতরাং শাস্তির পরিমাণ ও চরিত্র নির্ভর করবে সংশোধন ব্যবস্থার চরিত্রের ওপর। অর্থাৎ শাস্তি কার্যত কোনো রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নয়। তাকে শোধরাবার জন্য যতোটুকু বিধিনিষেধ ন্যূনতমভাবে প্রয়োজন ততোটুকুই গ্রহণ করা হবে। হাসপাতালে যেমন অসুস্থ লোকের ওপর প্রয়োজন মতো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

বর্তমানে সমাজতত্ত্ব ও অপরাধ বিজ্ঞান ব্যক্তির অপরাধকে প্রধানতই সমাজের অন্যায়-অবিচারের দিক থেকে দেখছে। এই শাস্ত্রাদির মতে ব্যক্তির অপরাধ প্রবণতা তৈরি হয় অনৈতিক সমাজের নানা অসঙ্গতি ও দুর্নীতিতে। সুতরাং যতোদিন না সমাজের পরিবেশকে বদলানো যাবে ততোদিন এইসব অপরাধ কমবেশি থাকবে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষেই বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত রাইনহোল্ড নীবর তাঁর একটি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'মরাল ম্যান এণ্ড ইম্‌মরাল সোসাইটি'—'অনৈতিক সমাজে নৈতিক মানুষ। কাজেই ব্যক্তির কাঁধে অপরাধের দায়িত্ব চাপিয়ে তাকে শাস্তি দিলে সমাজের উপকারের বদলে অপকারই হবে বেশি। ব্যক্তিকে বরং মানুষ হবার মতো সুযোগ দিলে সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে এবং সমাজে নৈতিক মানুষ হিসেবে স্থান নেবে।

সমালোচনা—এই মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এই যে, মানুষের ওপর আস্থা রাখতে হবে। মানুষেই মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা আছে, অন্য জীবের নেই। তাকে মানুষ হবার সুযোগ দিলেই সে মানুষ হবে। সুযোগ না দিয়ে মনুষ্যত্ব দাবি করা শুধু অর্থহীন নয়, অমানবিক। সামাজিক মঙ্গলের উদ্দেশে সামান্য বা গুরুতর অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া যায় কিন্তু আমাদের বিবেচনা

করা উচিত আমরা কী চাচ্ছি। অপরাধের শাস্তি না অপরাধীর পরিবর্তন ? সমাজের দিক থেকে প্রাথমিক ভাবে নিশ্চয়ই দাবি করা হবে অপরাধের শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে অপরাধ করে অপরাধী সুতরাং শুধুমাত্র অপরাধের শাস্তি দিলে ভবিষ্যত অপরাধের সম্ভাবনা দূর হয় না। অথচ অপরাধীকে সংশোধন করতে পারলে অপরাধের উৎসটি বন্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত তাতেই সমাজের মঙ্গল সবচেয়ে বেশি। অনেক দার্শনিক শাস্তির প্রাথমিক সুবিধে দেখে বারবার ঘোষণা করেন যে শাস্তি অপরাধীকে দিতেই হবে। তার শারীরিক শাস্তির ফলে সে নিজের কৃতকর্মের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে সহজেই বলা যায় যে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের জেলখানার হিসেব করলে দেখা যাবে শাস্তি গ্রহণের ফলে অতি সামান্য সংখ্যক অপরাধী অপরাধ করা বন্ধ করেছে। শাস্তিতে বরং উল্টো ফল ফলেছে, জেলখানা সর্বদাই ভর্তি থেকেছে।

মহাত্মাগান্ধী ও বিনোবা ভাবের মতো অহিংসাবাদী মহাপুরুষেরা বলেন যে শাস্তির মধ্যে হিংসার ভাব আছে। দু-ভাবে তা বোঝা যায়। শাস্তি নিজেই হিংসামূলক যেহেতু তা অপরাধীকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। যে-শাস্তি দেয় (অর্থাৎ আরক্ষা বাহিনী) তার মনে নিপীড়িত ব্যক্তির কষ্টে একটা আনন্দ ও কর্তৃত্বের ভাব ফোটে। যার ফলে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মানসিকতা বুঝতে পারে না। সুতরাং হিংসা থেকে আরো হিংসার জন্ম হয়। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি শাস্তি ব্যবস্থার অমানুষিকতায় প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং আরো অন্যায়ের পথে পা বাড়ায়। যীশু খৃষ্ট তাই প্রাচীন ইহুদীদের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার বদলে প্রেমকেই জীবনের কেন্দ্র করেন এবং বলেন 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো', 'একগালে চড় মারলে আর একটি গাল তার দিকে ফিরিয়ে দাও'। অর্থাৎ তিনি বোঝান যে আমাদের মৈত্রীভাবে অপরাধীর প্রবণতাকে আমরা শান্ত করতে পারি। নইলে একটি চড়ের বদলে আরো একটি বাড়তি অসংখ্য চড়ের সৃষ্টি হবে। বুদ্ধদেবও একই রকমে প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর কথা বলেন। মহাপুরুষেরা আরো বলেন যে ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান এবং আমাদের এমন অধিকার কেউ দেয়নি যে অন্যদের শাস্তি দিতে পারি। আমরা কেবলমাত্র পরস্পরকে ভালোবাসাই দিতে পারি।

সুতরাং সংশোধনাত্মক মতবাদ সঠিকভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের বক্তব্যকে গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, সমাজ-তাত্ত্বিকদের ঘোষণা মতো সমাজটা খারাপ বলেই শাস্তি বন্ধ করতে বলা হচ্ছে না। সমাজতাত্ত্বিকরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র অর্থে সংশোধনাত্মক শাস্তির কথা বলেন। ওঁদের মতে সমাজ ভালো হয়ে গেলেই আর শাস্তির প্রসঙ্গ উঠবে না। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হলেই কি আর সংশোধনাত্মক কথা ভাবা হবে না? তাছাড়া অপরাধ বিজ্ঞানের মতো সমস্ত অপরাধকেও আমরা মানসিক রোগ বলতে রাজী নই। কারণ যা রোগ তা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য নয়। সচেতন ভাবে অপরাধ করলেই নৈতিক বিচার ও শাস্তির প্রশ্ন ওঠে।

এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা বন্ধ করতে হবে কারণ নিহত ব্যক্তির সংশোধন সম্ভব নয়।

(গ) **প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory):** অপরাধ তখনই হয় যখন আমরা নৈতিক নিয়মকে ভঙ্গ করি। সুতরাং নিয়ম ভঙ্গের দায়িত্ব আমাদের বহন করতেই হবে। কর্ম যেমন আমাদের নিজস্ব বিবেচনার বিষয় তেমনি কর্মের ফলাফলও আমাদের। সুখকর ফল ঘটলে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করি কিন্তু অন্যায়ের ফলে যে ক্ষতি হয় তা কে গ্রহণ করবে? এই মতে, অন্যায়ের ফল কর্মকর্তাকেই স্বীকার করতে হবে, বহন করতে হবে। কারণ পরিপূর্ণ ফলটির ভালো অংশটুকু নিয়ে সরে থাকলে সমাজ ক্ষতিকারক ফলে ছেয়ে যাবে। তাছাড়া ন্যায়ের যুক্তিতে কর্ম ও ফলে কোনো বিভাগ করা সম্ভব নয়।

অপরাধীকে তাই শাস্তি পেতেই হবে। নৈতিক নিয়মের শাসন অব্যাহত রাখা ছাড়া শাস্তির আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কারণ নীতির রাজত্ব দুর্বল হলে অপরাধ-প্রবণতা বাড়বে ও সবাই চাইবে শুধুমাত্র শুভ ফলটুকু নিয়ে সরে পড়বে।

এরিস্টটল বলতেন, শাস্তি নেতিবাচক পুরস্কার এই কারণে যে শাস্তির মধ্য দিয়ে সে তার অন্যায় বুঝতে পারবে ও পরিশেষে অন্যায় থেকে দূরে সরে থাকবে। শাস্তি তাকে তার প্রকৃত সত্তা বুঝতে সাহায্য করছে। হেগেলও এরিস্টটলের মতো কথা বলেন। ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলী বলছেন যে অপরাধী শাস্তিকে আহ্বান করেছে, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কাণ্ট বলছেন অপরাধী অপরাধের মধ্যে তার নিজের ক্ষতি করে, সমাজেরও

ক্ষতি করে। সুতরাং তাকে শাস্তি দিলে তার নিজের যেমন মঙ্গল তেমনি সমাজেরও মঙ্গল।

হেগেল-ব্রাডলীর এই তত্ত্বের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি হচ্ছে এই যে তাঁরা নৈতিক কর্মের চরিত্রকে সঠিক গ্রহণ করেননি। আমরা বলেছি যে নৈতিক কর্ম স্বেচ্ছাধীন ও সঙ্কল্পজাত। তাতে বাধ্যবাধকতার কোনো ক্ষেত্র নেই। নৈতিক নিয়ম তাই ভাঙা যায় কিন্তু পরিবর্তিত করা যায় না অথচ হেগেলরা বলছেন যে নিয়মভাঙার সঙ্গে শাস্তি জড়িত থাকবে, প্রয়োজন হলে মৃত্যুদণ্ডও দিতে হবে। অর্থাৎ নৈতিক কর্ম বাধ্যবাধকতা হীন বলেই হেগেল তাকে শাস্তির ভয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন। ব্যক্তিরা তাই শাস্তির ভয়ে নৈতিক কর্ম করবার চেষ্টা করবে বা অনৈতিক কর্মের দিকে ঝুঁকবে না। একমাত্র শাস্তির ভয়েই যদি মানুষ নৈতিক থাকে তবে সমাজে প্রথম সুযোগেই মানুষ অনৈতিক হবে এবং শাস্তি দাতার চোখে ধুলো দিয়ে অন্যায় কাজ করবার চেষ্টা করবে। 'আত্ম'র প্রয়োজনেই যে অন্যায় না করবার কথা ওঠে তা হেগেল-ব্র্যাডলী সঠিক বলতে পারছেন না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও মহাপুরুদের দিক থেকে বলা যায় যে কোনো মানুষকে শাস্তি দেবাব অধিকার কেউ পায়নি। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে সবাই কর্মের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু শাস্তি দেবার কর্তৃত্ব মানুষের হাতে থাকতে পারেনা যেহেতু সে অন্য মানুষের বিচারক নয়। সে কেবলমাত্র নিজের বিচারক হতে পারে। নিজের কর্মের শুভাশুভ ভেবে নিজেকে নিয়েন্ত্রণ করতে পারে। অন্যের দায়িত্ব তার হাতে নেই। মানুষ একমাত্র পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে, তাকে প্রেম দিতে পারে যেমন প্রেম দিয়েছেন বুদ্ধদেব, যীশু খৃষ্ট ও মহাপ্রভু চৈতন্য। বিচারের ভার ঈশ্বর স্বয়ং নেবেন। একমাত্র চূড়ান্ত অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায় মানুষ ভাবতে পারে যে প্রয়োজনে আমি মৃত্যুদণ্ড দেবো। প্রতিশোধাত্মক তত্ত্বে তাই প্রাণদণ্ড স্বীকৃত। কিন্তু দার্শনিকরা একবারও ভাবেননি যে আমরা শত চেষ্টাতেও একটি প্রাণ দিতে পারিনা অথচ ছিনিয়ে নিতে অগ্রসর হচ্ছি। এই মতবাদে মানবিক সম্পর্কের মৌল সত্যটিকেই অস্বীকার করা হচ্ছে কারণ মানুষকে পরিবর্তনশীল সচেতন ব্যক্তি ভাবা হচ্ছেনা। তাই শাস্তির মধ্যে তাকে মানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই মতবাদের দুটি রূপ সম্ভব। (ক) কঠোর (Regoristic) ও লঘু (Mollified)।

(ক) কঠোর—অপরাধের পরিমাণ ও চরিত্র অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। অপরাধ গুরুতর হলে শাস্তিও কঠোরতম হবে। এই তত্ত্বে পরিবেশ বা অবস্থার কথা ভাবা হয় না। অপরাধ সর্বদাই অপরাধ, কারণ যাই হোক। যে কোনো অপরাধের জন্যই শাস্তি পেতে হবে।

(খ) লঘু—এই তত্ত্বে যদিও অপরাধের জন্য শাস্তি পেতেই হবে তবু তার পরিমাণ ও অপরাধ সমান নয়। শাস্তি দেবার সময় পরিবেশ ও অবস্থার কথা ভাবা হয়। যেমন অনেক সময়েই দেখা দরকার অপরাধীর বয়স কতো এবং সে প্রথম অপরাধটি করলো কিনা। দাগী না হলে তার শাস্তি কম হবে।

প্রশ্ন

১। Explain briefly the different theories of punishment.

২। Critically examine the Retributive and Reformative theories of punishment.

৩। Should criminals be punished? For what reasons?

ষোড়শ অধ্যায়

চরিত্র ও নৈতিক প্রগতি

১। আচরণ ও চরিত্র (Conduct and Character)

সংস্কৃতে 'চরিত্র' শব্দটি গঠিত হয়েছে চর্ ধাতুর সঙ্গে ইত্র প্রত্যয় যোগ করে। চর্ ধাতুর অর্থ গমন করা। গমন করার সঙ্গে চরিত্রের গভীর যোগ। সাধারণভাবে আমরা চরিত্র বলতে স্বভাব বুঝি। স্বভাব যদিও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তা তবু নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় আমরা বারবার ঘোষণা করেছি যে অসংখ্য কর্মের মধ্যেই ব্যক্তি তার স্বভাবের পরিণতি খোঁজে। মনুষ্যত্বের বীজ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সেই বীজ তখনই উপ্ত হয় যখন ব্যক্তি প্রতিদিনকার কর্মে তার লক্ষ্যকে প্রকাশ করতে থাকে। দিনেদিনে তখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্বে সে যা ছিলো না, তা হয়ে ওঠাতেই তার পরিণতি। সুতরাং পূর্ববর্তী স্থির অবস্থা থেকে সে চলতে থাকে, গমন করতে থাকে ভবিষ্যত লক্ষ্যের দিকে। পরিবর্তনের প্রতিটি পর্বেই তাকে গমন করতে হয়। পরিবর্তন যেহেতু ব্যক্তির কর্মের মধ্যেই সূচিত হয়, যেহেতু নীতিশাস্ত্রে কর্মকেই বিচারের বিষয় করা হয়েছে, ব্যক্তির চরিত্র তার আচরণেই প্রকাশিত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে চরিত্রের সঙ্গে কেনো গমন করা ও আচরণ করা জড়িত।

মনুষ্যত্ব মানুষের কেন্দ্রগত সত্য কিন্তু তাকে সজ্ঞানে সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে হয়। শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পে যেমন 'মানহুঁশ' হবার কথা পাই। এবার কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে মানুষেই যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবে আবার সচেতন কর্মের প্রয়োজন কি, আপনা থেকেই তো তার মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হবে। এই প্রশ্নের জবাবে উপনিষদের একটি তুলনা ব্যবহার করা যায়। উপনিষদে বলা হয়েছে—সত্য সাতটি পর্দায় আবৃত আলোকের মতো। বাইরে থেকে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তখনো তার দীপ্ত বর্ণ প্রকাশকে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু একটি একটি করে যদি আমরা ওই পর্দা উন্মোচন করতে থাকি তবে ক্রমশই আলোকের জ্যোতি বাড়তে থাকে এবং সবশেষে তার আনির্বাণ দীপ্তিকে সম্পূর্ণ দেখতে পাই। আমাদের চরিত্রও তেমনি মনুষ্যত্বের আকর, কিন্তু তা নানা আবরণে ঢাকা। কর্ম বা আচরণে তার ঢাকা গুলো খোলা যায় যদি আমরা সত্য সন্ধানী হই অর্থাৎ সত্যকে জানবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

বাইবেলের একটি কাহিনীতে আমরা এই একই উক্তি পাই। যীশু শিষ্যদের বলেন যে আমরা জানি বীজ ছড়ালেই তা থেকে অঙ্কুর হয়। কিন্তু সর্বদাই অঙ্কুরোদ্‌গম হয় কি? হয় না। যেমন পাথরে পড়লে হয় না, বন্ধ্যা জমিতে হয় না। অর্থাৎ অঙ্কুর ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলেই বীজ থেকে ফসল ফলে। মানুষের চরিত্র বিষয়েও একই কথা। যে চলবে, যে কর্মের মধ্যে সত্যকে জানতে চাইবে, সেই পরিণত ও চরিত্রবান হবে। মানুষের দৈহিক খোলস ও বৃত্তি সত্ত্বেও আমরা মানুষ থাকি না, মানুষ আমাদের হতে হয়। এ জন্যেই সর্বত্র এতো অনৈতিকতা, অন্যায় ও অবিচারকে দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাই সঠিক বলেছেন যে 'Character means the complete universe or system constituted by atcs of will of a particular kind.'

আমরা ইতিপূর্বেই স্থির করেছি যে কোনো একটি মাত্র কর্ম দেখেই কর্মের চরিত্র বিষয়ে রায় দেওয়া যায় না, কর্মকে বিচার করতে হয় ব্যক্তির সমগ্র স্বভাব দিয়ে। মানুষের স্বভাব কাণ্ট চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে নানা কার্য কারণে গঠিত। তার মধ্যে প্রকৃতির অংশই বেশি। মানুষ কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন থেকে তার স্বভাব বা স্বকীয়তার পরিচয় দেয় না। কারণ স্বভাব নিয়ন্ত্রিত হলে আর 'স্ব' ভাব বা নিজের ভাবনা বলা যায় না। তখন আর তার আত্ম বলতে কিছু থাকে না। স্বভাবের পরিচয় নিজস্ব স্বাধীন কর্মে। কর্মে স্বাধীনতার প্রকাশ হয় বেছে নেবার শক্তিতে। ব্যক্তি অসংখ্য কর্ম থেকে বাছাই করেই যেমন স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে, তেমনি তার চরিত্রকেই ব্যক্ত করে। কারণ ব্যক্তিরা নিজেদের স্বভাব অনুযায়ীই কর্মকে বাছাই করে। কাণ্ট তাই সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ ইত্যাদিকে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বলেন না। তিনি বিবেচক মানুষের শুভ সঙ্কল্পকেই একমাত্র নীতিশাস্ত্রের বিচার্য বিষয় বলেন। স্বাধীন সঙ্কল্প মানলেই বোঝা যায় যে কাণ্ট বলছেন মানুষের স্থির নির্দিষ্টতা বলে কিছু নেই। মানুষ সর্বদাই নানাভাবে কিছু না কিছু হচ্ছে। স্বেচ্ছায় সে দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে। কী সে হবে তা নির্ভর করে তার কল্পনা, সঙ্কল্প ও কর্মের ওপর। অর্থাৎ কাণ্ট নীতিশাস্ত্রের কেন্দ্রে প্রাণবান মানুষকে বসান। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও মহাপুরুষরা তাই চিরকাল বলছেন যে মানুষের চরিত্র একটি নিয়ত পরিবর্তমণীল অবস্থা যা ঈশ্বর সন্নিধানে যাবার জন্য বা আত্মোপলব্ধির জন্য সর্বদাই চেষ্টিত।

২। **চরিত্রের প্রগতি (Growth of Character):** আমাদের বক্তব্য মতো তাই চরিত্রের প্রগতি নির্ভর করে মনু কথিত শম, দম, শৌচ, চৌর্যাভাব ইত্যাদি ধর্মাচরণের ওপর। কারণ ব্যক্তিকে তার স্বভাব আবিষ্কার করতে হয় স্বধর্ম অনুযায়ী। ব্যক্তির জন্যে প্রয়োজন সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, সংযম ও নৈতিক বোধ, বিচারবুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্মে নির্মোহ হয়ে প্রবৃত্ত হবার বীর্য ও সাহস।

সমাজ ও পরিবেশ ব্যক্তির চারপাশে থাকে কিন্তু তারা ব্যক্তির সহযোগী মাত্র। কর্মের অধিকার ব্যক্তির, কর্ম-বাছাইয়ের দায়িত্ব তার নিজের। সুতরাং তাকে প্রকৃত মানুষ হতেই হবে, সমাজ বা পরিবেশ যাই হোক না কেনো। অনুকূল সমাজে নিশ্চয়ই ব্যক্তির সুবিধে, অনৈতিক সমাজে নিশ্চয়ই তার সংগ্রাম জটিল তবু প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেই জীবন বলে। তার আত্মোপলব্ধির জন্য তাকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অভ্যস্ত হতে হয়। কোনো সমাজ তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবে না। সমাজ কেবলমাত্র মনে জীবনের লক্ষ্যকে পৌঁছে দিতে পারে কিন্তু হয়ে ওঠার সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের।

৩। **নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক অগ্রগতি (Moral Ideal and Moral Progress)**

পরিবর্তনের সঙ্গে প্রগতির যোগ। পরিবর্তনকে সময়ের ছকে হিসেব করা হয়। জাগতিক নিয়মের অধীন সমস্ত বস্তু ও প্রাণী নিয়ত পরিবর্তিত হয় কারণ পরিবর্তনেই তার বিবর্তন। প্রাণীবিদ্যা থেকেই পরিবর্তন শব্দটি দর্শনের আলোচনায় এসেছে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিমাত্রই জানে যে প্রাণীর সবকিছু উৎপত্তি ও ক্ষয়ের অধীন। পরিবর্তন বলতে তাই বোঝায় অবস্থান্তর।

প্রগতি শব্দটির অর্থ ভিন্ন। প্রকৃষ্ট গতিকেই বলা হয় প্রগতি। প্রকৃষ্ট অর্থে এখানে বুঝতে হবে যা শুভ, মঙ্গল বা উন্নত অবস্থার সঙ্গে জড়িত। প্রগতি নিঃসন্দেহেই পরিবর্তন কিন্তু পরিবর্তনই প্রগতি নয়। যে-পরিবর্তনে পূর্ব অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উন্নততর, তাকেই প্রগতি বলা হয়। নীতিশাস্ত্রে প্রগতির অর্থকে তাই প্রথমত বলা হবে অবস্থান্তর (অর্থাৎ যা আগে ছিলো কিন্তু এখন আর নেই) এবং দ্বিতীয়ত বলা হবে পরিবর্তন উন্নত অবস্থার নির্দেশ দিচ্ছে নীতিশাস্ত্রে আমাদের আলোচ্য স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক কর্ম এবং তার কর্মও উদ্দেশ্যমূলক কর্ম। উদ্দেশ্যকে আমরা পরিণতির লক্ষ্য বলেছি।

সুতরাং প্রগতি নিশ্চয়ই পরিণতির নির্দেশ দেবে। পরিণতিকে দুভাবে দেখা যায়, ব্যক্তির দিক থেকে বা সমাজের দিক থেকে। সমাজতত্ত্বে প্রগতির বিচার হয় সমাজের কষ্টিপাথরে কিন্তু নীতিশাস্ত্রে ব্যক্তিই প্রধান। কাজেই প্রগতির পরিমান হবে ব্যক্তির কর্মকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্লেষণের জন্য যে কোন শাস্ত্রেই মানদণ্ডের প্রয়োজন। নীতিশাস্ত্রে ব্যক্তির কর্মের নৈতিকতাই একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে।

নীতিশাস্ত্রে কর্মকে বিচার করা হয় আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে। প্রগতিকেও তাই একটি বিশিষ্ট আদর্শের সঙ্গে জড়িত হতে হয়। কারণ নীতিশাস্ত্রে প্রগতি লক্ষ্য নয়, প্রগতি কর্মের দিক থেকে রূপান্তরের অবস্থা। ব্যক্তির কর্মকে আবার তার গোটা চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করেই বুঝতে হয়। কারণ ব্যক্তির যেমন চরিত্র তেমনি তার কর্ম। তাই প্রগতির অর্থ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির মাত্রা অর্থাৎ ব্যক্তি কতোটুকু পরিণতির দিকে এগিয়েছে তার মাত্রা থেকেই প্রগতির স্বরূপ বোঝা যাবে।

কিন্তু প্রগতির আলোচনায় সর্ব প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই যে প্রগতির পরিমাপ হবে কেমন করে? সামাজিক শাস্ত্রের আলোচনায় প্রগতির অর্থে সমগ্র সমাজের কথা ভাবা হয়। কিন্তু সমগ্র সমাজের প্রগতি জানা সম্ভবপর হয় না। যান্ত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিমাণগত হিসেবে প্রগতির পরিমাপ করা যায় কারণ যান্ত্রিক বিবেচনার ক্ষেত্রে পরবর্তী জ্ঞান পূর্ববর্তী জ্ঞানকে হঠিয়ে দিয়ে নিজের জায়গা করে নেয় এবং তার প্রয়োগের ফল আমাদের পক্ষে অনেক বেশি কাজে লাগে। কিন্তু মানসিক প্রগতির ফল পাওয়া যায় না। এখানে কোনো বক্তব্যই অন্য কোনো বক্তব্য হঠিয়ে দেয় না। বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে মন শুধু গভীর উপলব্ধির দিকে যাবার চেষ্টা করে। যেমন ধরা যাক, আদিম জীবন সংগঠন থেকে আমরা আধুনিক জীবন সংগঠনে এসেছি অর্থাৎ আমাদের সামাজিক প্রগতি হয়েছে বৈষয়িক ক্ষেত্রে, জগত বিষয়ে জ্ঞানও বেড়েছে। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, যন্ত্রের ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের সংস্কৃতি, রুচি ও মানসিকতা উন্নত হয়েছে কি? আমরা জবাব দিতে পারব না। কারণ জ্ঞানের সঙ্গে আত্মবোধের যোগ নেই। বৈষয়িক উন্নতির চূড়াতেও মানুষ সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর, হিংস্র। অথচ সভ্যতার অনেক নীচু ধাপে থেকেও আদিম মানুষ আলটামিয়ার গুহার দেয়ালে অত্যাশ্চর্য ছবি এঁকেছে।

প্রগতির পরিমাপ
গোড়ায় বাহ্য ফল
পরে সচেতনতা

সুতরাং মনের বিকাশ বা নৈতিকতার পরিচয় বাইরের হিসেব থেকে জানবার উপায় নেই।

জ্ঞানের পরিমাপ পাওয়া যায় কারণ জ্ঞান প্রায় আমাদের কাছে সঞ্চয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান একটা বোধ, যে-বোধ জ্ঞানের সঞ্চয়ে পাওয়া যায় না। কাজেই নৈতিক প্রগতিকে মেপে বলা যায় না এবং তা সামাজিক জীবনে প্রকাশিত হলেও সামাজিক মানদণ্ডে তার বিচার হয় না। কারণ নৈতিকতা ব্যক্তির। সমাজ শুধু তাকে নৈতিক পরিমণ্ডল ও আদর্শ দেয়, ব্যক্তি সেই আদর্শ ও পরিবেশ অনুযায়ী কর্ম করে। অধ্যাপক সেট্ তাই সঠিক বলেছেন যে নৈতিক প্রগতির অর্থ আত্ম-আবিষ্কার। আমি আগে যা ছিলুম পরে আর তা থাকছি না এটা নিশ্চয়ই পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের সঙ্গে যদি ইষ্ট বোধ থাকে তবে তাকে নিশ্চয়ই প্রগতি বলা হবে। সুতরাং আমার বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে আমার হয়ে ওঠায় নৈতিকতার বিভিন্ন পর্যায় প্রকাশিত হয়, তাকেই নৈতিকতার প্রগতি বলতে পারি। কিন্তু এই ধাপে ধাপে বিবর্তনের অর্থ এই নয় যে অনৈকতা থেকে আমরা নৈতিকতায় আসছি। কার্যত প্রতিটি মানুষই কমবেশি নৈতিক কারণ; প্রথমত তারা মানুষ ও দ্বিতীয়ত, তারা সমাজের নৈতিক প্রবহমান সংস্কৃতির ধারায় জারিত। সুতরাং আমরা বলবো যে প্রগতি সর্বদাই নৈতিকতায় আত্মোপলব্ধির দিকে এগোনো কিন্তু কখনোই অনৈতিকতা থেকে নৈতিকতায় উত্তরণ নয়।

নৈতিক প্রগতির ধাপ (Stages of Moral Progress)—অধ্যাপক সেট্ সঠিকভাবে নৈতিক প্রগতির কয়েকটি ধাপ উল্লেখ করেন। নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আমাদের সংজ্ঞা থেকেই এই ধাপগুলো সিদ্ধান্ত হিসেবে পাওয়া যায়।

(ঙ) বাহির থেকে অন্তরে আসা—গোড়ায় আমরা কাজের বিষয়ে অবহিত হই ফল দেখে। প্রলুব্ধ হলেই, উপকারের আশা থাকলেই কাজ করতে উৎসাহ নিই। কাজটি নৈতিক কি অনৈতিক তার বিচার হয় প্রচলিত বিধিনিষেধ ইত্যাদি দেখে। অর্থাৎ বাহ্য সামাজিক অনুশাসন কর্মের চরিত্র বিষয়ে মনস্থির করতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্রমশ আমাদের বোধ জন্মাতে থাকে যে সমস্ত কর্মের একটিই উদ্দেশ্য। জীবনযাত্রার মোটা দিকটা, প্রয়োজনের দিকটা বাদ দিলে থাকে নিজের কথা, আত্মার কথা। এই আত্মাকে আধ্যাত্মিক কিছু মনে করবার দরকার নেই। সাধারণভাবেই সংস্কৃতির প্রত্যয় মিলিয়ে ভাবা যায় যে মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের বৃত্তিগুলো, যথোচিত আয়ত্তে আনা উচিত। একথা

বুঝলে, সেই চেষ্টায় নামতে হয়। অর্থাৎ তখন শুধুমাত্র বাইরের প্রয়োজন শেষ হবে এবং আমরা অন্তরে তাকাতে থাকবো। প্রতিটি কর্মের বিচার নিজেই করবো তখন, কিন্তু বিচার করবো বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে।

(খ) **কোমল ও কঠোর ধর্মের সম্পর্ক**—কর্মের প্রথম স্তরে যেহেতু বিচার শুরু হয় বাইরে থেকে, কর্মীর জীবন-ধর্মই তখন প্রবল। তাই নৈতিকতার সূত্রপাতে কঠোর ধর্ম অর্থাৎ শারীরিক বল বীর্য ইত্যাদিকে মূল্য দেওয়া হয় বেশি। কিন্তু কর্মের সূত্রেই পরে জানা যায় যে শুধুমাত্র বলবীর্যতেই নৈতিক হওয়া যায় না। সহানুভূতি, ক্ষমা দয়া ইত্যাদি ধর্মই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। সুতরাং কঠোর ও কোমল ধর্মকে মেশাতে পারলেই ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হয়। নৈতিকতার লক্ষ্য এই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

(ক) **ব্যাপকতর ধর্মবোধ**—আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে ব্যক্তিদের পর-কেন্দ্রিকতায় আসতে হয়। অধ্যাপক সেট্ বলেছেন নৈতিক অগ্রগতিতে স্বাতন্ত্র্য বর্জন করতে হয়। কর্মে সর্বজনীনতাকে স্থান দিতে হয়। কিন্তু আমরা জানি যে প্রকৃত আত্মবোধে কোনো রকম সঙ্কীর্ণতা নেই, আত্ম ও পরে কোন বিভেদ নেই। আত্মস্থতাতে ষড়রিপুর দাপট নষ্ট হয় এবং নৈতিক ব্যক্তি সমস্ত বিশ্বকেই নিজের মতো দেখেন।

নৈতিকতার সর্ত (Condition of Morality)

আচার্য মনু ভারতীয়দের জন্য দশটি আচার বা ধর্মের কথা বলেছেন। ধৃতি, ক্ষমা, দম, চৌর্যাভাব, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। মনুর নির্দেশ অনুযায়ী এই কটি কর্মই ভারতীয়দের প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারে।

ধৃতি—জ্ঞান ও সত্যকে ধারণ করবার ক্ষমতাকেই ধৃতি বলে। ধৃতিতে আমরা আত্মাকে ধারণ করি। প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের স্বভাব ও স্বধর্মকে রক্ষা করতে পারে না। তার জন্যে ব্রহ্মচর্য ও সংযমের মারফৎ আত্মমোক্ষণ দরকার। আত্মমোক্ষণের ধাপে ধাপেই ধৃতি গড়ে।

ক্ষমা—ক্ষমাতেই সংযম গড়ে। ক্ষমাহীন হলে আত্মস্থতা নষ্ট হয় কারণ ক্রোধ মনের স্থিতিকে নষ্ট করলেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

দম—চিত্ত-নিবৃত্তি ও স্থৈর্যকে দম বলে। প্রজাপতি তাই উপদেশ দিয়েছিলেন 'দম্যত' অর্থাৎ নিজেকে শাসন করো। দমনের মধ্যেই মনে প্রশান্তি তৈরি হয়।

চৌর্যাভাব—পরস্বাপহরণ, যে কোনো পরিমাণ ও আকৃতিতেই হোক না কোনো, বন্ধ করতে হবে।

শৌচ—নিজেকে শরীরে ও মনে পরিশুদ্ধ রাখবার সমস্ত আচরণাদি যথাবিহিত করতে হবে।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—ষড়রিপুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইন্দ্রিয়াদির শাসন করতে হয়।

ধী ও বিদ্যা—জ্ঞানের চর্চা নিয়মিতভাবে করতে হবে। কারণ, সচেতনাতেই বোধের জন্ম।

সত্য—সত্যই আত্মজ্ঞানের অবলম্বন। সত্যই একমাত্র জীবনের লক্ষ্য।

অক্রোধ—নিজের মানসিক প্রশান্তির জন্য ক্রোধকে বিশেষ করে দমন করা দরকার।

অনুশীলনী

১। Distinguish between character and conduct. Is conduct determined by character and circumstances ?

২। What is character ? How is it developed ? What is its relation with morality ?

৩। Give a short account of the nature of moral progress.

৪। What are the conditions of moral progress ? Is there any relation between moral ideal and moral progress ?